বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

শেরপুর

বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি

গ্রন্থমালা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী

বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

শেরপুর

প্রধান সম্পাদক

শামসুজ্জামান খান

নির্বাহী সম্পাদক

মো. আলতাফ হোসেন

সহযোগী সম্পাদক

আমিনুর রহমান সুলতান

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী
শিহাব শাহরিয়ার

সংগ্রাহক
লুলু আবদুর রহমান
কোহিনূর রুমা
প্রাঞ্জল এম. সাংমা

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী
বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা
শেরপুর

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২০/ জুন ২০১৩

বাএ ৫১৬০

প্রকাশক
মো. আলতাফ হোসেন
লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
বাংলা একাডেমী ঢাকা

মুদ্রণ
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
দুইশত আশি টাকা

BANGLADESHER LOKOJO SONSKRITI GRONTHAMALA : SHERPUR (Present state of Folklore in Sherpur District) Chief Editor : Shamsuzzaman Khan, Executive Editor : Md. Altaf Hossain, Associate Editor : Aminur Rahman Sultan, Specialist : Professor Syed Jamil Ahmed, Dr. Firoz Mahmud, Shahida Khatun, Publication : *Lokojo Sonskritir Bikash Karmosuchi* (Programme for the Development of Folklore), Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2013. Price : Tk. 280.00 only. US$: 10.00

ISBN-984-07-5769-7

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

বাংলা একাডেমী তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদান (folklore materials) সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং তার গবেষণার প্রয়াস চালিয়ে আসছে। এই কাজের জন্য সূচনাপর্বেই একটি ফোকলোর বিভাগও গঠন করা হয়। এই বিভাগটির নাম লোকসংস্কৃতি বা ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বিভাগ না রেখে ফোকলোর নামটি যে ব্যবহার করা হয় তাতে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। যতদূর জানা যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এই নামকরণ করেন। তবে একই সঙ্গে ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক সংগ্রহ প্রকাশের জন্য যে-সংকলনটি প্রকাশ করা হয় তার নাম ছিল *লোকসাহিত্য সংকলন*। এই নামটি ফোকলোরের অনেকগুলো শাখা-প্রশাখার (genre) একটি প্রধান শাখা মাত্র (folk literature)। এর ফলে ফোকলোরের আধুনিক ও সার্বিক ধারণা সম্পর্কে কিছু অস্পষ্টতার পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। এই অপূর্ণতা পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে আমরা যখন বাংলা একাডেমী থেকে ফোকলোর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফোর্ড ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলিস্থ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক অ্যালান ডান্ডেস, ফিনল্যান্ডস্থ নরডিক ইনস্টিটিউট অব ফোকলোরের পরিচালক প্রফেসর লাউরি হংকো, ভারতের মহীশূরস্থ কেন্দ্রীয় ভাষা ইনস্টিটিউটের ফোকলোর বিভাগের প্রধান ড. জহরলাল হান্ডু, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার অধ্যাপিকা মার্গারেট এন মিলস্, পাকিস্তানের লোকভিরসার (ফোকলোর ইনস্টিটিউট অব পাকিস্তান) নির্বাহী পরিচালক আকসি মুফতি, ফিনল্যান্ডের ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. হারবিলাতি এবং কলকাতার Folklore পত্রিকার সম্পাদক শঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ বিশেষজ্ঞবৃন্দকে কর্মশালার ফ্যাকাল্টি মেম্বার করে তিনটি আন্তর্জাতিক কর্মশালার আয়োজন করি। এতে বাংলাদেশের ফোকলোর-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আবদুল হাফিজ, অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, অধ্যাপক নিয়াজ জামান, ড. হামিদা হোসেন, মিসেস পারভীন আহমেদ প্রমুখ প্রশিক্ষণ দান করেন। বাংলাদেশের আধুনিক ফোকলোর চর্চার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথম কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। সেই কর্মশালাসমূহের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে একাডেমীর ফিল্ডওয়ার্কভিত্তিক লোকজ উপাদান সংগ্রহসমূহ প্রকাশের পত্রিকার নাম *লোকসাহিত্য সংকলন* পরিবর্তন করে *ফোকলোর সংকলন* নামকরণ করা হয়। ওই কর্মশালা

www.pathagar.com

আয়োজনের আগে দেশব্যাপী একটি জরিপের মাধ্যমে ফোকলোরের কোন কোন ক্ষেত্রে কাজ হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই কোনো কাজ হয়নি তা চিহ্নিত করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে জরিপ চালানো হয়। তবে তখন লোকবল এবং অর্থ সংস্থান সীমিত থাকায় তাকে খুব ব্যাপক করা যায়নি। ফলে বাংলাদেশে ফোকলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার উপর যে-সমস্ত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে তার একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ *Bibliography of Folklore in Bangladesh* এবং *Folklore of Bangladesh* নামে ইংরেজি ভাষায় একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া *মৈয়মনসিংহ গীতিকা* যেহেতু আমাদের ফোকলোর গবেষণার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত সে-কথাটি মনে রেখে *লোকসংগীত সমীক্ষা : কেন্দুয়া অঞ্চল* প্রকাশ করা হয়। এর লক্ষ্য ছিল *মৈয়মনসিংহ গীতিকা*-র পটভূমি (context) সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দু-একটি কাজের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র পরিস্ফুট হয়নি। সে-কাজ করার মতো অবকাঠামোগত ব্যবস্থা, আর্থিক সঙ্গতি এবং প্রশিক্ষিত লোকবলও তখন বাংলা একাডেমীতে ছিল না। তবুও যাঁরা ছিলেন তাঁরা সকলেই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করার ফলে উপাদান যে কম সংগৃহীত হয়েছিল তা নয়। কিন্তু সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা পদ্ধতি ও তাত্ত্বিক বিষয়ে ভালো ধারণা না থাকায় বাংলাদেশের ফোকলোরের সামগ্রিক চিত্র যথাযথভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কয়েক বছর আগে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে Cultural Survey of Bangladesh গ্রন্থমালা-এর অধীনে ফোকলোর অংশ ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতেও বাংলাদেশের ফোকলোরের ব্যাপকতা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ধরন এবং উপাদানসমূহের প্রবহমানতার ফলে নিয়ত যে পরিবর্তন ঘটছে সে-সম্পর্কেও মাঠপর্যায়ভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ (empirical) গবেষণার পরিচয় খুব একটা লক্ষ করা যায় না।

ফোকলোর সমাজ পরিবর্তনের (social change) সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত, বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়। কোনো কোনো উপাদানের কার্যকারিতা (function) সমাজে না থাকায় তা তখন ফোকলোর হিসেবে বিবেচিত হয় না। সেজন্যই যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের সামাজিক উপযোগিতা নেই এবং সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তার কী ধরনের রূপান্তর ঘটছে তা যদি ব্যাখ্যা করা না হয় তা হলে তাকে আধুনিক ফোকলোর গবেষণা বলা যায় না। ফোকলোরের সামাজিক উপযোগিতার একটি প্রধান দিক হলো এর পরিবেশনা (performance)। ফোকলোর হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য সমাজে এর পারফরমেন্স থাকা চাই। ফোকলোরবিদ্যার এ-কালের প্রখ্যাত গবেষক ও পণ্ডিত প্রফেসর রজার ডি আব্রাহামস্ (Professor Roger D Abrahams) তাই বলেছেন, "Folklore is folklore only when performed". অর্থাৎ, যে-সমস্ত ফোকলোর উপাদানের এখন আর পরিবেশনা বা অন্য কোনো সামাজিক কার্যকারিতা (social function and utility) নেই তা আর ফোকলোর নয়।

ফোকলোর চলমান (dynamic) এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষুদ্র গ্রুপসমূহের মধ্যে শিল্পিত সংযোগের (artistic communication) এক শক্তিশালী

www.pathagar.com

মাধ্যম। বর্তমান যুগ সংযোগের (age of communication) যুগ। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় গ্রুপসমূহের মধ্যে লোকজ উপাদানসমূহের (folkloric elements)' কীভাবে সাংস্কৃতিক ও শিল্পসম্মত সংযোগ তৈরি হচ্ছে তা জানা ও বোঝার জন্য ফোকলোরের গুরুত্বও তাই সামান্য নয়। এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখেই বর্তমান শেখ হাসিনা সরকারের অর্থানুকূল্যে বাংলা একাডেমী ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে *লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি*-র মাধ্যমে দেশের ৬৪টি জেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারায় লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাসের একটি রূপরেখা তুলে ধরার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় একজন প্রধান সমন্বয়কারী এবং একাধিক সংগ্রাহক নিয়োগের মাধ্যমে জেলাসমূহের তৃণমূল পর্যায় থেকে ফিল্ডওয়ার্কের মাধ্যমে উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু করে। কাজের শুরুতে অকুস্থল থেকে কীভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে সে-সম্পর্কে তাদের হাতে প্রথমে একটি সাধারণ পরিচিতিমূলক ধারণাপত্র ধরিয়ে দেওয়া হয়। তা ছিল নিম্নরূপ :

লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশাবলি

স্থবিরতা নয়, সামাজিক প্রবহমানতার মধ্যে লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হলো দেশের প্রতিটি জেলার লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা। সেই লক্ষ্যে প্রতিটি জেলার জন্য মনোনীত একজন প্রধান সমন্বয়কারীর তত্ত্বাবধানে সংগ্রাহকদের মাধ্যমে কাজটি সম্পন্ন করা।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যা করতে হবে

১. সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করতে হবে।
২. সংযোগ ব্যক্তি (contact person) পূর্বেই নির্বাচন করতে হবে।
৩. সংশ্লিষ্ট এলাকায় থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক করে রাখতে হবে।
৪. সকল তথ্য-উপাত্ত সরাসরি সক্রিয় ঐতিহ্যধারক (active tradition-bearer)-এর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
৫. সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত অবশ্যই মৌলিক ও বিশ্বস্ত হতে হবে।
৬. সংগ্রহকালে প্রয়োজনীয় প্রতিটি বিষয় ও পর্যায়ের আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হবে।
৭. সংগ্রহ পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।
৮. প্রতিটি পৃষ্ঠার নিচে পাদটীকায় দুরূহ আঞ্চলিক শব্দের অর্থ ও প্রয়োজনীয় টীকা (তথ্যদাতার কাছ থেকে জেনে নিয়ে) দিতে হবে।
৯. সংগ্রহ পাঠানোর সময় সেগুলোর কপি নিজেদের কাছে রাখতে হবে।
১০. সংগ্রাহক ও তথ্য প্রদানকারীর নাম, ছবি, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, পেশা, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা (যদি থাকে) প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে।

www.pathagar.com

১১. সংগ্রহের তারিখ, সময় ও স্থান অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।
১২. বই/প্রবন্ধ থেকে কোনো তথ্য/বিবরণ নেয়া যাবে না। তবে উদ্ধৃতি দেয়া যাবে।

যে-সব তথ্য/উপাদান সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করে পাঠাতে হবে

ক. জেলা/উপজেলার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. জেলা/উপজেলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও পরিবেশ-প্রতিবেশ (milieu and context)-এর বিবরণ (২০ পৃষ্ঠা)।
২. জেলা/উপজেলার মানচিত্র, সীমানা, শিক্ষার হার, জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (১০ পৃষ্ঠা)।
৩. জেলা/উপজেলার নদ-নদী, পুকুর-দিঘি, মসজিদ-মন্দির ইত্যাদি লোকজ সংস্কৃতির উপাদান সৃষ্টিতে কী ভূমিকা রাখছে তার বিবরণ (১৫ পৃষ্ঠা)।
৪. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য ও চাষাবাদের সঙ্গে লোকজ ঐতিহ্যের সম্পর্ক (যেমন : নবান্ন, পিঠাপুলি, পৌষ-পার্বণ, বৈশাখী খাবার ইত্যাদি) (২০ পৃষ্ঠা)।
৫. জেলা/উপজেলার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-খাবারের লোকজ-ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য (১৫ পৃষ্ঠা)।
৬. লোকজ সংস্কৃতিতে জেলা/উপজেলার হাট-বাজারের ভূমিকা (৫ পৃষ্ঠা)।
৭. অন্যান্য ঐতিহ্যিক বিষয়াদি (যদি থাকে)।

খ. লোকজ সংস্কৃতির তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কিত

১. জেলা/উপজেলার প্রধান প্রধান লোকসংগীতের নাম, ফর্ম ও গায়নরীতি, কারা গায়ক, কখন গাওয়া হয় ইত্যাদির বিবরণ (৪০ পৃষ্ঠা)।
    ক. লোকসংগীত আসরের বিবরণ, দর্শক-শ্রোতার প্রতিক্রিয়া, কবিয়াল/বয়াতির সংগীত পরিবেশন কৌশল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।
    খ. সংগৃহীত লোকসংগীত কোন শাখার (যেমন : কবিগান, জারিগান, গম্ভীরাগান, সারিগান, বাউলগান, মেয়েলি গীত, বারোমাসি ইত্যাদি) উল্লেখ করতে হবে।

ফিল্ডওয়ার্ক-এর ছক ও আনুষঙ্গিক তথ্যপত্র

প্রস্তুতিপর্ব : ম্যাপ, স্থানীয় ইতিহাস ও সংশ্লিষ্ট বইপুস্তক দেখা, পাঠ ও অনুসন্ধান/সংযোগ ব্যক্তি ও থাকার জায়গা ঠিক করা

ক. ফিল্ডওয়ার্কের নাম, সময়সীমা ও বিষয়, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি অর্থ-সংস্থান-সূত্র, উদ্যোক্তা ইত্যাদি ঠিক করা।
খ. ডেস্ক-ওয়ার্কের পরিকল্পনার বিবরণ, ডিভিশন অব লেবার (যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে) ও প্রাসঙ্গিক তথ্য।
গ. দলের গঠন-প্রকৃতি, সদস্যবৃন্দ ও ব্যবহৃতব্য যন্ত্রপাতি।
ঘ. যাত্রার বিবরণ (খুব সংক্ষিপ্ত) : যানবাহন, যাত্রা-পথ।
ঙ. স্থানীয় সংযোগ ব্যক্তির নাম ও পরিচয়।

www.pathagar.com

চ. থাকার স্থান : সুবিধা-অসুবিধা এবং ফিল্ডগ্রুপের অকুস্থলে পৌঁছা এবং কোনো কর্মবিভাগ বা আলোচনা হলে তার বিবরণ।

ছ. Milieu-এর প্রাসঙ্গিক বর্ণনা।

জ. উৎসবধর্মী-অনুষ্ঠান হলে : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ধরন, কী কী Genre-এর Performance হবে তার বর্ণনা, এর উদ্যোক্তা, অর্থনীতি, উদ্দেশ্য-এর মূল আকর্ষণ বা Main Item- যোগদানকারীদের ধরন, শ্রেণি বয়োবর্গ উদ্দেশ্য, যাতায়াত ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা।

ঝ. ফটোগ্রাফার/ভিডিওগ্রাফার থাকলে তিনি নিসর্গ-বিন্যাস, গৃহ ও বাস্তব জীবন-যাত্রার ধরন ও সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাসঙ্গিক পটভূমির (relevant context) চিত্র বা ভিজ্যুয়াল নেবেন।

১. যে অনুষ্ঠানে ছবি বা ভিজ্যুয়াল নেবেন তার ডিটেইলস, শিল্পীদের গঠন (একক, গ্রুপ, পুরুষ, মহিলা, দ্বৈত, সমবেত), সঙ্গতীয়াদের বাদ্যযন্ত্রাদির ডকুমেন্টেশন করবেন—শিল্পীদের সাদাকালো ছবি কিছু নেবেন, দলনেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে বিশেষ ফোকাস ও সময়সীমা এবং তারিখ নির্ধারণ।

২. খাতায় শিল্পী ও সঙ্গতীয়াদের নাম লিখবেন ও চিহ্নিতকরণের ব্যবস্থা করবেন।

৩. শিল্পীর কোনো গান থাকলে বা ভিডিওতে থাকলে ক্রস রেফারেন্স হিসেবে কোন ফিল্ড-সহকর্মী লিখেছেন তার নোট রাখবেন।

৪. মনিটর নেবেন এবং শিল্পী বা তথ্যদাতা রেকর্ড কেমন হলো দেখতে চাইলে দেখাবেন।

৫. কী কী যন্ত্রপাতি নিচ্ছেন তার তালিকা করবেন এবং কতটি ক্যাসেট, ফিল্ম নিলেন তার নাম, সংখ্যা ও দাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং অফিসের রেকর্ড-বুকে তুলে রাখবেন।

ঞ. গবেষক যে তথ্যদাতা (informant) বা সংলাপীর (interlocuter) জীবন তথ্য বা অনুষ্ঠানের পরিবেশনার তথ্য (repertoire) নিচ্ছেন তা তিনি একটি প্রক্রিয়া (process) হিসেবে পর্যায়ক্রমে অনুপুঙ্খভাবে নেবেন। প্রয়োজনে তথ্যদাতার সঙ্গে বার বার সংলাপে বসবেন এবং নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন। গোটা পরিবেশনার বৈশিষ্ট্য এতে বিধৃত হবে। ক্রস রেফারেন্স. হিসেবে তথ্যদাতা সংলাপীর ছবি নেয়া হয়েছে কিনা নিশ্চিত হবেন। গানের শিল্পী হলে গান যথাযথভাবে (exactly performed) লিখে শিল্পীকে দিয়ে চেক করিয়ে নেবেন।

ট. উৎসবে/এক বা দুই দিনের ফিল্ডওয়ার্কে ব্যক্তি শিল্পীর সঙ্গে বিস্তৃত কাজ করার সুযোগ কম। তবু যতদূর সম্ভব Dialogical Anthropology-র পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে দেখতে হবে "From the perspective of living community and to be specific, functionally", ফলে জীবন্ত সমাজ বা গ্রুপের যে-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা ধারা নিয়ে যে-ফিল্ডওয়ার্কার কাজ করবেন তাকে ওই

www.pathagar.com

সংস্কৃতি বা উপাদানের সামাজিক, সাংস্কৃতিক গতিশীলতার (dynamics) অভ্যন্তরীণ নিয়ম (inner rule) এবং পরিবেশনায় শিল্পীর ভূমিকা (role) ও উদ্ভাবনা এবং দর্শক/শ্রোতা (audiance) সক্রিয় ঐতিহ্যবাহকের (active tradition-bearer) প্রতিক্রিয়া/মিথস্ক্রিয়া বুঝে নিতে হবে—তথ্যদাতাদের সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে বা সময় থাকলে রিফ্লেক্সিভ এথনোগ্রাফির মাধ্যমে। এ ধরনের কাজে তথ্যদাতা বা সংলাপী ওই সংস্কৃতির অভ্যন্তরীণ ব্যাখ্যাতা, বিশেষ শব্দ, প্রতীক বা দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের ব্যাখ্যাতাও হবেন তিনি এবং ফিল্ড গবেষক বাইরের দিক থেকে পর্যবেক্ষক, দলিলীকরণকারী ও সংলাপ সমন্বয়ক। তিনিও ব্যাখ্যাতা তবে বাইরের দিক থেকে।

ঠ. যৌথ ফিল্ডওয়ার্কে দলনেতা প্রতিদিন রাতে সমন্বয় ও মূল্যায়ন সভা করবেন এবং প্রয়োজনে পরিকল্পনার পরিবর্তন বা পুনর্বিন্যাস করবেন।

ড. প্রত্যেক সদস্য যন্ত্রপাতির হেফাজত ও নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ রাখবেন।

ঢ. ফিল্ডওয়ার্ক থেকে ফিরে সাত দিনের মধ্যে সকল সদস্য নিজ নিজ প্রতিবেদন জমা দেবেন। ভিডিওগ্রাফার-ফটোগ্রাফার তার কাজ শেষে জমা দেবেন। এরপরে একটি সমন্বয় সভা করে সংগ্রহসমূহের আর্কাইভিং, সম্পাদনা বা প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে হবে।

মনে রাখবেন, ফোকলোরবিদ হিসেবে আপনার কাজ হলো আপনার তথ্য-উপাত্ত-উপাদানকে যে-সমাজের ফোকলোর তাদের দৈনন্দিন জীবন, বিশ্বাস-সংস্কার-বিচার-বিবেচনা এবং বিশ্ববীক্ষার নিরন্তর পরিবর্তনশীলতার প্রেক্ষাপটে খুঁটিয়ে দেখে বস্তুনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা। উপাদানের অর্থ ও ইতিহাস তাদের কাছ থেকেই জানা এবং সেভাবে রেকর্ড করা।

এই নির্দেশনাটি সমন্বয়কারী এবং সংগ্রাহকদের কাজের জন্য যথেষ্ট ছিল না। কারণ, যাদের নির্বাচন করা হয়েছিল তাদের অনেকেরই আধুনিক ফোকলোর সংগ্রহের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা তেমন একটা ছিল না। ১৯৬০-এর দশক থেকে পাশ্চাত্য বিশ্বে ফোকলোর চর্চার (folklore studies) যে নতুন প্যারাডাইম (paradigm) তৈরি হয় তার সঙ্গে আমাদের দেশের ফোকলোর অনুরাগীদের এখন পর্যন্ত সুস্পষ্ট কোনো পরিচিতি ঘটেনি। তাছাড়া আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রাচীনতার জন্য এখানকার ফোকলোর চর্চা শুধুমাত্র পাশ্চাত্যের মতো সংকালিক (synchronic) ধারার হলেই উপাদানসমূহের মর্মার্থ যে বোঝা যাবে না সেই জায়গাটা বুঝে নেয়া আরও জটিল। আমাদের ফোকলোর উপাদানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসের পটে (diachronic) স্থাপন করেই প্রেক্ষাপট (context) হিসেবে অকুস্থলের পরিবেশনকলার (local performance) অনুপুঙ্খ রেকর্ড না করা হলে সে-ব্যাখ্যাবয়ান বাস্তবানুসারী (empirical) হবে না। এই কথাগুলো মনে রেখেই সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের (field-worker) জন্য দুইটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ এবং দুইটি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, অধ্যাপক সৈয়দ জামিল আহমেদ এবং বাংলা

www.pathagar.com

একাডেমীর পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন। কক্সবাজারের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকদের। অন্যদিকে রাজশাহীর প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী ও খুলনা বিভাগের সমন্বয়ক ও সংগ্রাহকেরা। ঢাকার কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণে সকল অঞ্চলের সমন্বয়ক এবং সংগ্রাহক অংশগ্রহণ করেন। এই চারটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ফোকলোর সংগ্রহ সম্পর্কে সমন্বয়কারী ও সংগ্রাহকদের ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়।

এই পর্যায়ে মূল কাজটি করার জন্য একটি সুস্পষ্ট রেখাচিত্র প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় :

লোকজ সংস্কৃতির বিকাশ কর্মসূচি
নির্দেশিকা

সংজ্ঞা : Folklore : Artistic communication in small groups– Dan-Ben-Amos

ফোকলোর উপাদান চেনার উপায় : Folklore is folklore only when performed– Roger D Abrahams জীবন্ত/বর্তমানে প্রচলিত না থাকলে তা Folklore নয়। জেলা পরিচিতিতে যা থাকবে :

১. নামকরণের ইতিহাস : কাহিনি, কিংবদন্তি ॥ প্রতিষ্ঠাকাল ও বর্তমান প্রশাসনিক ইউনিট ॥ ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ॥ বনভূমি, গাছপালা, বনজ ও ফলদ ওষধি বৃক্ষ, নদীনালা, খাল-বিল-হাওর ॥ মৃত্তিকার ধরন ॥ প্রধান পশুপাখি ও অন্যান্য বন্য জীবজন্তু ॥ জনবসতির পরিচয় (জনসংখ্যা, ধর্মগত পরিচয়), জাতি পরিচয় (হাড়ি, ডোম, ভুঁইমালি, নাগারচি, কৈবর্ত ইত্যাদি) ॥ নারী-পুরুষের হার ॥ তরুণ ও প্রবীণের হার ॥ শিক্ষার হার ॥ নৃগোষ্ঠী পরিচয় (যদি থাকে), গৌণ বা লোকধর্ম পরিচয় ॥ চাষাবাদ ও ফসল (উৎপাদন বৈশিষ্ট্য, লাঙল, জোয়াল, ট্রাক্টর ইত্যাদি) ॥ শিল্প-কারখানা ॥ ব্যবসা-বাণিজ্য ॥ যাতায়াত-যোগাযোগ (যানবাহন : নৌকা, জাহাজ, লঞ্চ, খেয়া, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মোষের গাড়ি, পালকি, মাওফা, নসিমন, করিমন, ভ্যানগাড়ি, বাস, ট্রেন ইত্যাদি) ॥ খাদ্যাভ্যাস ॥ পোশাক-পরিচ্ছদ ॥ পেশাগত পরিচয় ॥ বিনোদন ব্যবস্থা : গ্রামীণ ও লোকজ, নাগরিক ও আধুনিক (সিনেমা হলসহ) ॥ হাটবাজার, বড়ো দিঘি, পুষ্করিণী, মেলা, ওরস, বটতলা ইত্যাদি ॥ মাজার, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, বৌদ্ধ মন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ, আখড়া, সাধন-কেন্দ্র ইত্যাদি। (৩০-৪০ পৃষ্ঠা)

২. বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজ সংস্কৃতির বিষয়সমূহ : আপনার জেলার জন্য যা প্রয়োজন তা নিয়েই ফিল্ডওয়ার্ক করবেন।

জেলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। গ্রামের নামকরণ (যদি পাওয়া যায়)। সাবেক কালের বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী, কবিয়াল (master artist)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ছবি (যদি পাওয়া যায়) কিচ্ছা, পুথিপাঠ, কবিগান (বহু জেলা), মহুয়া, মলুয়া, রূপবান, সাবেক কালের পালাগান, যেমন—গুণাই যাত্রা, রয়ানি (পটুয়াখালী, বরিশাল), ভাওয়াল যাত্রা (গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য অঞ্চল), খ্রিষ্টের পালা (গাজীপুর), মালকা বানুর পালা, আমিনা সুন্দরীর পালা

www.pathagar.com

(চট্টগ্রাম), আলাল-দুলাল, আসমান সিং (ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের জেলা), বেহুলা, রামযাত্রা, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা (বহু জেলা), বনবিবির পালা, মাইচাম্পা (সাতক্ষীরা, খুলনা), কুশানগান (রংপুর), বাউলগান (কুষ্টিয়া, নেত্রকোনা ও অন্যান্য জেলা), কীর্তন (বহু জেলা), আলকাপগান, গম্ভীরা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া (কুড়িগ্রাম, রংপুর), মলয়া সংগীত (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মুর্শিদি, মারফতি (ঢাকা, ফরিদপুর), গাজির গান (চুকনগর, খুলনা, গাজীপুর ও অন্যান্য জেলা), বিয়ের গান, অষ্টগান, পাগলা কানাইয়ের গান (ঝিনাইদহ), বিচারগান, হাবুগান (মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ), ধান কাটার গান (সন্দ্বীপ), ভাবগান, ফলইগান (যশোর), হাছন রাজার গান (সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, বালাগঞ্জ, সিলেট), শাহ আবদুল করিম ও রাধারমণের গান (সুনামগঞ্জ), মর্মসংগীত, ধুয়াগান (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকনৃত্য, কালীকাচ নৃত্য (পূর্বদাশুরা, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইল), ধামাইল (সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা), মণিপুরী নৃত্য (মৌলভীবাজার), পুতুলনাচ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), পাঁচালি (বিভিন্ন জেলা), লম্বা কিচ্ছা (নেত্রকোনা), নাগারচি সম্প্রদায় (ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বরিশাল), অনুকূল ঠাকুর (পাবনা), মতুয়া (গোপালগঞ্জ) ইত্যাদি; মাজারকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী (চট্টগ্রাম), হজরত শাহজালাল (সিলেট), শাহ আলী (মিরপুর), মহররমের মিছিল (ঢাকা, সৈয়দপুর, গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ), মানিক পির (সাতক্ষীরা), পিরবাড়ি (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ) ইত্যাদি; মনসা মন্দির (শরিয়তপুর), আদিনাথের মন্দির (মহেশখালী, কক্সবাজার), রথযাত্রা (ধামরাই ও মানিকগঞ্জ, জয়দেবপুর) ইত্যাদি; লাঠিখেলা (কিশোরগঞ্জ, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর); শব্দকর সম্প্রদায় (কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট), বাওয়ালি সম্প্রদায় (সুন্দরবন), রবিদাস-বলাহাড়ি সম্প্রদায় (মেহেরপুর); লোকমেলা, নেকমর্দের মেলা (ঠাকুরগাঁ), সিদ্ধাবাড়ির মেলা (সাহরাইল, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), গুড়পুকুরের মেলা (সাতক্ষীরা), মহামুনি বৌদ্ধমেলা (চট্টগ্রাম), বউমেলা (মহিষাবান, বগুড়া), মাছমেলা (পোড়াদহ, বগুড়া), সার্কাস (বিভিন্ন জেলা) ইত্যাদি; লোকশিল্প, কাঠের ঘোড়া (সোনারগাঁ), শোলার কাজ (মাগুরা, যশোর), নকশিপিঠা (ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা), নকশিকাঁথা (যশোর, ফরিদপুর, জামালপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ), জামদানি (রূপসি, নারায়ণগঞ্জ), টাঙ্গাইল শাড়ি, বাবুরহাটের শাড়ি, পূজার মূর্তি (রায়ের বাজার, শাঁখারিবাজার, ঢাকা, নেত্রকোনা), বাঁশ-বেতের কাজ (সিলেট), পট/পটচিত্র (মুন্সিগঞ্জ), মৃৎশিল্প (রায়ের বাজার, ঢাকা, কাগজিপাড়া, কাকড়ান-সাভার, শাঁখারিবাজার ঢাকা, হাটহাজারী চট্টগ্রাম), তামা-কাঁসা-পিতল (ধামরাই, ঢাকা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, ইসলামপুর, জামালপুর, তাঁতিবাজার, ঢাকা), শীতলপাটি (বড়োলেখা), বটনি, জায়নামাজ (লেমুয়া, ফেনী) ইত্যাদি; হাট-বাজার, ঘরবাড়ির ধরন, বিবাহের প্যান্ডেল (সজ্জিত গেট), বিয়ের আসর, রাউজানের অনন্ত সানাইওয়ালা, বিনয় বাঁশি, ফণী বড়ুয়া, রমেশ শীল, (চট্টগ্রাম), নারীদের অনুষ্ঠান যেখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

নৌকা নির্মাণ : (লক্ষ্মীপুর), জাহাজ নির্মাণ : (জিনজিরা, ঢাকা)।

লোকউৎসব : নবান্ন, হালখাতা, নববর্ষ, ঈদোৎসব, দুর্গাপূজার উৎসব ও মেলা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, জন্মাষ্টমী, শবেবরাত, মানিক পির উৎসব (সাতক্ষীরা), ইলিশ উৎসব

www.pathagar.com

(চাঁদপুর), আঞ্চলিক রাসের মেলা, রাস মেলা (দুবলার চর, সুন্দরবন, ঠাকুরগাঁ, রংপুর), গাজন (কোনো উৎসব যদি থাকে), বাঘাইর শিরনি (নেত্রকোনা), বৃক্ষপূজা, বাওয়ালিদের কথা, গোলপাতা ও মধু সংগ্রহের কথা (সুন্দরবন), শিবরাত্রি (বিভিন্ন জেলা)।

লোকখাদ্য : মিষ্টি : মালাইকারী, মুক্তাগাছার মণ্ডা (ময়মনসিংহ), পোড়াবাড়ির চমচম (টাঙ্গাইল), রসমালাই (কুমিল্লা), প্যাড়া (রাজশাহী), কাঁচাগোল্লা (নাটোর), বালিশ মিষ্টি (নেত্রকোনা), ছানামুখী-লেডিকেনি (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মহারাজপুরের দই (মোকসেদপুর, ফরিদপুর), মহিষের দই (ভোলা), দই (গৌরনদী-বরিশাল, বগুড়া), তিলের খাজা, রসকদম্ব (রাজশাহী), তিলের খাজা (কুষ্টিয়া), চমচম (রাজবাড়ী), রসগোল্লা (জামতলী, যশোর), মালাইকারি (ময়মনসিংহ), পানতোয়া, খেজুর গুড়ের সন্দেশ (শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ), ফকিরের ছানা সন্দেশ (সাতক্ষীরা), হাজারি গুড় (ঝিটকা, মানিকগঞ্জ), কার্তিক কুণ্ডুর মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের ক্ষীরের চমচম, সন্দেশ (নড়াইল), বরিশাল মেহেন্দিগঞ্জের ঘোল এবং অন্যান্য জেলার বিখ্যাত মিষ্টি।

করণক্রিয়া (folk ritual) : মানত, শিরনি, ভাদু, ব্রত, টুসু, চড়ক উৎসব, কুশপুত্তলিকা দাহ, বেড়াভাসান, জামাইষষ্ঠী, বরণকুলা, গায়েহলুদ, বধূবরণ, সাতশা (baby shower), ভোগ।

লোকক্রীড়া : কানামাছি, দাড়িয়াবান্দা, গোল্লাছুট, হাডুডু, বউছি, নৌকা বাইচ, গরুর দৌড়, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো ও অন্যান্য।

লোকচিত্রকলা : গাজির পট, লক্ষ্মীর সরা, কাঠখোদাই, মন্দির-মসজিদ চিত্রণ, বিয়ের কুলা, দেয়াল চিত্রণ (১ বৈশাখ, চারুকলা অনুষদ, ঢা.বি), বিয়ের গেট, টিনের ঘরের বারান্দার গেটের ওপরের দিকে ড্রপওয়াল (মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা)।

শোভাযাত্রা : সিদ্ধাবাড়ীর শোভাযাত্রা (সিংগাইর, মানিকগঞ্জ), মহরমের তাজিয়া মিছিল (গড়পাড়া, মানিকগঞ্জ, ঢাকা)।

লোকপুরাণ ও কিংবদন্তি : বিভিন্ন জেলা।

লোকজ খেলনা : বিভিন্ন জেলা।

লোকচিকিৎসা : ওঝা, গুণিন (পটুয়াখালী, বরিশাল)।

গুহ্যসাধনা/তন্ত্রসাধনা/ (mystic cult) : দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা।

মন্ত্র/কায়া-সাধনা/হঠযোগ : যেখানে আছে। আপনার এলাকায় নতুন কোনো উপাদান থাকলে তা যোগ করে নিন। গ্রাম দেবতা, বৃক্ষপূজা, লৌকিক দেবতা ও পির (বিভিন্ন অঞ্চলে)। (৭০-১০০ পৃষ্ঠা)

৩. **উপাদানের বিন্যাস** : একই উপাদান (যেমন নকশিকাঁথা, নকশিপিঠা, পিঠাপুলি, মিষ্টি ইত্যাদি) জেলার বিভিন্ন স্থানে থাকলে উপজেলাভিত্তিক দেখাতে হবে। (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৪. **তথ্যদাতাদের (contact person) জীবনকথা।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৫. **ছবি।** (১০-২০ পৃষ্ঠা)

৬. **সাক্ষাৎকারের সময়, তারিখ ও স্থান।**

মাঠকর্মে প্রতি বিষয় (genre) যে-সমস্ত উপাদান নিয়ে বিন্যস্ত হবে। যথা :

www.pathagar.com

১. লোকসাহিত্য, কিচ্ছা, কাহিনি, কিংবদন্তি, লোকপুরাণ, পথুয়া সাহিত্য (একই পরিচ্ছেদে)। ২. ধাঁধা, প্রবাদ, প্রবচন ও শুলুক। ৩. লোকসংগীত (folk song) : লোকগীতি : ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মারফতি, মুর্শিদি, গাজির গান, লালন, রাধারমণ, হাছন, পল্লিগীতি, পাগলা কানাই, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ও অন্যান্য। ৪. গীতিকা (ballad)। ৫. গ্রামনাম। ৬. উৎসব : মেলা/শবেবরাত। ৭. করণক্রিয়া (ritual)। ৮. লোকনাট্য ও নৃত্য (চিত্রে দেখান)। ৯. লোকচিকিৎসা। ১০. লোকচিত্রকলা (লক্ষ্মীর সরা, শখের হাঁড়ি)। ১১. লোকশিল্প : নকশিকাঁথা, তামাপিতল, বাঁশ-বেতের কাজ, শোলার কাজ, মৃৎশিল্প ও মসজিদের চিত্র, আলপনা। ১২. লোকবিশ্বাস ও সংস্কার। ১৩. লোকপ্রযুক্তি : মাছধরার যন্ত্র, হালচাষের যন্ত্রাদি, কামার-কুমারদের কাজ, তাঁতের যন্ত্রপাতি। ১৪. খাদ্যশিল্প/ ভেষজ-ইউনানি চিকিৎসা পদ্ধতি। ১৫. মাজার ওরস, পির। ১৬. আদিবাসী ফোকলোর। ১৭. নারীদের ফোকলোর। ১৮. হাটবাজার, পুকুর। ১৯. বটতলা, চণ্ডীমণ্ডপ, গ্রাম-বাংলার চায়ের দোকান। ২০. আঞ্চলিক ইতিহাস। ২১. তন্ত্র ও গুহ্য সাধনা। ২২. পোশাক-পরিচ্ছদ। ২৩. মেজবান (চট্টগ্রাম), কুলখানি/ফয়তা/জিয়াফত/চল্লিশা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

মাঠকর্মে অন্য যে-সব বিষয় থাকবে না

১. জেলার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস।
২. জীবিত রাজনীতিকদের পরিচয় ও জীবনকথা।
৩. এলাকার কবি-সাহিত্যিকদের জীবনকথা ও তাদের বইপুস্তকের নাম।

সংগ্রহ কাজের শেষ পর্যায়ে যখন সংগ্রাহক এবং সমন্বয়কারীবৃন্দ সংকলন কাজ শুরু করেন তখন কাজটি কীভাবে সম্পন্ন করতে হবে তার জন্য একটি চূড়ান্ত নির্দেশনাপত্র প্রদান করা হয়।

প্রথম অধ্যায় : জেলা পরিচিতি (introduction of the district)

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল, খ. ভৌগোলিক অবস্থান, গ. বনভূমি ও গাছপালা, ঘ. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ঙ. জনবসতির পরিচয়, চ. নদ-নদী ও খাল-বিল, ছ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জ. ঐতিহাসিক স্থাপনা, ঝ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি, ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative)

ক. লোকগল্প/কাহিনি/কিস্‌সা (folk tale), খ. কিংবদন্তি (legend), গ. লোকপুরাণ (myth), ঘ. কবিগান, ঙ. লোকছড়া, চ. লোককবিতা, ছ. ভাট কবিতা, জ. পুথিসাহিত্য ও পুথি পাঠ।

তৃতীয় অধ্যায় : বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture)

ক. লোকশিল্প (folk art) : লক্ষ্মীর সরা, নকশিকাঁথা, মৃৎশিল্প, খেলনা, বাঁশ-বেতশিল্প, নকশিপাটি, নকশিশিকা, হাতপাখা, খ. লোকজ পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনা (folk costume & folk ornaments), গ. লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments), ঘ. লোকস্থাপত্য (folk architecture)।

চতুর্থ অধ্যায় : লোকসংগীত (folk song) ও গাথা (ballad)

ক. লোকসংগীত : ১. মাজারের গান, ২. উড়িগান, ৩. কর্মসংগীত, ৪. গাইনের গীত, ৫. মেয়েলি গীত, ৬. ভাটিয়ালি। খ. গাথা/গীতিকা (ballad)

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায় : লোকউৎসব (folk festival)

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব, ২. ঈদ উৎসব, ৩. শারদীয় দুর্গোৎসব, ৪. অষ্টমী স্নান ও মেলা, ৫. রথযাত্রা ও রথমেলা, ৬. ওরস ও মেলা, ৭. আশুরা, ৮. চৈত্রসংক্রান্তির মেলা ও চড়কপূজা, ৯. বৈসাবি (বৈসুক-ত্রিপুরী, সাংরাইন-মারমা ও রাখাইন এবং বিজু-চাকমা), ১০. মারমা ও গারোদের ওয়ানগালা উৎসব, ১১. হাজংদের বাস্তুপূজা, ১২. থুবাপূজা, ১৩. মান্দিদের বিয়ে, ১৪. গুপ্তবৃন্দাবন : লোকমেলা, ১৫. অন্নপ্রাশন, ১৬. খৎনা বা মুসলমানি, ১৭. সাধভক্ষণ, ১৮. সিমন্তোন্নয়ন, ১৯. ষষ্ঠী, ২০. আকিকা, ২১. শিশুর জন্মের পর আজান বা শঙ্খধ্বনি, ২২. শিশুকে ক্ষীর খাওয়ানো, ২৩. মানসিক (মানত),

২৪. গরুন্নাতের শিরনি, ২৫. ছড়ি (ষটি/ষষ্ঠী), ২৬. গায়েহলুদ, ২৭. সদরভাতা, ২৮. মঙ্গলাচরণ, ২৯. বউবরণ, ৩০. ভাত-কাপড়, ৩১. বউভাত, ৩২. রাখাল বন্ধুদের উৎসব।

ষষ্ঠ অধ্যায় : লোকনাট্য (folk theatre) ও লোকনৃত্য (folk dance)

ক. লোকনাট্য : ১. যাত্রা, ২. পালাগান, ৩. আলকাপ গান, ৪. সংযাত্রা। খ. লোকনৃত্য।

সপ্তম অধ্যায় : লোকক্রীড়া (folk games)

১. বলাই, ২. তই তই, ৩. রস-কস-সিঙ্গারা, বুলবুলি খেলা, ৪. লাঠিখেলা, ৫. হুমগুটি/গুটি খেলা, ৬. হাডুডু খেলা, ৭. ঘুড়ি ওড়ানো, ৮. ডাংগুলি খেলা, ৯. নৌকা বাইচ, ১০. ষাঁড়ের লড়াই, ১১. দাড়িয়াবান্ধা খেলা, ১২. গোল্লাছুট খেলা, ১৩. অন্যান্য লোকক্রীড়া।

অষ্টম অধ্যায় : লোক পেশাজীবী গ্রুপ (folk groups)

১. মিস্ত্রি/ছুতার, ২. কলু, ৩. তাঁতি, ৪. জেলে, ৫. কামার, ৬. ঘরামি, ৭. সৈয়াল, ৮. বাউয়ালি প্রভৃতি।

নবম অধ্যায় : লোকচিকিৎসা (folk medicine) ও তন্ত্রমন্ত্র (chant)

ক. লোকচিকিৎসা : ১. কলতার ঝাড়া, ২. সাপে কাটার ঝাড়া, ৩. অন্যান্য কবিরাজি চিকিৎসা। খ. তন্ত্রমন্ত্র।

দশম অধ্যায় : ধাঁধা (riddle)

একাদশ অধ্যায় : প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb)

দ্বাদশ অধ্যায় : লোকখাদ্য

১. পিঠা, ফিরনি, কদমা, মিষ্টি, ইত্যাদি

ত্রয়োদশ অধ্যায় : লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition)

চতুর্দশ অধ্যায় : লোকপ্রযুক্তি (folk technology)

১. মাছ ধরার উইন্যা/বাইর/জাখা/চাঁই/দুয়ারী, ২. সরিষা ভাঙার ঘানিগাছ, ৩. কাপড় বোনার তাঁত, ৪. জাঁতি বা ছরতা, ৫. ইঁদুর মারার কল ইত্যাদি।

এরপর সংগ্রাহক ও সমন্বয়কারীরা মিলিতভাবে তাদের সংকলন কাজ শেষ করে পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বাংলা একাডেমীর সচিব এবং প্রকল্প-পরিচালক জনাব মো. আলতাফ হোসেনের হাতে তুলে দেন। এই কাজে সামগ্রিক তত্ত্বাবধান, সমন্বয়

www.pathagar.com

সাধন এবং অনবরত তাগাদা ও নিদের্শনার মাধ্যমে সমন্বয়কারীদের কাছ থেকে সময়মতো পাণ্ডুলিপি আদায় করার জন্য তাকে যে নিষ্ঠা, অভিনিবেশ ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হয় তার জন্য তাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। সারাদেশ থেকে যে-বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ ৬৪-খানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ইতোপূর্বে এত বিস্তৃতভাবে সারাদেশের লোকজ সংস্কৃতির ইতিহাস এতটা অনুপুঙ্খতায় মাঠপর্যায় থেকে আর সম্পন্ন করা হয়নি। এই কাজের সঙ্গে যুক্ত বাংলা একাডেমীর পরিচালকবৃন্দ, প্রধান গ্রন্থাগারিক, পরিকল্পনা উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব এ.কে.এম. মাহবুবুল আলম ও ফোকলোর উপবিভাগের উপপরিচালক জনাব আমিনুর রহমান সুলতান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকজ সংস্কৃতি বিষয়ক দেশব্যাপী বিস্তৃত এই তথ্যসমৃদ্ধ উপাদান নিয়ে আমরা প্রকাশ করছি *বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা*। বাংলাদেশের ফোকলোর চর্চার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা না হওয়ায় প্রাথমিক পর্যায়ের যে-কাজ—Genre চিহ্নিতকরণ ও তার বিশ্লেষণ করা হয়নি। 'লোকসাহিত্য' বলেই ফোকলোরের সব উপাদানকে চালিয়ে দেওয়ার একটি ধরতাই প্রবণতা দেখা যায়। সেই অবস্থা থেকে আমরা Genre চিহ্নিতকরণ ও বিশ্লেষণের (genre identification and analysis) মাধ্যমে বাংলাদেশের ফোকলোরের প্রাথমিক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে পরবর্তীকালে অন্যান্য স্তর যথাক্রমে পটভূমি (context), পরিবেশনা (performance) ইত্যাদি প্যারাডাইম অনুসরণ করার মাধ্যমে ফোকলোর আলোচনাকে পরিপূর্ণভাবে বিজ্ঞানভিত্তিকতার উপর দাঁড় করাতে চাই।

গ্রন্থমালার এই খণ্ডে বর্তমান শেরপুর জেলার লোকজ সংস্কৃতির বিশদ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে শেরপুরের সমৃদ্ধ ফোকলোর উপাদানসমূহকে Genre ভিত্তিকভাবে সাজানো হয়েছে।

শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক

www.pathagar.com

সূচিপত্র

জেলা পরিচিতি (introduction of the district) ১-৩৬

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল ১
খ. ভৌগোলিক অবস্থান ৪
গ. জনবসতির পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৪
ঘ. বন-পাহাড় ও পশুপাখি ৯
ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল ১১
চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৩
ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা ১৪
জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি ১৬
ঝ. মুক্তিযুদ্ধ ১৭
ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ২১

লোকসাহিত্য (folk literature/folk narrative) ৩৭-৫২

ক. লোকগল্প ৩৭
খ. কিংবদন্তি ৩৮
গ. লোকপুরাণ ৪৪
ঘ. লোককবিতা ৪৫
ঙ. লোকছড়া ৪৭

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি (material culture) ৫৩-৬৪

লোকশিল্প ৫৩

১. হাতপাখা ৫৫
২. দরমা ৫৬
৩. নকশিকাঁথা ৫৮

লোকস্থাপত্য (folk architecture) ৬৫-৬৬

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ (folk costume & folk ornaments) ৬৭-৭০

লোকসংগীত (folk song) ৭১-১৪৬

১. মেয়েলি গীত ৭১
২. উদাসেনি গান ৮৮
৩. থুব গান ৯০

www.pathagar.com

৪. বিচ্ছেদগান ৯১
৫. ভজন ৯৯
৬. বিচারগান ১০০
৭. সংসারতাত্ত্বিক গান ১১৬
৮. গুরুতাত্ত্বিক গান ১১৯
৯. শরিয়তি গান ১২১
১০. প্রেমতত্ত্বের গান ১২৩
১১. বয়াতি গান ১২৫
১২. হাজং লোকগান ১৪১

লোকবাদ্যযন্ত্র (folk instruments) ১৪৭-১৪৮

লোকউৎসব (folk festival) ১৪৯-১৬৪

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব ১৪৯
২. গারোদের ওয়ানগালা উৎসব ১৫৪
৩. হাজংদের উৎসব ১৫৯
৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিয়ে উৎসব ১৬০
৫. অন্যান্য উৎসব ১৬২

আচার-অনুষ্ঠান (ritual) ১৬৫-১৬৮

লোকখাদ্য (folk food) ১৬৯-১৭২

লোকনাট্য (folk theatre) ১৭৩-২৪৬

১. মেহের নিগার ১৭৩
২. গুনাই বিবি ২০৮

লোকক্রীড়া (folk games) ২৪৭-২৫৮

১. মইদৌড় ২৪৮
২. ষাঁড়ের লড়াই ২৪৯
৩. ঘোড় দৌড় ২৪৯
৪. লাঠি খেলা ২৪৯
৫. গাঙ্গি খেলা ২৫১
৬. হা-ডু-ডু ২৫১
৭. ডাংগুটি ২৫১
৮. গোল্লাছুট ২৫২
৯. ঘুটি খেলা ২৫২

www.pathagar.com

১০. কানামাছি ভোঁ ভোঁ ২৫৩
১১. শালিক পাখি নমস্কার ২৫৪
১২. শব্দখেলা ২৫৬
১৩. দাড়িয়াবান্দা ২৫৬
১৪. মোরগ লড়াই ২৫৭
১৫. নৌকাবাইচ ২৫৭

লোকপেশাজীবী গ্রুপ (folk groups) ২৫৯-২৬৬

১. কামার ২৫৯
২. তাঁতি ২৬৫

ধাঁধা (riddle) ২৬৭-২৯০

বাগধারা (idiom) ২৯১-৩০৪

প্রবাদ-প্রবচন (folk sayings & proverb) ৩০৫-৩১২

লোকবিশ্বাস (folk belief) ও লোকসংস্কার (folk superstition) ৩১৩-৩১৬

লোকপ্রযুক্তি (folk technology) ৩১৭-৩২০

১. খইয়ের চালুন ৩১৭
২. গরুর মুখের ঠুলি ৩১৮
৩. মাছ ধরার ঠেলা ৩১৯
৪. মই ৩২০
৫. মাছ ধরার চাঁই ৩২০

লোকভাষা (folk language) ৩২১-৩৩০

www.pathagar.com

জেলা পরিচিতি

ক. নামকরণ ও প্রতিষ্ঠাকাল

বাংলাদেশের স্থাননাম খুবই চমৎকার—পাহাড়পুর, মধুপুর, সাতগাঁও, সোনারগাঁও, সুন্দরবন, সাগরদাড়ি ইত্যাদি। পাশাপাশি নদ-নদীর নামও সুন্দর—সুরমা, যমুনা, মেঘনা, ধলেশ্বরী, ধানসিঁড়ি, কীর্তিনাশা, কর্ণফুলী, কপোতাক্ষ, আড়িয়াল খাঁ, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি। এইসব নদ-নদী, মাছ, ফুল, পাখি, বৃক্ষ, পাহাড় বা পর্বতের নামের উৎপত্তির ইতিহাস যেমন আছে তেমনি বাংলাদেশের সকল স্থাননামেরও উৎপত্তির ইতিহাসও আছে এবং তার গুরুত্ব অপরিসীম।

স্থাননামের উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান বা উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে সৈয়দ মুর্তজা আলী বলেছেন, 'যদি কোন নামের সঙ্গে তার ভূ-প্রকৃতির সঙ্গতি না থাকে, তা হলে উক্ত নামের উৎপত্তির ইতিহাস গ্রহণযোগ্য নয়'। এই যে ভূ-প্রকৃতির কথা বলা হলো এটি অনেকাংশে সত্য।

বাংলাদেশে ভূ-প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে অনেক স্থানের নাম হয়েছে। লালমাটিয়া, রাঙামাটি প্রভৃতি ভূমির ক্ষেত্রে এবং সেগুনবাগিচা, শিমুলিয়া, জামতলি ইত্যাদি প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত স্থান নাম। দেখা গেছে ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে স্থান নামেরও পরিবর্তন হয়। আগের চন্দ্রদ্বীপ বর্তমানে বরিশাল।

স্থাননামের উৎপত্তি নানাভাবে হয়। তেঁতুল থেকে তেঁতুলিয়া, কাপাস থেকে কাপাসিয়া, নীলচাষ থেকে নীলক্ষেত, বেগুন থেকে বেগুনবাড়ি, কখনো রং এর নামে সবুজবাগ, লালবাগ, নীলগঞ্জ।

ঘাটের নাম সোয়ারিঘাট, বাহাদুরাবাদঘাট। আবার বিভিন্ন পেশার মানুষের বসবাসের এলাকা, পাড়ার নামকরণ করা হয় এভাবে— কুমারপাড়া, কামারপাড়া, জেলেপাড়া, তাঁতিপাড়া ইত্যাদি। বাংলাদেশে অনার্যদের বসবাসের সময় দেখা গেছে তাদের গোত্র প্রধান বা দল প্রধানের নামে স্থানের নাম হয়েছে। এখনো ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের বসবাসের এলাকা তাদের গোত্র প্রধান বা রাজা বা কারুর নামে অথবা তাদের কোন নিজস্ব জাতির শব্দের নামে নামকরণ হয়েছে। যেমন—শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতির কোচ, গারো ও হাজং এলাকায় একটি স্থানের নাম রাংটিয়া। হিন্দুদের রাজত্বকালে তাদের দেব-দেবীর নামানুসারে অনেক স্থানের নাম হয়েছে শিবচর, দুর্গাপুর, লক্ষ্মীপুর, রামপুর, হরিপুর।

পরবর্তীকালে মুসলমান শাসকদের শাসনকালে তাদের নামে অনেক স্থানের নামকরণ হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর, নাসিরাবাদ, নবাবগঞ্জ প্রভৃতি।

www.pathagar.com

শেরপুর জেলার মানচিত্র

www.pathagar.com

ইংরেজ আমলে ঢাকা শহরের কয়েকটি রাস্তার নাম হয়েছে মিন্টু রোড, ফুলার রোড, বেইলি রোড, র‍্যাংকিন স্ট্রিট, তেমনি পাকিস্তান আমলে হয়েছে উর্দু রোড, পাক মটর। আবার দেখা যায়, শাসক ও শাসন পরিবর্তন হলে স্থানের নামেও পরিবর্তন হয়। যেমন বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাকমটর বাংলামটর হয়েছে, পাকিস্তান মাঠ বাংলাদেশ মাঠ হয়েছে। তেমনি হয়েছে বাংলা কলেজ। আইয়ুব গেট থেকে আসাদ গেট, জিন্নাহ এভিনিউ থেকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ। স্থান নামের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে ব্যক্তির নাম। বিশেষ করে বিভিন্ন সময়ে গোত্র প্রধান, সমাজ অধিপতি, জমিদার, রাষ্ট্র শাসকদের নামানুসারে বাংলাদেশের অনেক স্থানের নামকরণ হয়েছে। সম্রাট আকবরের নামে আকবর নগর থেকে শুরু করে জমিদার শের আলী গাজীর নামে শেরপুরের 'নামকরণ' এক্ষেত্রে বলা যায়।

শের আলী গাজীর নামানুসারে শেরপুর, নকলা গ্রামের নামানুসারে নকলা, অধিক পরিমাণে পাট উৎপাদনের সূত্রে নালিতাবাড়ি, সাধক সরওয়ার্দীর নামানুসারে শ্রীবরদী, ঝি ঝি পোকার গুঞ্জন থেকে ঝিনাইগাতির নামকরণ হয়েছে এরূপ ধারণা প্রচলিত। তবে শেরপুর ও শ্রীবরদীর নামকরণ নিয়ে ভিন্ন মতও রয়েছে। শেরপুর একটি প্রাচীন জনপদ। শেরপুরের আগের নাম ছিল দশকাহনিয়া। দশকাহনিয়া নামকরণ সম্পর্কেও নানা মত আছে। ইতিহাস গবেষক অধ্যাপক দেলওয়ার হোসেন বলেছেন, 'পূর্বকালে ব্রহ্মপুত্র নদ অনেক বেশি প্রশস্ত ছিল। বর্তমানকালের জামালপুর হইতে শেরপুর যাইতে হইলে সম্পূর্ণ পথ খেয়া নৌকায় পাড়ি দিতে হইত। এই পারাপারের জন্য দশ কাহনকড়ি নির্ধারিত ছিল বলে এই বিস্তৃত স্থান 'দশকাহনিয়া' নামে পরিচিত হয়'। দশকাহনিয়া সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে যে, বর্তমান বগুড়া শেরপুরের (তখন মরিচা শেরপুর বলা হতো) করোতোয়া নদী বিস্তৃত ছিল বর্তমান শেরপুর পর্যন্ত। (তখন ময়মনসিংহের দশকাহনিয়া শেরপুর) এই নদী পাড়ি দিতে যাত্রী-রা দশকাহন কড়ি দিতো বলে, ময়মনসিংহ শেরপুরের নাম দশকাহনিয়া শেরপুর হয়েছে। আবার কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, এই অঞ্চলের প্রজাদের উপর দশকাহন কড়ি বার্ষিক খাজনা ধার্য ছিল সেখান থেকে দশকাহনিয়া হয়েছে। দশকাহনি থেকে শেরপুর। এই শেরপুরের নামকরণ সম্পর্কে ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতরা বলেছেন, দিল্লির আকবর বাদশা খাতক মনসবদারী প্রদান করে দ্বাদশ পরিষদসহ বাংলাদেশের প্রেরণ করেন। এই বারো জনের মধ্যে চারজন গাজী ও চারজন মজলিস বংশীয় পরিষদ ছিলেন। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই গাজীগণ শেরপুর ও ভাওয়াল পরগনা গ্রহণ করেন। নাসিরুজিয়াল ও খালিয়াজুরি পরগানা মজলিসগণের ভাগে পড়ে। এই গাজী বংশের শেষ জমিদার ছিলেন শের আলী এবং তার নামানুসারে দশকাহনিয়া মহালের নতুন নাম হয় শেরপুর। একই তথ্য মেলে অন্যত্র, সৈয়দ মুর্তুজা আলী বলেছেন, 'ময়মনসিংহের শেরপুরের নামকরণ হয়েছে ভাওয়ালের জমিদার শের আলী গাজী থেকে' এই শেরপুর, তখন একটি পরগনা ছিল, তারপর জমিদার প্রথা বিলুপ্তির পর পৌর শহর শেরপুর, মহকুমা শেরপুর। পণ্ডিত ফসিহুর রহমান বলেছেন, 'শেরপুর, নকলা, নালিতাবাড়ি, ঝিনাইগাতি ও শ্রীবরদী উপজেলার সমন্বয়ে ১৯৮৪ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জেলা শেরপুর।'

www.pathagar.com

জেলার পাঁচটি উপজেলায় ৪৩টি ইউনিয়নে মোট ৬৭৮ গ্রাম রয়েছে। প্রত্যেকটি গ্রামের নামের উৎপত্তির ইতিহাস আছে। শেরপুরের সর্ব দক্ষিণের গ্রামের নাম 'চরখার চর'। এক সময় এই গ্রামে চরখা দিয়ে সুতা তৈরি হতো সেই জন্য গ্রামের নাম চরখার চর। চরখার চরের পাশে গ্রাম বেতমারী। এই গ্রামে আগে বেতের চাষ হতো। জঙ্গলে ঘেরা বা জঙ্গল থেকে জংগুলদি। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী গ্রাম ছনকান্দা। নদীর তীরে প্রচুর 'ছন' চাষ হতো সে কারণে কান্দা বা টিলা উঁচু জায়গার নাম হয় ছনকান্দা। কোন এক সময় বন্য হাতিকে ধরে গ্রামের মানুষ বেঁধে রেখেছিল বলে গ্রামের নাম হয়েছে হাতিবান্দা। তেমনি কোন এক সময় গ্রামের মানুষেরা হরিণ ধরেছিল সেই থেকে গ্রামের নাম হয়েছে হরিণধরা।

গ্রামের মসজিদের যিনি নামাজ পড়ান তাকে শেরপুর অঞ্চলে বলা হয় মুন্সি। দেখা যায় এই মুন্সি ব্যক্তিটি গ্রামের লোকদের কাছে খুব সম্মানিত হয় এবং বংশ পরম্পরায় মুন্সিদের কদর হয়। তাই গ্রামের এই প্রধান ব্যক্তিটির নামানুসারে যেমন বাড়ির নাম মুন্সিবাড়ি তেমনি গ্রামের নামও মুন্সিরচর হয়েছে। শেরপুরের আরও কয়েকটি গ্রাম ও এলাকার নাম একইভাবে টেংরামারি, টাকিমারি, সাপমারী, ফটিয়ামারি, রৌহা, খুনুয়া, কুমড়ার চর, কামার চর, বলাইর চর, চরশাল্পী, চরসুচারিয়া, নলবাইদ, সাতপাইক্যা, ইলশা, লসনমপুর, কুসুমহাটি, টিকারচর, ডুবারচর, পাকুরিয়া, গাজীরখামার, কামারিয়া, আলিনাপাড়া, আন্ধারিয়া, সূর্যদি, ভাতশালা, ভীমগঞ্জ, বয়রা, নবীনগর, দীঘারপাড়, কালিগঞ্জ, যোগিনিমুরা, বাজিতখিলা, হেরুয়া, ঘুঘুরাকান্দি, বারগড়িয়া, তারাকান্দি, কসবা প্রভৃতি নামকরণের ইতিহাস রয়েছে। জেলার সৃষ্টির তারিখ : ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৪। জেলার আয়তন–১,৩৫৫,৫৩ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা-১২,৯৮,৭৮১ জন। শিক্ষার হার–৩২.৫৫।

খ. ভৌগোলিক অবস্থান

শেরপুর জেলার উত্তরে মেঘালয় (ভারত), দক্ষিণ-পশ্চিমে জামালপুর জেলা ও পূর্বে ময়মনসিংহ জেলা। এ জেলার উপজেলাসমূহ পর্যায়ক্রমে পরগনা, পঞ্চায়েত, সালিসবোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ও ইউনিয়ন পরিষদ দ্বারা বিভক্ত হয়ে আসছে। ১৯৮০ সালে ইউনিয়ন পরিষদ চালু হয়।

১৯৮০ সালে গ্রাম সরকার পদ্ধতি চালু হলেও ১৯৮২ সালে বাতিল হয় এবং ২০০৩ সালের ২৭ জানুয়ারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পুনরায় তা চালু হয়। শেরপুর জেলা শেরপুর সদর, নকলা, নালিতাবাড়ি, শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতী এই পাঁচটি উপজেলা নিয়ে গঠিত। ১৯৮৮ সালের ২২ অক্টোবর গঠিত হয় জেলা পরিষদ।

গ. জনবসতির পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

সদর উপজেলার ইউনিয়নের সংখ্যা–১৪টি। ইউনিয়নস্থ গ্রামের সংখ্যা—২৫৩টি। নকলা উপজেলার ইউনিয়ন ৯টি। ইউনিয়নস্থ গ্রামের সংখ্যা-১১০টি। নালিতাবাড়ি

www.pathagar.com

উপজেলার ১২টি ইউনিয়নস্থ গ্রামের সংখ্যা—১৯০টি। শ্রীবরদী উপজেলার ইউনিয়ন-১৩টি। ইউনিয়নস্থ গ্রামের সংখ্যা—১৮৬টি। ঝিনাইগাতী উপজেলার ইউনিয়ন—০৭টি। ইউনিয়নস্থ গ্রামের সংখ্যা—৯২টি।

শেরপুর আগে কামরূপবঙ্গের অধীনে ছিল। যেটি বৃহত্তর ময়মনসিংহ যা, ব্রহ্মপুত্র নদী বা পূর্বের লোহিতসাগর তীরবর্তী অঞ্চল। এর উত্তর পাশে গারো পাহাড় অবস্থিত। এই পাহাড় এবং এর পাদদেশজুড়ে শত শত বছর ধরে বাস করছে মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত নানা জাতের মানুষ।

এদের উৎপত্তিস্থল অবন্তিনগর বা হিমালয় উপত্যকা বা তিব্বতের পাদদেশ বলে ইতিহাসের পণ্ডিত, নৃ-তাত্ত্বিক গবেষক ও সমাজ বিজ্ঞানীরা মত দিয়েছেন। বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহ, অভাব-অনটন, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও জীবনের নানান প্রয়োজনে একই গোষ্ঠীভুক্ত মানুষেরা ধীরে ধীরে পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা পার হয়ে এই অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করে। এদের আগমন নিয়ে নানা রকম মিথ, উপকথা, গল্প-কাহিনি, কিংবদন্তিও প্রচলিত আছে।

গবেষকরা আরো বলেছেন যে, এরা প্রথমে পূর্ব ভারত ও বার্মা (বর্তমান মায়ানমার) কিছু অংশজুড়ে বিস্তৃতি লাভ করে এবং পরে আসাম, কোচবিহার হয়ে বাংলাদেশে কামরূপ ও কামতাপুর এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় স্থায়ী হয়। মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত অন্য একটি বৃহদাংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এরা চাকমা, মারমা, মুরং, ত্রিপুরা, খিয়াং প্রভৃতি সম্প্রদায়। আর ময়মনসিংহ অঞ্চলে আসে গারো, হাজং, কোচ, হদি, ডালু, বানাই প্রভৃতি সম্প্রদায়।

বর্তমানে শেরপুর জেলার উত্তর সীমান্তের পাহাড় ও তার পার্শ্ববর্তী সমতলে উল্লিখিত ছয়টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষেরা বাস করছে।

কোচদের জনবসতি

কোচ হলো বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। প্রাচীনকাল থেকে তারা এই এলাকায় বসবাস করে আসছেন। তাদের ভাষা রীতিনীতি ইত্যাদি থেকে তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ময়মনসিংহ এলাকায় কয়েকটি প্রাচীন কোচ রাজ্য ছিল বলে জানা যায়। ভারতের কিছু এলাকায়ও তারা রাজত্ব করেছেন।

বাংলাদেশের কোচদের সংখ্যা ১৯৯১ সালের সরকারি হিসাব অনুযায়ী ১৬,৫৬৭ জন। তাদের প্রধান বসবাস শেরপুর জেলার শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতি ও নালিতাবাড়ি উপজেলায়। শ্রীবরদী উপজেলার কান্দাপাড়া, বালিঝুড়ি, চুকচুকি গ্রামে তারা বসবাস করেন। ঝিনাইগতি উপজেলায় তাদের আবাস হলো—শালমার, নকশি, রাংটিয়া ইত্যাদি গ্রামে। নালিতাবাড়ি উপজেলার দাওধারা, খালচান্দা, বুরুঙ্গা ও সমুচ্ছড়া গ্রামেও তাদের বসবাস।

কোচরা সাধারণত সুঠাম দেহের অধিকারী। তাদের চোখ মাঝারি ও ছোটো। নাক মাঝারি থ্যাবড়া। তাদের গায়ের রং শ্যামলা ও কালো। মেয়েদের মাথার চুল ঘন ও কালো। দেহের আকার মাঝারি লম্বা। তাদের কারো দেহে মেদ দেখা যায় না। কোচদের শরীরের কাঠামো কিছুটা গারো ও হাজংদের মত।

www.pathagar.com

গারোদের জনবসতি

গারোরা বাংলাদেশের অন্যতম ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। শত শত বছর ধরে তারা এদেশে বসবাস করছে। তাদের আদি নিবাস নিয়ে নানা রকম মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন, তাদের আদি বসতি এদেশে ছিল না। চীন থেকে তারা বাংলাদেশ ও ভারতে এসেছে। কয়েক হাজার বছর আগে গারোরা চীন থেকে তিব্বত আসে। তারা তিব্বতে শত শত বছর বাস করেন। তিব্বতে বসবাস করার কিছু প্রমাণ আছে। তিব্বতের অধিবাসী ও গারোদের মধ্যে কিছু মিল পাওয়া যায়। যেমন মুখের ভাষা বা কথ্য ভাষার মিল। রীতিনীতি ও বিশ্বাসের মিল। প্রমাণ হিসেবে আছে গারোদের তরবারি। যার নাম মিল্লাম। মিল্লামের হাতলে তিব্বতী গাভির লেজ ব্যবহার করা হত। যার পরিচয় এখনও পাওয়া যায়। তাই অনেকের মতে, তিব্বত হলো গারোদের আদি নিবাস। বলা হয়, খাবার পানি অভাবে, চাষযোগ্য জমির অভাবে এবং খারাপ আবহাওয়ার কারণে গারোরা তিব্বত ছাড়তে বাধ্য হয়।

আবার কেউ কেউ মনে করেন, এই ধারণা ঠিক নয়। তিব্বতের মানুষের সাথে, গারোদের কোন মিল নেই। আজকাল এসব ব্যাপারে অনেকে ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তাদের মতে, আদিকাল থেকে পৃথিবীর নানা জায়গায় নানা রকম মানুষ বাস করছে। আবার দরকার মত জায়গা বদল করেছে। গারোরা হয়তো আগে থেকেই এখানে ছিল। কিছু গারো মানুষ হয়তো বাইরে থেকে এসেছে। আবার কিছু এখানে থেকে চলেও গেছে। ময়মনসিংহ ও সিলেট এলাকায় তারা আগেও ছিল।

তিব্বত ছেড়ে ভূটান হয়ে তারা ভারতে আসে। বসতি স্থাপন করেন কোচ বিহার এলাকায়। সেখানে প্রায় ৪০০ বছর অবস্থান করে। কিন্তু সেখানেও বেশি দিন থাকতে পারেনি। ঐ এলাকার রাজার শত্রুতায় তারা ঐ দেশ ত্যাগ করে। শুরু হয় পূর্ব দিকে যাত্রা। গোয়ালপাড়া হয়ে আসামের কামরূপ অঞ্চলে। তখন গারোদের দলে ছিল অপরূপা সুন্দরী যুবতী 'জুগী সিল্‌চী'। ঐ এলাকার রাজা 'জুগী সিল্‌চী'র রূপে মুগ্ধ হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তারা রাজি হয়নি। ফলে রাজার সাথে যুদ্ধ বাঁধে। যুদ্ধে গারোরা পরাজিত হয়। তাই তারা অন্য পথে কামরূপে প্রবেশ করে। তাতেও বিপদ কাটেনি। সেখানকার রাজা লীলাসিং তাদের তাড়িয়ে দেয়। অনেক গারোকে হত্যা করে। তাই তারা ভীত হয়ে দক্ষিণ পূর্ব দিকে সরে আসে এবং আরামবিট নামক এক রাজার আশ্রয় চায়। আরামবিটের সাথে জুগী সিল্‌চী'র বিয়ে দিয়ে বসবাসের অনুমতি পাওয়া যায়।

কামরূপে তারা অনেক দিন বসবাস করে। তখন গারো নারীরা কামাখ্যা দেবীর পূজা করত। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অনেক গারো যুবক অংশ নেয়। সেটা আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর আগের কথা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর গারোরা বিভিন্ন দলে ছড়িয়ে পড়ে। কেউ কেউ কামরূপে থেকে যায়। মূল দলটি বর্তমান ভারতের গোয়ালপাড়া জেলায় স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। সেখানে আব্রাসেন নামক নেতার অধীনে গারো রাজ্য স্থাপন করে। আব্রাসনের নামে জায়গাটির নাম রাখা হয় 'হাব্‌রাঘাট'। বর্তমান হাবরাঘাট পরগনাই ছিল প্রথম গারো রাজ্য।

এই হাবরাঘাট এলাকার গারোরাই পরে গারো পাহাড়ের কাছাকাছি আসে। এর নেতৃত্ব দেন রাজা আবংনগা ও তার স্ত্রী। তখন পাহাড়ের নাম ছিল নকরেক। এদের

www.pathagar.com

বংশধররা পরে মূল পাহাড়ে প্রবেশ করে। এরপর দলে দলে লোক তাদের অনুসরণ করে। মূল পাহাড়ে শুরু হয় মানুষের বসতি। কারণ এখানে ছিল জুম চাষের ভাল সুযোগ। ছিল প্রচুর বনজ সম্পদ।

এই গারো পাহাড়ে বসত কালেই গারোরা নানা উপগোত্রে ভাগ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। এক পর্যায়ে নিরীহ গারোরা মূল পাহাড় ছেড়ে আশপাশে সমতল ভূমিতে বসবাস শুরু করে।

বাংলাদেশের সমতল ভূমির গারোরা তাদেরই বংশধর। গারোরা কখনোই নিজেদের গারো বলে ডাকে না। কারণ এই নামে পরিচিত হলেও তাদের মূল নাম গারো নয়। তাদের বিশ্বাস, অন্যরা এই নামে দিয়েছে। তারা মনে করে, তাদেরকে বিদ্রুপ করে 'গারো' বলা হয়। তাই এই নাম তারা পছন্দ করে না। গারোরা নিজেদের 'আচ্ছিক মান্দি' বলে ডাকে। 'আচ্ছিক মান্দি' অর্থ পাহাড়ি মানুষ। বর্তমানে গারোরা পাহাড় ও নিচু স্থানে বা সমতলে বাস করে।

তাই পরিবেশের কারণে তাদের নামেও কিছুটা পরিবর্তন এসেছে। যেমন এখন তারা 'আচ্ছিক' এবং 'মান্দি' এই দুই নামেই পরিচিতি। পাহাড়ের গারোরা নিজেদেরকে আচ্ছিক বলে। আচ্ছিক অর্থ পাহাড়। সমতল বা নিচু এলাকার গারোরা মান্দি নামে পরিচিত। মান্দি অর্থ মানুষ। বাংলাদেশের বেশিরভাগ গারো হলো সমতলবাসী। তারা নিজেকে মান্দি নামে ডাকতে পছন্দ করে। আবার অনেকে 'লামদানি' নামেও ডাকে। অনেকের মতে, গারোদের একটি বড়ো শাখা ছিল গারা-গান্‌চিং।

এরা গারো পাহাড়ের কাছাকাছি থাকতো। গারো কথাটি এদের কাছ থেকে এসেছে। কেউ বলেন, গারো পাহাড়ে বসবাসকারি এক শক্তিশালি নেতার নাম ছিল 'গারা'। সেই 'গারা' থেকে 'গারো' হয়েছে। গারোরা ছিলেন খুব সাহসী এবং একরোখা। তাই ভারতের হিন্দু জমিদার তাদের 'ঘারুয়া' বলে ডাকত। ঘারুয়া থেকে গারো হয়েছে বলে অনেকের মত।

প্রাচীন ইতিহাস থেকেও এরকম কিছু তথ্য পাওয়া যায়। গারোরা তিব্বত ছেড়ে আসার সময় নাম ছিল 'গারুমান্দি' বা 'গারুমান্দাই'। ভারতে আসার পর লোকজন বলত 'কিরাত'। হিন্দু ধর্মগ্রন্থ রামায়ণে নাম আছে গারুদাস।

মহাভারতে বলা আছে গারুদা। এই হলো মান্দি বা আচ্ছিক মান্দিদের নামের ইতিহাস। শারীরিক দিক দিয়ে গারোরা মাঝারি আকৃতির। গারো পুরুষের গড় উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ২ ইঞ্চি। লম্বা বা দীর্ঘদেহী গারো খুব কম দেখা যায়। গারোদের শারীরিক গঠন বেশ মজবুত।

সাধারণভাবে তাদের গায়ের রং শ্যামলা থেকে মেটে-পীত বর্ণের। বেশি ফর্সা বা খুব কালো চেহারার গারো বেশি দেখা যায় না। তবে মেয়েদের গায়ের রং প্রায়ই ফরসা দেখা যায়। গারোদের চুলের রং কালো, খাড়া ও সোজা। অনেকের নাক চ্যাপ্টা থেকে মাঝারি ধরনের। মুখমণ্ডল গোলাকার। চোয়াল সামান্য উঁচু। মুখমণ্ডলে লোমের পরিমাণ খুবই কম। চোখ ছোটো এবং কালো।গারো পাহাড় ও সোমেশ্বরী নদীর তীরের গারোরা দেখতে বেশ সুঠাম ও সুন্দর। গারো সমাজে ভুঁড়িওয়ালা লোক দেখা যায় না। গারো যুবতীদের দেহ সুঠাম এবং তারা বেশ হাসি খুশি স্বভাবের। গারোদের

www.pathagar.com

গড় আয়ু মোটামুটি স্বাভাবিক। শিশু মৃত্যুর হার কম বলা যায়। বৃদ্ধ গারোরা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মোটামুটি সচল থাকে। বয়সের কারণে পঙ্গু এবং অচল লোক খুব কম দেখা যায়।

হাজংদের জনবসতি

এই জেলার হাজংদের বসবাস শেরপুরের নালিতাবাড়ি, ঝিনাইগাতি ও শ্রীবরদী। ইতিহাস থেকে জানা যায় হাজংরা ক্ষত্রীয় জাতির অন্তর্গত। প্রাচীনকালে হাজংদের বসবাস ছিল হিমালয়ের অবন্তীনগরে। পরে সেখান থেকে তারা বর্তমান গৌহাটির 'হাজো' এলাকায় আসেন নানা প্রতিকূল পরিবেশের কারণে বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন হাজংরা। ১০০১ সালের দিকে আসামের টুরা অঞ্চলের পশ্চিম কড়ইবাড়িতে বসতি গড়েন। এ স্থান থেকে তারা দলবলসহ কৃষিকাজের জন্য সুবিধাজনক জায়গায় চলে যান। তারা প্রথমে বর্তমান শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলার লাউচাপরায় প্রবেশ করেন। পরে রংপুর ও দিনাজপুরে আসেন। তারপর সুসং পরগনা হয়ে ময়মনসিংহ ও ঢাকায় ছড়িয়ে পড়েন।

হাজং শব্দটি কাছাড়ি শব্দ হাজো থেকে এসেছে। কাছাড়ি ভাষায় 'হা' অর্থ পাহাড় এবং 'জ' অর্থ পর্বত। পাহাড় পর্বতে বাস করেন বলে তাদেরকে কাছাড়ি ভাষায় হাজো বলে। এই হাজো থেকে হাজোং। পরে হাইজং এবং বর্তমানে হাজং নামের উৎপত্তি।

হাজংরা বলেন 'হাজং' নামটি গারোদের দেয়া। গারো ভাষায় হা অর্থ মাটি, জং অর্থ পোকা। হাজংরা ভালো কৃষি কাজ জানতেন। কৃষি কাজের প্রতি তারা খুব বেশি মনোযোগী ছিলেন। তাই গারোরা তাদের নাম দিয়েছিল হাজং বা মাটির পোকা।

হাজংদের সমাজ প্রধানত ৩টি ভাগে বিভক্ত। যথা–পুরোহিত, অপুরোহিত ও অধিকারী। পুরোহিত সম্প্রদায় তাদের সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিন্দু ব্রাহ্মণ দিয়ে করিয়ে থাকেন। অপুরোহিত সম্প্রদায় হাজং অধিকারী পুরোহিত দিয়েই সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

হাজং সমাজে একমাত্র অধিকারী দলের পৌরহিত্য করার ও দীক্ষামন্ত্র দানের অধিকার রয়েছে। এ কারণেই এদেরকে বলা হয় অধিকারী।

শাসন ব্যবস্থার সুবিধার্থে হাজং এলাকাকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। সেগুলো হল—পাড়া, গ্রাম, চাক্‌লা বা জোয়ার ও পরগনা। কয়েকটি বাড়ি নিয়ে একটি পাড়া গঠিত হয়। পাড়া প্রধানকে বলে গাঁওবুড়া। পাড়ার প্রবীণ, সৎ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিকেই সাধারণত গাঁওবুড়া বানানো হয়। এই গাঁওবুড়া পাড়ার যাবতীয় বিচার ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন। কয়েকটি পাড়া নিয়ে গঠিত হয় একটি গ্রাম। গ্রামের প্রধানকে মোড়ল বলে। মোড়ল গাঁওবুড়াদের সহযোগিতার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেন। কয়েকটি গ্রাম মিলে চাক্‌লা বা জোয়ার গঠিত হয়। চাক্‌লা বা জোয়ার প্রধানকে চাক্‌লাদর বা জোয়ারদার বলা হয়। চাক্‌লাদার, গাঁওবুড়া ও মোড়লদের সহায়তায় যাবতীয় সামাজিক আচার বিচার করে থাকেন। কয়েকটি চাক্‌লা বা জোয়ার মিলে গঠিত হয় পরগনা। পরগনা প্রধানই হাজংদের রাজা এ রাজাই পরগনার যাবতীয় সমস্যা সমাধানে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী।

www.pathagar.com

ডালুর জনবসতি

ডালু হলো বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী। শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি, ঝিনাইগাতি তাদের প্রধান আবাস। নালিতাবাড়ি উপজেলার গোপালপুর, শাওলাতলা, পলাশিয়া, পাখিয়াতলা, কিষ্টপুর, হাতিবান্ধা ইত্যাদি গ্রাম।

ঘ. বন-পাহাড় ও পশুপাখি

পাহাড় ও বন। ধরিত্রীর অনন্য এক সৌন্দর্য-লীলা। এই সৌন্দর্য-লীলাক্ষেত্র শেরপুর জেলার আরেকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। জেলার উত্তর অংশের ভারতের মেঘালয় রাজ্যের সীমানা ঘেঁষে ছোটো ছোটো টিলা, পাহাড় ও বন দেখা যায়। প্রায় ২৪ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতী এবং নালিতাবাড়ি। এ তিনটি উপজেলাতে প্রায় ২০ হাজার হেক্টর পাহাড় ও বন রয়েছে। এসব পাহাড় এবং তৎসংলগ্ন পাদদেশে গারো, হাজং, কোচ নৃ-গোষ্ঠীদের বসবাস সুদূর অতীত থেকেই। এখানে একদা এবং আজ অবধি গারো জাতিদের ঐতিহাসিক শাসন এবং বসবাসের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। স্মরণাতীতকাল থেকেই সেকারণে এসব অঞ্চলসমূহকে গারো পাহাড় নামে চিনে সবাই।

বিভিন্ন জনের লেখা ইতিহাসেও তা দেখা যায়। একদা শেরপুরের গারো পাহাড় ছিল প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। নানা প্রজাতির শাল-গজারী, গামর, ধানছড়া, বট, বহেড়া, জিগা, আশয়, হরিতকী, আমলী, কলকা, আসকি, কড়ই, জুহা, বুটবড়ই, নিউল, শেওলা, বনমালা, ঊষা, তরুল, রঙ্গিন, সালমাক্রা, চামা, শিমুল, দুধকড়ি, রাহুলগুদা, কালিয়াসহ (স্থানীদের দেওয়া নাম) আরও নাম না জানা প্রায় শতাধিক গাছ ছিল। এসব গাছে বনের পাখিকূল বসবাস করত, বাসা বাঁধত এবং বংশ বিস্তার করত। তাদের মধ্যে শতভাগ প্রাকৃতিক সম্পদ এখন না থাকলেও দেখা যায় অনেক দুর্লভ কিছু এখনও চোখে পড়ে।

পাখিদের মধ্যে বনমোরগ, মুথুরা, হারগিলা, হামুকভাঙ্গা, নানা প্রজাতির ঘুঘু, বুলবুলি, সুঁইচূড়া, টিয়া, ময়না, রাজপক্ষী, দোয়েল, শ্যামা, ফিঙ্গে, বসন্ত বৌড়ি, পানকৌড়ি, চিল, চাতক, কাঠকুঠড়া, হরেক রকমের পেঁচা, টুনটুনি, বাবুই, চড়ই, বাজপাখি, ঈগল, হুতুম, ঝাকপাখি ইত্যাদি সহ আরো নাম জানা এবং নাম না জানা প্রায় দেড় শতাধিক পাখির বসাবস রয়েছে।

তাদের মধ্যে কোন কোন প্রজাতি মাটির উপর এবং কোন কোন প্রজাতি গাছের ডালে বাস করে এবং গাছের ফল খায়।

পাহাড়ে বিচিত্র প্রকারের বনৌষধি পাওয়া যায়। তাদের শক্তি এবং কার্যশক্তিও অনেক। শতমূল, চিরতা, হাড়জোড়া, খাড়াজোরা ইত্যাদিসহ প্রায় শত প্রজাতির বনৌষধি খুঁজে পাওয়া যায়। স্থানীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকেরা এসব বনৌষধি ভেষজ করে চিকিৎসা নিয়ে থাকে। দুরারোগ্য ব্যাধিসহ জটিল রোগের চিকিৎসা তারা এসব ওষধি গাছ থেকে ঔষধ তৈরি করে ব্যবহার করে থাকে এবং তা সহজলভ্য, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন তাই জনপ্রিয়।

www.pathagar.com

শেরপুরের উত্তর সীমান্তে সবুজ পাহাড়

পাহাড় থেকে বের হয়ে আসা বন্য হাতির পাল

www.pathagar.com

বন্যহাতি, নানা প্রজাতির বাঘ, ভালুক, হরিণ, শিয়াল, রামকুত্তা, সজারু, বনমহিষ, বনগরু, হনুমান, বানর, উল্লুক, খাটাস, লজ্জাবতীবানর, খরগোশ ইত্যাদি সরীসৃপদের মধ্যে নানা রকমের সাপ, গুঁইসাপ, বনরুই, বেজি, নেউল, কাঠবিড়ালী ইত্যাদিসহ আরো ৫০-৬০ প্রজাতির পশু বাস করে এসব পাহাড়ের বনে।

এছাড়াও বহু প্রজাতির বন আলু, ফল দায়ক গাছ, লতা, গুল্ম, ফুল, ফল বাহারি রঙের পাতাবাহার রয়েছে। ছন, বাঁশ ও বেত নলখাকড়া, ছেংনল ইত্যাদিসহ লতাগুল্ম পাহাড়ে পাওয়া যায়। নানা প্রকার মৌমাছি, প্রজাপতি, জিনুকপোকাসহ পোকামাকড়ের আবাসস্থলের জন্যে পাহাড় একটি প্রাকৃতিক পরিবারের আদর্শ উৎপত্তিস্থল।

পাহাড়ের বুক থেকে নিসৃত হওয়া জল দিয়ে ঝর্না হয় এবং এ থেকে নদী, নদী থেকে সাগর মহাসাগর হয়। বাবেলাকোনা গ্রামের বুক দিয়ে কর্ণঝোরা বাজার হয়ে জামালপুরে এসে ব্রহ্মপুত্র নদীতে গিয়ে মিশেছে একটি নদী। এ নদীকে গারোরা ঢেউফা বলে থাকে তবে কালক্রমে সরকারিভাবে এ নদীর নাম কর্ণঝোরা হয়ে গেছে। শেরপুরের গারো পাহাড়ের মাটির ধরন দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ প্রকৃতির। কোথাও কোথাও বালুর পাহাড় আর লাল রঙের মাটি এবং চিনা মাটি পাওয়া যায়। পাথরের খনির জন্যেও বেশ প্রসিদ্ধ এ জেলা। বনের ভিতরে গাছের পাতাগুলো পচে মাটি উর্বর হয়। তাই সহজেই যে কোন বীজ থেকে চারাগাছের জন্ম হয়ে বংশ বিস্তার করে থাকে। মাটির তলদেশের উপরের অংশে কেচো এবং অন্যান্য পোকামাকড় প্রচুর থাকায় মাটির উর্বরা শক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। বন, পাহাড় আর পাহাড়ি জীবজন্তুর জন্যে বিশেষ পরিচিত শেরপুর জেলা।

ঙ. নদ-নদী ও খাল-বিল

জেলার প্রধান নদ-নদী পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, মৃগী, মালঝি, ভোগাই, চেল্লাখালি, মহারশি, দশানি, কর্ণজোড়া ও সোমেশ্বরী।

শেরপুর সদর উপজেলা : নদী ৪টি। আয়তন—৮৩.৯০ হেক্টর। বিল—৯টি। আয়তন—২৫১.৩৩ হেক্টর। পুকুর—১৬০১টি। আয়তন—১৭৩.৯৭ হেক্টর। খাস পুকুর—১০টি। আয়তন—৩.৫৬ হেক্টর। ভূমির বৈশিষ্ট্য : মাটির ধরন—বেলে ও দোআঁশ মাটি। উঁচু ভূমি-১১৫১৬ হেক্টর। মাঝারি উঁচু ভূমি-১২৭৫৮ হেক্টর। মাঝারি নিচু জমি-৬৩৫০ হেক্টর। নিচু জমি—২০২৪ হেক্টর। অতি নিচু (জলা) ১৮২৪ হেক্টর। ভূমির ব্যবহার : এক ফসলি—৩২২৫ হেক্টর। দুই ফসলি—১৯২৮০ হেক্টর। তিন ফসলি—৬৫৯৫ হেক্টর। শস্য নিবিড়তা- ২১০%। প্রাকৃতিক সম্পদ : বিভিন্ন প্রকারের বালি। জলবায়ু—নাতিশীতোষ্ণ, তবে গাড়ো পাহাড় কাছে থাকায় বৃষ্টি ও শীতের পরিমাণ বেশি। বার্ষিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার গড় ৩৩.৩ ডিগ্রি সে. ও ১২ ডিগ্রি সে.। বছরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ : (২০০০-২০০৬)-২৫৪১, ১৬৭১, ২২৪৯, ১৬২৩, ২৩৭০, ২২১৭ মি.মি.। বিশেষ বৈশিষ্ট্য : ব্রহ্মপুত্রের বিস্তীর্ণ চর এলাকা।

নকলা : নদী ১.৩ বর্গ কিলোমিটার। বিল—১০টি, আয়তন—৫৪২.১৪ হেক্টর। পুকুর বেসরকারি—৩৪০৫টি, খাস পুকুর—৬টি। আয়তন—৪.৭৩ শতাংশ।

www.pathagar.com

হেসরকারি হ্যাচারী-২টি, আয়তন ৩.০৭ হেক্টর। ভূমির বৈশিষ্ট্য : মাটির ধরন—বেলে ও দোঁআশ। উঁচু জমি—২১৮৫ হেক্টর। মাঝারি উঁচু জমি ৫৭৩১ হেক্টর। মাঝারি নিচু জমি- ৪৩৫৫ হেক্টর। অতি নিচু জমি- ১৬৫৫ হেক্টর। অনাবাদি জমি ৬২৮৪ হেক্টর। এর মধ্যে অধিকাংশ জমিতে বনায়ন, নার্সারি রয়েছে। ভূমির ব্যবহার : এক ফসলি—১৮৫৪ হেক্টর। দুই ফসলি—৯০৬২ হেক্টর। তিন ফসলি-৩০২০ হেক্টর। শস্য নিবিড়তা–২০৮%। প্রাকৃতকি সম্পদঃ বালি। জয়বায়ু- নাতিশীমোষ্ণ, বছরের মোট বৃষ্টিপাত (২০০০-২০০৬) —২৫৪১, ১৬৭১, ২২৪৯, ২৩৭০, ২২১৭ মি:মি:। বার্ষিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৩৩.৩° সে. ও ১২° সে.।

পাহাড়ী ঝরনা ঝিনাইগাতী

নালিতাবাড়ি : প্রধান নদী ভোগাই। এছাড়া আছে চেল্লাখালি, মালিঝি, খলং (মৃত), কালাগাঙ (মৃত)। খাল- ৬টি। বিল- ১৯টি। খাস পুকুর- ৪২টি। পাহাড় ও টিলা—নালিতাবাড়ির উত্তর সীমান্তে বেশ কিছু পাহাড়ও টিলা রয়েছে। তন্মধ্যে বারোমারি পাহাড়, মধুটিলা, চহিদার টিলা অন্যতম। ভূমির বৈশিষ্ট্য : পাহাড়ি এলাকা বাদে নালিতাবাড়ির বাকি অংশ পলল ও পাহাড় পাদদেশীয় সমতল ভূমি। ভূমি এক ফসলি—১৪৮০ হেক্টর। দুই ফসলি–২১০০ হেক্টর। তিন ফসলি—৩৪২৫ হেক্টর। প্রাকৃতিক সম্পদঃ মূল্যবান সাদা মাটি। নুড়ি পাথর ও বোল্ডার। সাধারণ বালি। সাদাবালি (সিলিকন)। জলবায়ু—নাতিশীতোষ্ণ। তাপমাত্রার বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ—৩৩.৩° সে. সর্বনিম্ন ১২° সে.। বিশেষ বৈশিষ্ট্য : নালিতাবাড়ি খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ। এ এলাকা বৃহত্তর ময়মনসিংহের শস্যভাণ্ডার হিসাবে পরিচিত।

www.pathagar.com

শ্রীবরদী : প্রধান নদী সোমেশ্বরী। খাল–২টি। উল্লেখযোগ্য বিল–বয়শা বিল, বোচাঁদহ বিল, বড়ই কুড়ি বিল। ব্যক্তি মালিকানাধীন পুকুর–২০২৭ টি। পাহাড়-টিলা : এ উপজেলার বেশ কিছু পাহাড় ও টিলা রয়েছে। তন্মধ্যে রাজা পাহাড়, ফকির টিলা, সোনাজুড়ি, রাহুপাড়া, বান্ধাজুড়া, বন্দুক খোচা, অভয় টিলা, জয়না টিলা ও মারাকপাড়া টিলা অন্যতম। ভূমির বৈশিষ্ট্য : উঁচু-নিচু, মাঝারি উঁচু-নিচু, জলা ও পাহাড়-টিলা সমন্বিত ভূমি। উঁচু জমি—১০০৬৫ হেক্টর, নিচু জমি—৪৪১ হেক্টর। মাঝারি উঁচু—১০৩২২ হেক্টর, মাঝারি নিচু—৩৫৫০ হেক্টর। ভূমির ব্যবহার : কৃষি কাজ, বসত ভূমি, ছোটো-বড়ো কল ফ্যাক্টরি ও দোকান পাট ইত্যাদিতে ভূমি ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ : চীনা মাটি। জলবায়ু : নাতিশীতোষ্ণ। বৃষ্টিপাত—সদর উপজেলার অনুরূপ। তাপমাত্রা—সদর উপজেলার অনুরূপ। বিশেষ বৈশিষ্ট্য : ভূমির উর্বরতা।

ঝিনাইগাতী : নদী—৬টি। বিল—১১টি। খাল—১টি। পাহাড়-টিলা : গারো পাহাড়ের নিম্নাঞ্চল ও ছড়ানো ছিটানো কিছু টিলা রয়েছে। ভূমির বৈশিষ্ট্য : দো-আঁশ, বালি মাটি, কাঁকড়যুক্ত মাটি, বালি পাথর মিশ্রিত অনুর্বর ভূমি। প্রাকৃতিক সম্পদ : নুড়ি পাথর, নদীর মোটা ও চিকন দুই ধরনের উন্নত মানের বালি, গাজারি কাঠ। জলবায়ু : নাতিশীতোষ্ণ। বৃষ্টিপাত—সদর উগজেলার অনুরূপ। তাপমাত্র—সদর উপজেলার অনুরূপ। বিশেষ বৈশিষ্ট্য : পাহাড়ি ঢলের ক্ষতিকর প্রভাব।

চ. গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সদর উপজেলা : সরকারি কলেজ—২টি, বেসরকারি কলেজ–৪টি, মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়–৪৩টি (সরকারিসহ), নিম্ন মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়–১০টি, সরকারি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এণ্ড ম্যানেজমেন্ট-৩টি, সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এ্যাণ্ড ম্যানেজমেন্ট-৩টি, সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ-১টি, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-১টি। সুপরিচিতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : শেরপুর সরকারি কলেজ (১৯৬৪), শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ (১৯৭২), গোবিন্দ কুমার পিস মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট (১৯৯১), টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (২০০১), পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট (১৯৫৭)।

নকলা : কলেজ-৩টি, টেকনিক্যাল কলেজ-১টি, মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়-২৮টি, বালিকা বিদ্যালয়-৫টি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-৫৫টি, বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়-৪২, ফাজিল মাদ্রাসা-১টি, দাখিল মাদ্রাসা-১৫টি, আলিম মাদ্রাসা-২টি। সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : হাজী জাল মামুদ মহাবিদ্যালয় (১৯৭২), চৌধুরী ছবরুন্নেছা মহিলা ডিগ্রি কলেজ (১৯৯৪), পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৪৭), পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (১৯৬৪), চন্দ্রকোণা রাজলক্ষ্মী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৯), চন্দ্রকোণা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৭০), ধুকুরিয়া আফজালুন নেছা বালিকা বিদ্যালয় (১৯২২), গণপদ্দী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৩৯), গৌড়দ্বার হাইস্কুল (১৯৪০), শাহরিয়ার আলিম মাদ্রাসা (১৯৬৫), বিবিরচর রহমানিয়া মাদ্রাসা (১৯৩৫), ধুকুরিয়া এ জেড কারিগরি কলেজ (২০০০)।

www.pathagar.com

নালিতাবাড়ি : কারিগরি কলেজসহ মোট কলেজ-৫টি, ইবতেদায়ী দাখিল, আলিম, ফাজিল মিলিয়ে মাদ্রাসা-৫২টি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-৬২টি, বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়-৩৪টি। সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : নাজমূল স্মৃতি মহাবিদ্যালয় (১৯৭২), শহীদ আব্দুর রশিদ মহিলা কলেজ (১৯৯৬), তারাগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯২৭), তারাগঞ্জ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৫৯), হিরন্ময়ী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯১৯), তারাগঞ্জ ফাজিল মাদ্রাসা (১৯৫০), গড়কান্দা মহিলা আলিম মাদ্রাসা (১৯৯৪)।

শ্রীবরদী : কারিগরিসহ মোট কলেজ-৪টি, দাখিল, আলিম, ফাজিল, কামিল মিলিয়ে মাদ্রাসা-২২টি, উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল-২২টি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭৭টি, রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়-৭৪টি। সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : শ্রীবরদী সরকারি কলেজ (১৯৬৯), শ্রীবরদী মথুরানাথ বিনোদিনী সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬৪), শ্রীবরদী আকবরিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৪৫), শ্রীবরদী ইসলামিয়া কামিল মাদ্রাসা (১৯৬২), কাকিলাকুড়া ফাজিল মাদ্রাসা (১৯৫০)।

ঝিনাইগাতী : সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ঝিনাইগাতী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৩৮), আহাম্মদ নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৬০), ঝিনাইগাতী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৬১), ঘাগরা দক্ষিণপাড়া এফ রহমান উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৭০), চেঙ্গুরিয়া আনছার আলী উচ্চ বিদ্যালয় (১৯৭১), গোল্ডেন স্টার প্রিক্যাডেট ঐ্যান্ড হাই স্কুল (১৯৯৯), আলহাজ শফিউদ্দিন আহাম্মদ কলেজ (১৯৮৬), তিনানী আদর্শ কলেজ (১৯৮৬), ঝিনাইগাতী মহিলা আদর্শ মহাবিদ্যালয় (২০০২), ডা. সেরাজুল হক টেকনিক্যাল এ্যান্ড কৃষি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট (২০০১), দিঘীরপাড় আলিম মাদ্রাসা (১৯৬২)।

সাক্ষরতার হার : আনুষ্ঠানিক-৪০%। অনানুষ্ঠানিক ৩০%। এনজিও (জাতীয় এনজিও ছাড়া) : জেলায় এনজিও সংখ্যা-৫০০ (পাঁচশত)এর অধিক।

উন্নয়ন কার্যক্রম : দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বয়স্ক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কুটির শিল্পের মাধ্যমে যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান, বৃক্ষরোপণ, পরিবার পরিকল্পনা, মহিলাদের সেলাই ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, মৎস্য চাষ, হাঁসমুরগি পালন, পাঠাগার স্থাপন, রাস্তাঘাট মেরামত ও সামাজিক উন্নয়ন, নারী-শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, মা ও শিশুদের টিকাদান কার্যক্রমে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন, মক্তব্য পরিচালনা, গণশিক্ষা কার্যক্রম, বেকারত্ব দূরীকরণ, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের স্বনির্ভরতা অর্জনের কার্যক্রমসহ অন্যান্য সমাজসেবামূলক কার্যক্রম।

ছ. ঐতিহাসিক স্থাপনা

সদর উপজেলা : নয়আনি জমিদার বাড়ির নাট মন্দির, পনে তিনআনি জমিদার রঙমহল, রঘুনাথ জিউর মন্দির, মাইসাহেবা মসজিদ, কসবার মোঘল মসজিদ, জি.কে.পি. এম ইনস্টিটিউট, বানছিয়া বিল্ডিং, তিনআনি জমিদার বাড়ি, শুকুরের

www.pathagar.com

দালান। মসজিদ–৫৩৯টি, মন্দির–২৪টি, গির্জা–০১টি, মঠ–৬টি। তীর্থস্থান–হযরত শাহ কামাল (রঃ) এর মাজার, মাইসাহেবা মসজিদ (১৮৬১), রঘুনাথা জিউর মন্দির (১৩৯৭ই), বয়ড়া ছাওয়াল পীরের দরগা, নরসিংহ জিউর আখরা (১৪১৬)।

নকলা : রুণী গাঁয়ে গাজীর দরগাহ, চন্দ্রকোণা রাজলক্ষ্মী উচ্চ বিদ্যালয়, কলাপাড়া মসজিদ। নমসজিদ–২১৮টি, মন্দির–৪টি, গির্জা–১টি।

নালিতাবাড়ি : সিধুলি গ্রামের চড়ুই পুতুলি পুকুর সংস্কারে আবিষ্কৃত প্রত্ন নিদর্শন। শালমারা গ্রামের সামন্তরাজা বা বৌদ্ধ বিহারের অবশেষ চিহ্ন। মসজিদ–৩৬৪টি, মন্দির ২০টি, গির্জা–১৯টি।

শ্রীবরদী : গড়জরিপার বারোদুয়ারি মসজিদ।

ঝিনাইগাতী : মসজিদ–২৫৩টি, মন্দির ৩৮টি, গির্জা–১১টি। চারু-কারু কীর্তি-পিকনিক স্পট, গজনী অবকাশের নয়নাভিরাম লেক, মৎস্যকন্যা, নৌকা, সিংহের মুখের সুড়ঙ্গপথ, সুউচ্চ টাওয়ার, পদ্মসিঁড়ি, ডাইনোসরসহ বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের প্রতিকৃতি, মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য, ফুলে ফুলে লেখা অবকাশ।

অন্যান্য ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য : শেরপুর সদর উপজেলা এলাকায় জনপদ গড়ে ওঠার পেছনে ব্রহ্মপুত্র নদের গতি পরিবর্তনের ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে পাহাড়ি নদী কর্ণঝোরার ঘন ঘন গতি পরিবর্তনের ফলে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসছে শ্রীবরদী উপজেরার বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ।

বারো দুয়ারি মসজিদ

www.pathagar.com

জ. রাজনৈতিক ঐতিহ্য ও ব্যক্তি

ফকির বিদ্রোহ, বকসার বিদ্রোহ, জানকু পাথরের বিদ্রোহ, জমিদারি প্রথা-মহাজনী প্রথা উচ্ছেদ আন্দোলন, ভাওয়ালী-তেভাগা-টঙ্ক ইত্যাদি প্রথা অবসানের আন্দোলন, ১৯৪৭ পরবর্তী ভাষা আন্দোলন এবং পরবর্তী সময়ের সবগুলো আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণ-অভ্যুত্থান ও ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র জেলা জুড়েই এসব বিদ্রোহ ও আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ জেলার বহুসংখ্যক মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারকে ধারণ করেছেন যাঁরা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন :

সদর উপজেলা : ফকির মজনু শাহ, নূরুল মুহাম্মদ, হিরজী খাঁ, টিপু পাগলা, বাকসু সরকার, গুমানু সরকার, দ্বীপচাঁদ সরকার, জানকু পাথর, দুবরাজ পাথর, শেরআলী গাজী, চীনা সাহেব (মৌলভী), গজদীশ নাগ প্রমুখ।

নকলা : আক্তারুজ্জামান (ময়সর সরকার), খন্দকার আতাউর রহমান, মমতাজ উদ্দিন সরকার, নবীর উদ্দিন সরকার, নগেন মোদক, সুধেন্দু দাস প্রমুখ।

নালিতাবাড়ি : জলধর পাল, শচী রায়, ডা. আব্দুল হামিদ, আব্দুল হাকিম সরকার, আইন উদ্দিন, সদর মামুদ সরকার, মেহের আলী সরকার, নারি মামুদ সরকার, জমির উদ্দিন, কাদির মামুদ সরকার, মহিউদ্দিন সরকার, আব্দুল জব্বার, মজিবর রহমান, আলেপ উদ্দিন, সমশের আলী, মদন মোহন হাজং প্রমুখ।

শ্রীবরদী : কফিল উদ্দিন মোক্তার, আব্দুস সামাদ তালুকদার।

ঝিনাইগাতী : টিপু সর্দার, মজনু শাহ, বাকসু সরকার, গুমানু সরকার, দ্বীপচাঁদ, দুবরাজ পাথর, জানুক পাথর প্রমুখ। সমসাময়িক অনেক উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ও সমাজসেবকের মধ্যে রয়েছেন :

শেরপুর সদর উপজেলা : মো. ফজলুর রহমান (খান বাহাদুর), সুরেন্দ্র মোহন সাহা, বিপ্লবী রবি নিয়োগী, কাজী মোহছেন, খন্দকার আব্দুল হামিদ, শহীদ তালেব আলী কর্মকার, শহীদ নাজমূল আলম বুলবুল, কমরেড জ্যোৎস্না নিয়োগী।

নকলা : মন্মথ দে (পাচু বাবু), ডা. নূর মোহাম্মদ, ডা. মো. শরাফত উদ্দিন, জাস্টিস বদিউজ্জামান, ডা. নাদেরুজ্জামান, ডা. আমজাদ হোসেন, শাহ মো. মোজাম্মেল হক, আতর আলী মাস্টার।

নালিতাবাড়ি : নগেন্দ্র চন্দ্র পাল, ডা. আব্দুল হামিদ, আব্দুল হাকিম সরকার, মেহের আলী সরকার, অধ্যক্ষ আবু তাহের।

শ্রীবরদী : সীতানাথ বর্মন, ললিত মোহন পাল, কামিনী হোমন সাহা, আলহাজ জোনাব আলী, আকবর আলী মুন্সি।

ঝিনাইগাতী : জিতেন্দ্র সাংমা, আলহাজ শফিউদ্দিন আহমেদ, হাজী শমসের আলী, সাহাজ উদ্দিন সরকার। সমসাময়িক ব্যক্তিত্বদের মধ্যে রয়েছেন :

শেরপুর সদর উপজেলা : আনিছুর রহমান এডভোকেট, আব্দুস সামাদ এডভোকেট, নিজামউদ্দিন আহমেদ, মুহসীন আলী, সৈয়দ আব্দুল হান্নান, মোহাম্মদ

www.pathagar.com

শহীদুল্লাহ, খন্দকার মজিবুর রহমান, আমজাদ হোসেন, অবিনাশ গোস্বামী, পণ্ডিত ফসিহুর রহমান, ড. গোলাম রহমান রতন, আতিউর রহমান আতিক, এডভোকেট আকতারুজ্জামান, জয়শ্রী নাগ, রাজিয়া সামাদ ডালিয়া।

নকলা : সাংবাদিক বজলুর রহমান, রাজনীতিবিদ বেগম মতিয়া চৌধুরী, মো. মিজানুর রহমান, আলহাজ জাহেদ আলী চৌধুরী, ব্যারিস্টার হায়দার আলী, ডা. কে জামান, এডভোকেট ফিরোজ উদ্দিন আহামমে্দ, মো. শহীদুল আলম, দেওয়ান নূরুল আসিরাম দরবেশ, নবী হোসেন তালুকদার, রেবেকা সুলতানা, মুহা. হারুনুর রশিদ।

নালিতাবাড়ি : অধ্যাপক আব্দুস সালাম, মৌলভী সৈয়দ আহাম্মদ মো. আব্দুস সামাদ ফারুক, ডা. সুলতানা জাহান, সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল, শিল্পপতি আব্দুল হাই, আলহাজ আব্দুর রহমান, মো. বদিউজ্জামান বাদশা, বিরূপাক্ষ পাল, আব্দুল হাকিম উকিল, তানভিরুল হক আকন্দ।

শ্রীবরদী : আব্দল্লাহ আল মামুন, মো. আব্দুল্লাহেল খসরু, আমিনুর ইসলাম ঠাকুর এ.কে.এম. ওবায়দুর রহমান, আব্দুল মাজেদ সওদাগর, ভূপেন্দ্র মান্দা, অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম, আলহাজ মো. হাবিবুল্লাহ, আলহাজ শাহ মোশারফ হোসেন।

ঝিনাইগাতী : অধ্যাপক সাঈদ আহাম্মেদ, মো. জমসেদ আলী, মো. সাইফুল ইসলাম, ফকির আব্দুল মান্নান, মো. তসির উদ্দিন, মো. হাবিবুর রহমান, এমতাজল ইসলাম আবু, সৈয়দ আহমদ, মো. আব্দুল ওয়াহেদ, এডভোকেট শহীদুল ইসলাম, রাবেতা ম্রং, আলহাজ মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ খালিছুর রহমান।

লেখক-কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পী

শেরপুর সদর উপজেলা : হরচন্দ্র চৌধুরী, চারুচন্দ্র চৌধুরী, হরকিশোর চৌধুরী, কিশোরী মোহন চৌধুরী, হিরণময়ী চৌধুরাণী, পণ্ডিত হরসুন্দর তর্করত্ন, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, বিজয় চন্দ্র নাগ, মৌলভী বছির উদ্দিন, মৌলভী উজে উদ্দিন, মুনসী করিম বক্স, নঈমউদ্দিন, ফজলুর রহমান আজনবী, লোকগবেষক সুনীলবরণ দে, ড. বি. এল চৌধুরী, ডি এসসি (এশিয়াটিক সোসাইটিতে কর্মরত ছিলেন), মীনা ফারাহ, কবি শাহজাদী আঞ্জুমান আরা, কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর, কবি ও গবেষক ডক্টর শিহাব শাহরিয়ার প্রমুখ।

শ্রীবরদী : গোলাম মোহাম্মদ, লুলু আবদুর রহমান। শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন :

সদর উপজেলা : চিত্র ও আলোকচিত্র শিল্পী রামসুন্দর দে, শরৎচন্দ্র দে। নাট্যশিল্পী শ্রীপতি চৌধুরী, মোহিনী মোহন বল। বেহালা বাদক–বনমালী রায় কর্মকার। তবলচি–জয়গোপাল সাহা।

নলিতাবাড়ি : সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল।

ঝ. মুক্তিযুদ্ধ

বাঙালির ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনেক পুরানো। সিন্ধু নদের উপত্যকায় যে সভ্যতা বিলীন হলো তার পররবর্তী হরপ্পা-মহেঞ্জদারো আর পাহাড়পুর সভ্যতার মধ্যেই পাওয়া যায় বাঙালির প্রাচীনসব ঐতিহ্যিক উপাদান। সর্বশেষ আবিষ্কার ঢাকার অদূরে

www.pathagar.com

উয়ারিবটেশ্বর। সভ্যতায় আড়াই হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু বড়ো দুর্ভাগ্য বাঙালি জাতির—এতো প্রাচীন ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ দীর্ঘ বছর পরাধীনতার শৃঙ্খলে আটকা পড়েছিল জীবন। শোষণ-শাসন, নিপীড়িন-নির্যাতন আর আন্দোলন-সংগ্রাম করে করে শত-সহস্র বছর পার করে দিয়েছে শ্যামল জনপদের শ্যামল-বর্ণের মানুষেরা। অবশেষে যেন মাহেন্দ্র ক্ষণটি এলো ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে। নদী মেখলা সবুজ জনভূমি থেকে উঠে এলেন এক মহান কীর্তিমান পুরুষ যার নাম বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে ধ্বনিত হলো—শেখ মুজিব, শেখ মুজিব, শেখ মুজিব। কী মহামন্ত্রমুগ্ধকর চিরন্তন মুক্তির বাণী–'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। কবি নির্মলেন্দু গুণ বললেন, "অতঃপর 'স্বাধীনতা' শব্দটি আমাদের হলো"। সত্যি হলো। সত্যি আজ আমরা স্বাধীন। এই স্বাধীনতার জন্যে তামাটে বাঙালি জাতিকে দীর্ঘ দিন সংগ্রাম ও আন্দোলন করতে হয়েছে।

বাঙালির রাজনীতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রকৃত সুতিকাগার ১৯৫২ সাল। '৫২-র রক্তসিঁড়ি বেয়েই স্বাধীনতা ও বিজয়ের মূল সূচনা হয়েছিল। অই থোকা থোকা নাম–রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম। বুকের রক্ত কতটুকুইবা? সবটুকু ঢেলে দিয়ে বললেন, 'এই নাও স্বাধীনতা নাম'? মায়ের জন্য, মাটির জন্য, মাতৃভূমির জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করে আরো বললেন, আজ থেকে এই নদী-পাখি, ফুল-ফলের গন্ধমাখা দেশে সবাই গাইবে, 'মোদের গরব, মোদের আশা আ-মরি বাংলা ভাষা'। তখন আমরা আমাদের মায়ের বদনখানি সূর্যালোকে দেখি–আহা কী অপূর্ব সুন্দর। আবারও গেয়ে উঠি 'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা'।

সেই যে শুরু আর থামেনি বাঙালি। '৫২ থেকে '৭১–রক্তসিঁড়ি থেকে রক্তনদী। ধাপগুলো ছিল '৫৪, '৫৮, '৬২, '৬৬, '৬৯, '৭০ এবং ১৯৭১। চূড়ান্ত বলেই যেন হাজার বছরের পরাধীনতা থেকে মুক্তির মরণপণ লড়াই। এই মরণপণ লড়াইয়ের যিনি নেতৃত্ব দিলেন হাজার বছরের বাঙালির অবিসংবাদিত মহান নেতা, স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে মুক্তযুদ্ধ শুরু হয় শেরপুরেও। শেরপুর ছিল ১১ নম্বর সেক্টরের অধীনে। ২৫ মার্চ রাতে ঢাকায় যে নির্মম ও নারকীয় হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় তার খবর শেরপুরেও পৌঁছে যায়। শেরপুরের তৎকালীন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টিসহ প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন মিলে মার্চের শেষ সপ্তাহে গঠন করেন সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। এই পরিষদে ছিলেন তৎকালীন আওয়ামী লীগের এমপি জনাব নিজাম উদ্দিন, এমএনএন জনাব আনিসুর রহমান, জনাব আবদুল হালিম, আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট আবদুস সামাদ, সাধারণ সম্পাদক মোহসীন আলী মাস্টার, কমিউনিস্ট পার্টির বাবু রবি নিয়োগী, ছাত্রলীগের সভাপতি আমজাদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মো. আখতারুজ্জামান, ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি গোলাম রহমান প্রমুখ। এই সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ মধুপুর পর্যন্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু এপ্রিলের মাঝামাঝিতে জামালপুর ও শেরপুরের

www.pathagar.com

মধ্যবর্তী নদীঘাটে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হেলিকপ্টার থেকে সেল নিক্ষেপ করে এবং এতে আহত হয় অনেক মানুষ। আহতদেরকে উভয় শহরের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর এপ্রিলের শেষ দিকে সংগ্রাম পরিষদের তরুণরা প্রশিক্ষণের জন্যে সীমান্ত পার হয়ে ভারতের মেঘালয় রাজ্যের তোরা প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যান। প্রাথমিক দলে ছিলেন প্রায় ৩৫ জন তরুণ। এখানে ময়মনসিংহ থেকে আসা নাজমুল হক তারা প্রশিক্ষণকালীন কোম্পানি কমাণ্ডার ছিলেন এবং যুদ্ধকালীন কমাণ্ডার হন ময়মনসিংহের পুলিশ লাইনের শিক্ষক শামসুল আলম। ধীরে ধীরে ক্যাম্পে আসে প্রায় আরো ৭০ জন তরুণ। মোট প্রায় ১০০ জন তরুণ প্রশিক্ষণ নিতে পুরাকাশিয়া ক্যাম্পে যান। এই ক্যাম্প থেকেই তারা সীমান্ত অতিক্রম করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

এদিকে এপ্রিলের মাঝামাঝিতে শেরপুর শহরের জি,কে.স্কুলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ক্যাম্প করে। ক্যাম্পের পাশেই শেরপুর থানায় একটি বড়ো আক্রমণ করে নভেম্বরে। আক্রমণে অংশ নেন মুক্তিযোদ্ধা মুজিবর, চান মিয়া, দুলাল মিয়া, আবদুর রহমানসহ কয়েকজন।

এই অপারেশনের নেতৃত্ব দেন মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার গিয়াস। তারা নবীনগর বাসস্ট্যান্ড থেকে সেলিং করে থানায়। এরপর সরাসরি যুদ্ধ হয় হানাদার বাহিনীর সঙ্গে। এতে মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রশীদের পেটে গুলি লাগে এবং অপরদিকে পাকিস্তানি হানাদারদের সহায়তাকারী ২ আলবদরও আহত হয়।

অপর অপারেশনটি হয় নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। শেরপুর ও জামালপুর সংযোগ ব্রিজ– শেরিব্রিজ-এ। এই ব্রিজ দিয়েই পাকিস্তানি সৈন্যরা জামালপুর-শেরপুর যাতায়াত করত। মুক্তিযোদ্ধারা চিন্তা করলো ব্রিজটি উড়িয়ে দিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। তৎকালীন ইপিআর সদস্য মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার আবদুল খালেকের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা আশরাফুল আলম, মকসেদুর রহমান হিমু, কর্নেল আরিফ প্রমুখের দল এই অপারেশনে অংশ নেন। তারা ব্রিজের নিচে একটি শক্তিশালী এক্সক্লুসিভ ফিট করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এটি ফাটেনি এবং ব্রিজ পাহাদারকারী হানাদার সদস্যরা তা টের পায় এবং এক্সক্লুসিভটি সেখান থেকে সরিয়ে ফেলে।

আর একটি যুদ্ধ হয়—কুড়িকাউনিয়া ব্রিজের কাছে। এটি রাত্রিকালীন যুদ্ধ। এতে হানাদারবাহিনীর ১ জন মারা যায় এবং মুক্তিযোদ্ধা বুলবুল গুলিবিদ্ধ হয়। আহত বুলবুলকে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা দল সীমান্তের দিকে চলে যায় এবং বেলা উঠার পরপর তারা তোরা হাসপাতালের দিকে নিয়ে যায়, কিন্তু পথিমধ্যেই বুলবুল শহীদ হন। তাকে সেখানেই দাফন করা হয়। শেরপুরের প্রতিভাবান তরুণ তৎকালীন ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল আলম শহীদ হন শেরপুর-ঝিনাইগাতীর পথে কাটাখালি ব্রিজের কাছে এক যুদ্ধে। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ২ জন মারা যায়।

www.pathagar.com

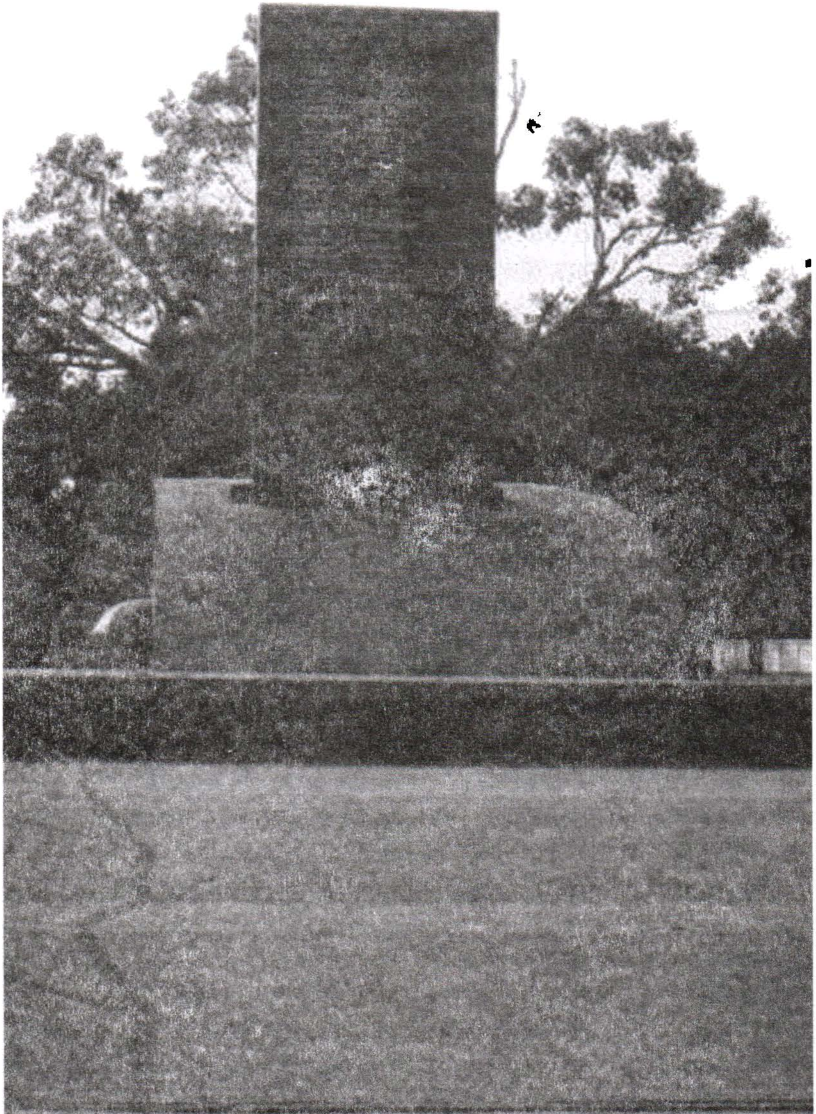

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ

www.pathagar.com

তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি কামারুজ্জামানের নেতৃত্বে সংখ্যালঘুদেরকে নির্যাতন, সাধারণ মানুষদের ওপর অত্যাচার এবং মানুষ হত্যা করা হয় শেরপুরে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহায়তাকারী ও এই বাঙালি দোসর কামারুজ্জান অবর্ণনীয় অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। শহরের সুরেন্দ্র মোহন সাহার বাড়িতে কামারুজ্জামান একটি নির্যাতন কক্ষ তৈরি করে এবং সেখানে বাঙালিদের নির্মম অত্যাচার করে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। যার সাক্ষী সুরেন সাহার কন্যা লেখক মীনা ফারাহ। তার বর্ণনাতে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দীর্ঘ নয় মাস অনেক ধ্বংসযজ্ঞ ও ক্ষয়-ক্ষতি করে শেরপুর জেলায়। শেরপুরে ঢুকেই তারা শহরের নয়ানি বাজারে ব্যবসায়ীদের এলাকা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় এবং সেখানে একটি মন্দিরের পুরোহিতকে গুলি করে হত্যা করে। শেরপুরকে মুক্ত করার জন্য আরো কয়েকটি মুক্তিযোদ্ধা দল দিন রাত কষ্ট করে। অবশেষে ৭ ডিসেম্বর শেরপুর শত্রু মুক্ত হয়। সেদিন পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয় অধিনায়ক জগজিৎ সিং অরোরা হেলিকপ্টারে শহরের জি.কে. স্কুলের সামনে দারোগা আলি পৌর পার্কে অবতরণ করেন এবং আনুষ্ঠানিভাবে বাংলাদেশের পতাকা উত্তলন করেন। সেখানে হাজার হাজার বাঙালি জড়ো হয় এবং 'জয় বাংলা' বলে স্লোগান দেয়, স্বাধীন স্বাধীন ধ্বনি তোলে।

ঞ. বিখ্যাত গায়ক, শিল্পী ও কবিয়ালের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ভাবসংগীতের আরেক নাম বাউল বা বয়াতি গান। সংগীতের আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে বাউল শিল্পীরা স্রষ্টার নিগূঢ় তত্ত্ব-রহস্যকে অপূর্ব ব্যঞ্জনায় তুলে ধরেন। এই বাউল গানের এক ঐশ্বর্যময় জায়গা হলো শেরপুর। পূর্বের বৃহত্তর ময়মনসিংহের অংশ নদী-মেখলা শেরপুরের লোক-সংস্কৃতির এক অসাধারণ ধারা হলো বাউল বা বয়াতি গান। এই অঞ্চলে প্রাচীনকাল থেকেই ফকির, পাগল, দরবেশ ও আধ্যাত্মিক সাধকদের অবস্থানের কথা জানা যায়। অনেক মাজার ও ফকির-পাগলদের আস্তানাও দেখা যেত ও যায়। সেসব স্থান বা জায়গাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের সাধন-ভজন ও আসর। জানা যায়, বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও ফকির-কামেল-পাগলরা এখানে এসে আস্তানা গেড়েছে। তারা আধ্যাত্মিক গানের পাশাপাশি এই উর্বর মাটি, বিস্তৃত মাঠ, নদীর কলতান ও মানুষের বিরহ-বেদনাকে ধারণ করে ফুটিয়ে তুলতেন তাদের গানে গানে। আর তাদের মাধ্যমেই তৈরি হয়েছে এখানকার অনেক বাউল। পাশাপাশি কিস্সাপালা, মঞ্চপালার প্রচলনও ছিল। তবে শেরপুর অঞ্চলের বাউল বা বয়াতিদের আদর্শও বাউলশ্রেষ্ঠ ফকির লালন সাঁই।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত শেরপুর অঞ্চলেও বাউল গান সমাজ জীবনের অনুষঙ্গ হলেও সর্বদাই থেকেছে অবহেলিত। কেবল মানুষের ভালবাসাই ছিল বাউল শিল্পীদের প্রেরণার উৎস। হারমোনিয়াম, একতারা, দোতারা, বেহালা, বাঁশি, ডুগডুগি, মন্দিরা, সরাজ, ঢোলক ইত্যাদি হালকা ও সাধরাণ যন্ত্রের মাধ্যমেই বাউলরা গান পাগল মানুষের মন জয় করে যাচ্ছে অবিরত।

www.pathagar.com

শেরপুর জেলায় বর্তমানে ৫ থেকে ৬ জন বাউল রয়েছেন, যারা তাদের নামের সাথে বয়াতি যুক্ত করেছেন। এদের মধ্যে শেরপুর সদরের মকবুল বয়াতি, পাগলা তারা বাউল, নালিতাবাড়ি উপজেলার তারা বাউল, আমজাদ বয়াতি ও আবেদ বয়াতি উল্লেখযোগ্য। এরা প্রায় ৫০-৬০ বছর ধরে বাউল সংগীতের নানা মাত্রার গান করে যাচ্ছেন। এদের গুরুরা অধিকাংশই মৃত্যুবরণ করেছেন। নিজের অঞ্চল ছাড়াও এই বাউলরা দেশের বিভিন্ন এলাকায় গান করে বেড়ান। তবে মকবুল বয়াতির এখন অনেক বয়স এবং শারীরিকভাবে অসুস্থ তিনি। প্রায় ৩৭-৩৮ বছর আগে সারা রাত ধরে আমরা আমাদের শেরপুরের সর্বদক্ষিণের গ্রাম চরখারচরে মকবুল বয়াতির কালুগাজী, হরমুজ বাদশা, গফুর বাদশা, বানেছাপরি কিস্‌সাগুলো শুনেছিলাম। তিনি এখন স্বাভাবিক কথা-বার্তা বলতে পারেন না বলে, তাঁর সাক্ষাৎকার এই সময়ে নেওয়া গেল না।

পাগল তারা বাউল

বাউল শিল্পী পাগল তারা মিয়া শেরপুর জেলার একটি পরিচিত নাম। দোতরা তার জীবনের সাথী। একাগ্র সাধনার বলে ভাব, দেহতত্ত্ব, বাউল গান, জারি গান, শেরপুরের ঐতিহ্যবাহী মরিচা গান আয়ত্ব করেছেন বাল্যকাল থেকেই। এ যাবৎ প্রায় ৩০০টি গান রচনা করেছেন। ইতোমধ্যে পেয়েছেন অনেক পুরস্কার ও সম্মান।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার নাম জানতে চাই?

তারা বাউল : আমার বাব-দাদার দেওয়া আসল নাম তাজ্জামল হক তারা। এখন তারা বাউল নামেই সবার কাছে পরিচিত হয়েছি। তবে শেরপুর অঞ্চল ছাড়া সারা বাংলাদেশে আমার নাম পাগল তারা বাউল হিসেবে পরিচিত।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার জন্ম কবে ও কোথায়?

তারা বাউল : আমার জন্ম ১৯৬২ সালের ১৮ অক্টোবর। শেরপুর জেলার বাজিতখিলা ইউনিয়নের বাজিতখিলা গ্রামে।

প্রধান সমন্বয়কারী: আপনার পিতা-মাতার নাম বলুন এবং তারা কী করতেন?

তারা বাউল : আমার পিতার নাম–মরহুম ফসিউদ্দিন এবং মাতার নাম–মরহুমা সবিতুন নেছা। বাবার পেশা ছিল ব্যবসা কিন্তু নেশা ছিল গান করা। তেমন নামকরা কোনো গায়ক ছিলেন না তবে এলাকায় খুব জনপ্রিয় ছিলেন কিস্‌সা গানের গায়ক হিসেবে। আপনারা জানেন, এ অঞ্চলে এক সময় কালুগাজী, হরমুজ বাদশা, গফুর বাদশা, বানেছাপরি কিস্‌সাগুলো এক রকম ঘরোয়া পরিবেশেই গাইতেন। তবে কোনো বাদযন্ত্র দিয়ে গাইতেন না। একটি মাত্র সারিন্দা বাজাতেন, যেটি নিজেই তৈরি করতেন শোলা দিয়ে। তার সঙ্গে থাকতেন একজন দোহারি যার নাম ছিল–আসর উদ্দিন। আর আমার ছিলেন একজন গৃহিনী।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার পূর্ব-পুরুষের কারোর নাম মনে থাকলে বলুন এবং আপনারা কয় ভাই-বোন?

তারা বাউল : আমার দাদার নাম–নছি খান, যিনি কৃষক ছিলেন। আমরা ৫ ভাই ২ বোন। আমি সবার ছোটো।

www.pathagar.com

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার শৈশব, পড়াশোনা এবং সে সময়কার কথা জানতে চাই?

তারা বাউল : শেরপুরেই আমি বড়ো হয়েছি। পড়াশোনা হাফেজি পড়েছি–১৯ পারা, বাংলা আলেয়া মাদ্রাসায় অষ্টম শ্রেণি। আর বেশি দূর যেতে পারিনি। তবে ছোটোবেলায় গান শোনার দারুণ নেশা ছিল। আমাদের চর এলাকায় গিয়ে আহাদ গায়েন, বনিজ গায়েন, নেছু পাগলা–এদের গান শুনতাম। তারপর বাবার গাওয়া কিস্সা তো শুনতামই মন দিয়ে। এছাড়া কবি ফজল হক ড্রাইভারের গান আমাকে তখন আকৃষ্ট করত। ফজল হক সাহেব ড্রাইভারি করতেন কিন্তু অসাধারণ গান রচনা, সুর এবং গাওয়ার ক্ষমতা ছিল। তিনি জেলা বাউল সমিতির সভাপতি ছিলেন–কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। প্রধান সমন্বয়কারী : বাউল গানের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হলেন?

তারা বাউল : বাউল গানের সাথে যুক্ত হওয়া বা গানের এই জগতে আসা আমার জীবনে এক অদ্ভুত ঘটনা। হাফিজি পড়ার পর আমি পাশের গ্রাম সুলতানপুরে জমসেদ মেম্বারের বাড়িতে মসজিদের ইমামতি করতাম। রমজান মাসে তারাবি পড়াতাম। একদিন তারাবি পড়িয়ে বাড়ি ফেরার পথে হাশিম ফকিরের সাথে দেখা হয়। তার আসল বাড়ি গাজির খামারে। সেখান থেকে পাকাপাকিভাবে শ্বশুর বাড়ির এইখানে এসে স্থায়ী হন। তখন তার বয়স হবে ৭০ বছরের মত। ঐদিন রাতে তিনি একতারা বাজিয়ে গান করছেন এবং কাঁদছেন। প্রথম যে গানটি গাইছিলেন সেটি নেত্রকোনার জালাল খার গান–'কাজল বরণ রূপের কন্যা লো দুনিয়া তোর পিছে/ তোর মত রূপের কন্যা আর কী ভবে আছে?' দ্বিতীয় গানটি ছিল–'আমি কোন ঘাটে কলসী ভরাই, আমি যে ঘাটেই যাই অই ঘাটেতেই কালো রূপ দেখতে পাই'। গান দু'টি শোনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। পরদিন থেকে তার কাছে যাওয়া শুরু করলাম। তিনি গাজা খেতেন, আমি তাতে আসক্ত হয়নি। নামাজ পড়ানো ছেড়ে ফকিরের সাথে বসা এটি আরবার থেকে শুরু করে পাড়া প্রতিবেশি সকলেই মন্দ বলতে থাকলেন। কিন্তু আমি ফকিরের কান্না এবং গানের ভক্ত হয়ে তার কাছেই পড়ে থাকলাম এবং গান শিখতে আরম্ভ করলাম। সকলের গাল-মন্দ ও কলঙ্ক মাথায় নিয়েই দারুণ আসক্ত হলাম ফকিরের গানে। তিনি আমাকে আশীর্বাদ দিয়ে বললেন, তুমি একদিন খুব বড়ো গায়ক হবা বাবা। সেই সঙ্গে খালেক দেওয়ানের একটি গানের বই আমাকে উপহার দিলেন। এরপর শেরপুরে পরিচয় নওশের পাগলে সঙ্গে। তিনি ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে এসে এখানে আশ্রয় নেন। তিনি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ ছিলেন। আমি ধীরে ধীরে তার কাছে যেত শুরু করলাম। তিনিও আমাকে আশীর্বাদ ও দোয়া করলেন। শুরু হলো আমার নতুন সাধনার জীবন। প্রধান সমন্বয়কারী : এই অঞ্চলকে কী বাউল গানের জন্য বিখ্যাত মনে হয়, হলে কীভাবে?

তারা বাউল : আমাদের এই অঞ্চল অবশ্যই বাউল গানের জন্য বিখ্যাত। কারণ আপনারা জানেন–আমরা এক সময় বৃহত্তর ময়মনসিংহের বাসিন্দা ছিলাম। ময়মনসিংহ অঞ্চল মানেই বাউল গানের অনন্য ভূমি। এখানে অনেক বাউল শিল্পীর জন্ম হয়েছে। বর্তমানে উল্লেখ করতে পারি শেরপুর সদরের মকবুল বয়াতি, নালিতাবাড়ির তারা বয়তি প্রমুখের। মকবুল বয়াতির এখন অনেক বয়স এবং বর্তমানে অসুস্থও। মকবুল

www.pathagar.com

ভাই এই অঞ্চলের কিস্‌সাপালা বা মঞ্চপালা করে এত নাম করেছেন, যে তার জুড়ি নেই। ওই যে আমার বাবার কথা বলেছি একটু আগে–সেই যে কালুগাজী, হরমুজ বাদশা, গফুর বাদশা, বানেছাপরি কিস্‌সাগুলো গাইতেন, এই পালার প্রকৃত গায়ক হলেন মকবুল বয়াতি। বহু বছর ধরে তিনি এই পালা গাইছেন। প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার গানের কত বছর হল?

তারা বাউল : প্রায় ৩৭ বছর। এটি একটানা। কারণ এখন গানই আমার জীবন। গান গান গাইতে গাইতেই এ জগৎ পাড়ি দিতে চাই। প্রধান সমন্বয়কারী : বাউল গানের মর্মার্থ কী–আপনার কাছে কী মনে হয়?

তারা বাউল : বাউল শব্দের অর্থ আমার ব্যাখ্যায়–'যারা বাতাসের সন্ধানী'। অর্থাৎ যারা শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রকাশের সাধনা করেন, তাদেরকে আমরা বাউল বলতে পারি। যেমন লালন সাঁইজি। তাঁর নামটি উচ্চারণ করলেই আমরা বাউল-তত্ত্বের সবকিছুকে খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথকেও এই ধারা শ্রেষ্ঠ সাধক বলতে পারি। এই নদী-বিধৌত বাংলার পদ্মা তীরবর্তী অঞ্চল কবিকে বিশেষ করে বাউল সাধক লালন তার এই চেতনাকে শাণিত করেছে। প্রধান সমন্বয়কারীঃ আপনার নিজস্ব গান এ যাবৎ কতগুলো?

তারা বাউল : নিজের গান শতাধিক। তবে প্রচলিত, ফরমায়েশি এবং অন্যান্য অনেক ধরনের গান করে থাকি। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পছন্দের গান এবং শ্রোতাদের অনুরোধেও বহু গান গাইতে হয়। যেমন লালন সাঁইজির 'রূপ কাঠের নৌকাখানি নাই ডোর ভয়, পাড়ে কে যাবি নবীর নৌকাতে আয়'–গান আমার অনেক ভাললাগার গান, আমি এটি গাইও বিভিন্ন জায়গায়। এছাড়া তারা বাউল, জালাল খান, বিজয় মহান্ত, বিজয় দাস, রশিদ সরকার, কালুশা প্রমুখের গান করি। কালুশা'র 'নিরিখ বান্দরে দুই নয়নে' গানটিও আমার খুবই পছন্দের গান। প্রধান সমন্বয়কারী : নিজের এলাকা ছাড়া আর কোথায় কোথায় গান করেছেন?

তারা বাউল : বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই আমি গান করে বেড়াই। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ সব জেলাতেই। তবে মানিকগঞ্জ ও টাঙ্গাইলের শফিপুরে আমি নিয়মিত গান করি। প্রধান সমন্বয়কারী : বাউল গানের বর্তমান অবস্থা কেমন?

তারা বাউল : এখন ভাল। গত ২ বছর ধরে বাউল গান আবার ব্যাপকভাবে সারা জাগাচ্ছে। মাঝখানে খারাপ অবস্থা ছিল। ভাল বলতে যেমন আমার কথাই বলি–আমি এখন নিয়মিত আসর করছি। প্রধান সমন্বয়কারী : যখন গান করেন তখন আপনার কী কী পোশাক ব্যবহার করেন?

তারা বাউল : আমার গানের পোশাক হলো সাদা লুঙ্গি, সাদা পাঞ্জাবি ও ঘেরোয়া রঙের আউলান বা ওড়না। তবে বাউল গান ছাড়া অন্যান্য গান যেমন এনজিওদের গান করলে লাল রঙের ফতুয়া, লাল রঙের লুঙ্গি পরে থাকি। প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার গানে কী কী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করেন এবং সহ-শিল্পী কয়জন?

তারা বাউল : ৫টি বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। ঢোল, বাঁশি, হারমোনিয়াম, মন্দিরা বা জুরি এবং আমার হাতে থাকে একতালা–যেটি আরবীতে বলে 'দক'। সহ-শিল্পীও ৫ জন।

www.pathagar.com

ঢোলক, বাঁশি বাদক, হারমোনিয়াম বাদক, মন্দিরা বাদক ও দোহার। বাদ্যযন্ত্রগুলো আমরা বাজার থেকেই কিনি। প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার গানের শ্রোতা কেমন?

তারা বাউল : দেখুন দোকানদার কখনও বলবে না যে, তার দোকানের জিনিস খারাপ। আমি সেই অর্থে বলতে চাই না, সত্যিকার অর্থেই সারাদেশে আমার প্রচুর শ্রোতা ও দর্শক রয়েছে। এখন তো ধরুন সারা বছর ধরেই গান করি। তবে গানের ভরা মৌসুম আপনারা জানেন, শীতকাল। অর্থাৎ নভেম্বর থেকে মার্চ মাস। এই সময়গুলোতে গান ছাড়া কোনো ফুরসুৎ পাই না। মাসে প্রায় ১৫ থেকে ২০টি আসর করি। তবে বাকি সময় আসর কম থাকে, কিন্তু আমি কখন বসে থাকি না। আসর না থাকলে আমি নিবিষ্টচিত্তে পড়াশোনা করি। আমার গুরুদের স্মরণ করেই এই সাধনা করি। পবিত্র কুরআন-হাদিস, দার্শনিক আরজ আলী মাতব্বর এমন কি হুমায়ুন আজাদের বইও আমি পড়ি এবং লিখি। কারণ জ্ঞানের জগৎ বড়ো করলেই সাধনার জগৎ বড়ো হয়।

প্রধান সমন্বয়কারী: গান করতে কখনও কি দেশের বাইরে গিয়েছিলেন?

তারা বাউল : না, গান করতে কখনও বিদেশে যাওয়া হয়নি, তবে ব্যক্তিগত সফরে একবার ভারতের আজমীর শরীফে গিয়েছিলাম। কথায় আছে না–ঢেকি স্বর্গে গেলেও নাকি ধান ভানে? আমার ক্ষেত্রেও তাই-ই হয়েছিল। সেখানে কয়েকটি জায়গায় গান করেছি।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার ছেলে-মেয়ে কয়জন, তারও কি গানের জগতে এসেছে অথবা আসবে?

তারা বাউল : আমার ২ ছেলে, এক মেয়ে। তারা এখনো ছোটো। গানের জগতে আসবে কিনা জানি না, তবে বড়ো ছেলে যেটি দশম শ্রেণিতে পড়ে–সে চুপি চুপি আসরে গিয়ে আমার গান শোনে, করার আগ্রহ এখনো জাগেনি। কিন্তু ছোটো ছেলে যেটি পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে, সে এখনই গান শুরু করে দিয়েছে। দিয়েছে বলতে তার স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান করছে। ওর গানের গলাও মাসাল্লাহ ভাল আপনাদের দোয়ায়। ভবিষ্যতে কী হবে জানি না।

প্রধান সমন্বয়কারী : গান নিয়ে আপনার কি কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে?

তারা বাউল : অনেক দিনের স্বপ্ন জেলার বাউলদের নিয়ে একটা কিছু করা। বাউলদের একটা ঠিকানা, একটা ঘর যদি করতে পারি। ভবিষ্যতে যাতে এই ঠিকানা এই ঘরের মাধ্যমেই এই ধারাটা টিকে থাকে। অর্থাৎ ঘর থাকলে বংশ বাড়ে। পাশাপাশি এটাও জানবেন, এটি একটি কঠিন জগৎ। এখানে আসতে হলে তাকে ভাল মানুষ হতে হবে। দ্বিতীয়ত: তাকে সৎ, মানবতাবাদী, দরদী, ধৈর্য্য, সাধনা, একাগ্রতা ইত্যাদি থাকতে হবে। বাউল সাধনা অত সহজ কাজ নয়।

প্রধান সমন্বয়কারী : গান করে আপনি কী তৃপ্ত?

তারা বাউল : এক অর্থে তৃপ্ত। কারণ এযাবৎ বহু মানষের সামনে গান করেছি–শ্রোতা ও ভক্তদের ভালবাসা পেয়েছি। পেয়েছি দুই বার শ্রেষ্ঠ বাউল পুরস্কার। অন্য অর্থে সারা জীবনেও তৃপ্তি আসবে না কারণ এটি শুধু গান করা না, এটি জীবনভর সাধনার বিষয়। আমার ৫০ বছর বয়সেই যে সাধনা পূর্ণ হয়েছে এটি আমি কী করে বলি। প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার উত্তরসূরি কাকে ভাবছেন?

www.pathagar.com

তারা বাউল : এখনো উত্তরসূরি হিসেবে কেউ আসেনি বা পাইনি। একটু আগে যে কথাটি বলেছি যে, এটি একটি কঠিন পথ। এই প্রজন্মের মধ্য থেকে এমন কঠিন পথে আসার লোক খুব কম। তবে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, আমি একটি মেয়েকে পেয়েছি, যার গলা খোদা প্রদত্ত। বছর খানেক হলো মেয়েটিকে আমি দলে নিয়েছি। তারাকান্দার মেয়ে, নাম নূরী। দলে নূরী সাথে যুক্ত হয়েছে পাগলী। নূরী পাগলী সত্যিকার অর্থেই ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় এক বাউল শিল্পী। ওর কণ্ঠ ও গানের প্রতি আগ্রহ দেখে আমি গর্বিত এবং আশাবাদী।

প্রধান সমন্বয়কারী : আপনার জীবন ও সাধনার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

তারা বাউল : আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।[১]

আবেদ বয়াতি

'তাঁর সাথে একদিন, সারাদিন'

'শেরপুরের পান-সুপারি, নালিতাবড়ির এলাচী
নাও দৌড়াইয়া আমি মেডেল পাইয়াছি
আহা বেশ! বেশ! বেশ!'

একদিন এই রকম নৌকা বাইচের গান গেয়ে যার দিন কাটত মালিঝির বুকে, যিনি গ্রামে গ্রামে রাতের পর রাত গানে গানে কিসসা বলতেন, তিনি আর কেউ নন, আমাদের আবেদ বয়াতি। পুরো নামঃ মো. আবেদ আলী। বাবাঃ মৃত আইজ উদ্দিন। মাঃ নসিমন বেগম। তাঁর জন্ম নালিতাবাড়ি উপজেলার কলসপাড় ইউনিয়নের সূর্যনগর গ্রামে। চার ভাই-বোনের ভেতর সবার ছোটো আবেদ বয়াতি।

'এ যেন এক অনন্য পথ'

সাধারণ কৃষক ছিলেন আইজ উদ্দিন। চার সন্তানকে নিয়ে তাঁর সুখী, গৃহস্থ পরিবার। কথায় আছে 'সুখে থাকলে ভূতে কিলায়'—আইজ উদ্দিন ওরকম ভূতের কিলেই বোধহয় দ্বিতীয় বিয়ে করেন। সংসারে নেমে আসে কালো অন্ধকার। সৎ মায়ের দেয়া কষ্ট, অপমান, অনুভূতি-প্রবণ আবেদ বয়াতির তরুণ মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে। তিনি এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে থাকেন। সেই সময় শেরপুরের গাজীর খামার, গৃদ্দাপাড়ায় গুরু আবুল বয়াতির সাথে তাঁর পরিচয় হয়, আর তিনি যেন পেয়ে যান এক অনন্য পথের সন্ধান!

'আমারও আছে দুঃখ'

গুরু আর বয়াতির সান্নিধ্যে এসে আবেদ বয়াতি গ্রামে গ্রামে ঘুরে কিস্‌সা, পালা গান করতে থাকেন। নিজের দঃখ-কষ্টগুলোকে তিনি কিস্‌সা, পালা গানের মাধ্যমে মানুসের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এবং তিনি চেয়েছেন তার মত যেন আর কেউ এরকম কষ্ট না পান। 'সৎ মায়ের পালা'র মাধ্যমে তিনি যেন তার দুঃখগুলোই সবার সাথে ভাগ করে নিতে চেয়েছেন, বলতে চেয়েছেন—দেখো, আমারও আছে দুঃখ!

'হাত ধরে চলেছি বন্ধু পথ'

এক সময় আবেদ বয়াতিও দল গঠন করেন। দলের সদস্য সংখ্যা ৫-৬ জন। গঠন করতে তাঁর খুব বেশি খরচ হয়নি। শুধু বাদ্যযন্ত্র কিনতে কিছু টাকা লেগেছে–ওটুকু

www.pathagar.com

গান গেয়ে যা উপার্জন করেন, সেই টাকা দিয়েই হয়ে যায়। দল গঠনের পর আবুল বয়াতি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান; রাত জেগে কিস্‌সা, পালা গান করেন। সেই সময় সারথীদের নিয়ে তিনি 'শামসাদ জঙ্গী পাঞ্চ রাহা', 'গহর বাদশা বানেছা পরী', 'আলী দিল বাহার', 'সৎ মায়ের পালা' প্রভৃতি কিস্‌সা ও পালা গান করেন।

'পাশে আছি বন্ধু'

আবেদ বয়াতির সাথে বন্ধুর মত পাশে থেকেছেন তার সারথিরা। সারথিরা হলেন—১. দোহার–আবুল হোসেন ২. ঝুরি–আবদুল্লাহ ৩. সরুজ–আকবর আলী ৪. তবলা –প্রয়াত বাছির আলী

'আরো যারা কিস্‌সা বলতেন তখন'

সেই সময় ওই গ্রামে, ও পাশের গ্রামগুলোতে আরো যারা কিস্‌সা বলতেন, তাঁরা হলেন–১. আবুল হাশেম, বড়বিলা, সূর্যনগর ২. এনামুল আলী, সূর্যনগর ৩. হামেদ আলী, নকশি ৪. জামাল হোসেন, সূর্যনগর ৫. ছামেদুল আলী, সূর্যনগর ৬. আবদুল্লাহ, রড়বিলা, সূর্যনগর।

'নানা রঙের স্বপ্ন'

আবেদ বয়াতি কিস্‌সা দিয়ে যাত্র শুরু করেন তাঁর গানের ভুবনে। এর পর পালাগান, সারিগান, বাউলগান করেন। একই বোধ হয় বরে নানা রঙের স্বপ্ন!

'নদী যে ডাক দিয়ে যায়'

বর্ষায় মালিঝির বুক উত্তাল! নদীর যৌবন দেখে তরুণ আবুল বয়াতির বুকেও তরঙ্গ দুলে উঠে, নেমে পড়েন বর্ষার নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায়। তাঁর দরাজ কণ্ঠে ওঠে আসে নদীর গান, সারি গান—

ও বউ ভাত রানধো সকালে
নাও দৌড়াব বিকারে
আহা বেশ! বেশ! বেশ!
নদীর ডাক কি কেউ উপেক্ষা করতে পারে!

'নাও বাওয়া মর্দ লোকের কাম'

নাও না থাকলে আবার কিসের মণ্ডল'–আগে যেন ব্যাপারটি এমনই ছিল। নৌকা ছিল মণ্ডলদের আভিজাত্যের প্রতীক। পাগলাজানি গ্রামের জয়নুদ্দিন মন্ডলের নাও নিয়ে আবেদ আলী চলে গেছেন বড়বিলা, বোয়ালমারি, শৈলকুড়ি, গেল্লারবিল, কালিদস সাগরে (পশ্চিমে)। আর তাঁর নাওয়ের যেন পাখনা ছিল, পঙ্খীরাজ্যের মত উড়াল দিয়ে চলত তাঁর নাও। আর গলা ছেড়ে গাইতেন :

কাইল্যা ছেড়ি বাড়া বানে
হিইচ্চা উডে লুডের ধান
ঐ ছেড়ি তুই আস্তে বাড়া বান
আহা বেশ! বেশ! বেশ!

'কোথায় সেই সোনারি দিনগুলি'

'প্রত্যেক বচ্ছর নৌবাইচ অইতো। আমরা নাও দৌড়াইতে যাইতাম। এহন নদীর এই যইবন নাই। আর মানুষের তহন এতো অভাব আছিল না। গোলা ভরা ধান আর

www.pathagar.com

গোয়াল ভরা গরু আছিল। মানুষের মনে সুখ-শান্তি আছিল। মানুষ তহন বয়াতিদের, গায়কদের সম্মান করত। তারা খুশি হয়ে ধান, গরু, বাছুর দিয়েও বয়াতিদের সম্মান জানাইতো। রাইতো কিস্‌সা, পালা গানের মজমা বইতো। এহন মানুষর মনে আনন্দ নাই।' সেই সোনালি দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে এভাবেই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন আবেদ বয়াতি।

'সোনার বরণ পাখি, বন্দী আমার দেল কোঠায়'

আবেদ বয়াতির কাছে গান নিয়ে তাঁর স্বপ্নের কথা জানতে চাইলে তিনি আপন মনে গান ধরেন :

'সোনার বরণ পাখি, বন্দী আমার দেল কোঠায়
হিসাব-কিতাব নাইরে পাখি, কোনদিন জানি ছাইড়া যায়'

গানটি যেন তাকে এক অন্য জগতে নিয়ে যায়, ঘোর কেটে গেলে বলেন : 'আগে আমগর জীবনে সুখ আছিল। আছিল গোয়াল ভরা গরু, গোলা ভরা ধান, নদী ভরা মাছ; আর আমগর মনেও গান আছিল। আমগর জীবনের হাসি-কান্নার কতাগুলোই আমরা গানের মাইধধমে মানুষের কাছে পোওছাইয়া দিতাম। মানুষে হাসতো, কানতো, আর আমরাও তৃপ্তি পাইতাম। এহন মানুষের ওই সুখ নাই। নদীর মইরা যাইতেছে। আইছে সিডি, ভিসিডি, নানান চ্যানেল। এহন আমগর এইগানগুলা প্রায় হারাইয়াই যাইতাছে আমি নিজে এহন দিন মজুর। স্বপ্নের কথা আর কী কইমু বেডি। খালি এই কতডাই কই, এহনকার পুলাপানেরা এই গানগুলা ধইরা রাখালে খুব আনন্দ পাইতাম'।[২]

'স্বপ্ন, তুমি বড় হও'

একদিন নিজের জীবনের সুখ-দুঃখ বোধ-ই আবেদ বয়াতিদের নিয়ে আসে এই জগতে, এই বিচিত্র গানের ভুবনে। তাঁরা যেন জীবনের এই সুখ-দুঃখের আখ্যান-ই বলতেন কখনো কিস্‌সার মাধ্যমে, কখনো পালা গানের মাধ্যমে আবার কখনো বা সারি বা বাউল গানের মাধ্যমে। আর মানুষ নিজের জীবনের অনুভূতিগুলোর সাথে এইসব জীবন আখ্যান মেলাতে যেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তেন। আজ আকাশ সংস্কৃতির যুগে, নগরায়নের ফলে এই কিস্‌সা-পালা-সারি-বাউল গান প্রায় হারাতে বসেছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের কৃষকেরা, গৃহস্থেরা, গায়কেরা আজ সময়ের বিবর্তনে দিনমজুর, শ্রমিক। তারপরও স্বপ্ন দেখি, একদিন টিক আমরা আমাদের শেকড়ে ফিরে যারো। আর স্বপ্নকে বলি : স্বপ্ন, তুমি বড় হও।

বাউল তারা মিয়া

শেখ আবুল কালাম মো. তারা মিয়া, সবার সুপরিচিত তারা বাউল। যাঁর জন্ম শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলায়। ছোটোবেলা থেকেই বাউল গানের মরমী কথা ও সুর যাকে টানতো। নিজেই গান লিখেন, সুর করেন। গানের দলও গঠন করেছেন। নিজের সারথিদের নিয়ে গান করে ঘুরে বেড়ান প্রান্তর থেকে প্রান্তরে, দেশ থেকে বিদেশে। এক বিকেলে এই স্বনামখ্যাত বাউল সাধকের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকারটি তুলে ধরা হলো :

www.pathagar.com

সংগ্রাহক : আপনার জন্ম কবে? জন্মস্থান কোথায়?

তারা মিয়া : আমার জন্ম ৩রা মে ১৯৫৮ সালে। আর জন্মস্থান শেরপুর জেলাধীন নালিতাবাড়ি উপজেলার ৪নং নয়াবিল ইউনিয়নে আন্ধারুপাড়া গ্রামে।

সংগ্রাহক : আপনার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা?

তারা মিয়া : আমার বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম : আন্ধারুপাড়া, ৪নং নয়াবিল ইউনিয়ন, ডাকঘর : শিমুলতলা, উপজেলা : নালিতাবাড়ি, জেলা : শেরপুর। এবং এটিই আমার স্থায়ী ঠিকানা। সংগ্রাহক : আপনার বংশ পরিচয় সম্পর্কে জানতে পারি?

তারা মিয়া : আমার জন্মস্থান এখানেই। কিন্তু আমার বাবা আগে ময়মনসিংহ ঈশ্বরগঞ্জ থানায় ছিলেন। আপনারা জানেন, নালিতাবাড়ির আদিবাসীরা ছাড়া আর সবাই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এসে এখানে বসতি গড়েছেন। তারা কেউ নালিতাবাড়ির স্থায়ী বাসিন্দা নন। শেখ বংশে আমার জন্ম। আমার দাদা প্রয়াত ধানু শেখ। শেখ বংশ হিসেবেই আমরা পরিচিত। এ পর্যন্ত শেখ বংশকেই আমরা ব্যবহার করে আসছি। আমার দাদী প্রয়াত লালজান বিবি। আমার বাবা প্রয়াত শেখ আবেদ আলী। মা প্রয়াত খতিজান বিবি। আমার দাদা বাবা–তাঁর কৃষক ছিলেন, কৃষিকাজ করতেন। আর দাদী মা–তাঁরা ঘর কন্যার কাজ, মানে গার্হস্থ্য জীবন নিয়েই থাকতেন।

সংগ্রাহক : কবে থেকে গান গাইতে শুরু করলেন?

তারা মিয়া : আমার সংগীতের প্রতি আকর্ষণ সেই ছোটোবেলা থেকেই। যখন স্কুলে পড়ি, তখন থেকেই গানের সুর আমাকে টানতো; তখন থেকেই বাদ্যযন্ত্রের ওপর আমার আগ্রহ ছিল। আমি ছোটোবেলা থেকেই বাঁশি বাজাতাম, বাঁশির সুরও আমাকে খুব টানতো। এক পর্যায়ে হারমোনিয়ামে, সরুজ–এগুলো বাজানো আমি শিখেছি ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়া অবস্থায়। যখন আমি আন্ধারুপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় ভর্তি হলাম, তখন থেকে বাউল গানের প্রতি আমার আগ্রহ, বাউল-রাগ জমে ওঠে। বাউল গান আমার দারুণ পছন্দ হয়। বাউল গানের কথা ও সুর আমাকে দারুণ নাড়া দেয়। ক্রমান্বয়ে আমি বাউল সংগীতের প্রতি আরো দুর্বল হয়ে পড়ি। এরপর ১৯৭৪ সালে, ওই বছর আমি এসএসসি পাশ করি, এবং ওই বছরই আমি আমার গুরু বাউল সম্রাট ইদ্রিস মিয়ার সংস্পর্শে আসার সুযোগ পাই ও তাঁর শিষ্য হয়ে সংগীত চর্চা শুরু করি এবং ১৯৭৪ সালেই আমি গুরুর দীক্ষা নিই ও নিজে গান লেখা শুরু করি। মূলত ১৯৭৪ সাল থেকেই আমি আনুষ্ঠানিকভাবে বাউল গান গাইতে শুরু করি।

তারা মিয়া : একটি মজার প্রশ্ন। গান আমি যতটুকু জানি, গান মানুষকে বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা যোগায়। গান আত্মার খোরাক। ছাত্রজীবন থেকেই আমি গানের ওপর আকৃষ্ট হই, বলতে পারেন আমি গানের প্রেমে পড়ে যাই। ছাত্রাবাস্থায়, লেখাপড়া চলা অবস্থায়ও আমি সংগীত নিয়েই ছিলাম। এরপর জীবনে কতো দুর্যোগ গেছে। যাচ্ছে তারপরও সংগীতকে আঁকড়ে ধরেই বেঁচে আছি। জীবনে আমি সাধনা হিসেবে সংগীতকে গ্রহণ করেছি। এখানে বর্তমানে আমি একজন পেশাদার বাউল শিল্পী। আসলে একজন বাউল মাত্রই জানেন এ সংগীত সাধনা হয়তো অভিশাপ অথবা অনন্য আশীর্বাদ; একজন বাউল মাত্রই জানেন এই গান না লিখে বা গেয়েও যেমন শান্তি নেই, আবার লিখে বা গেয়েও শান্তি নেই।

www.pathagar.com

সংগ্রাহক : আপনার গান করার অনুপ্রেরণা কার কাছ থেকে পেলেন?

তারা মিয়া : আমি সংগীতে যখন প্রবেশ করলাম, তখন আমার এলাকায় একজন সংগীতজ্ঞ লোক ছিলেন, উনি আজ এই জগতে নেই, প্রয়াত ডাক্তার মেহের আলী। উনি আমাকে প্রথমে দিক নির্দেশনা দেন এবং উনিই আমাকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে ভালোভাবে গানকে আয়ত্ত করতে হলে, তোমার একজন গুরু দরকার। এরপর ডাক্তার মেহের আলী আমাকে তখনকার বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলাধীন প্রয়াত বাউল শিল্পী ইদ্রিস মিয়ার কাছে নিয়ে যান। আমি দীর্ঘদিন বাউল সম্রাট ইদ্রিস মিয়ার কাছে বাউল সংগীত চর্চা করেছিলাম এবং আমার মনে পড়ে আমি পঁচিশ বছর ওস্তাদজির সাহচর্যে ছিলাম। ওস্তাদজির অনুপ্রেরণায়ই আমার সংগীতের এই আসন আজ। আমার জীবনে গুরুর অনুপ্রেরণা অবদান অনেক। তাই আমার আজকের এই সুনাম – ঐ শও গুরু ইদ্রিস মিয়ারই প্রাপ্য।

সংগ্রাহক : আপনার পূর্ব পুরুষের ভেতর কে গান করতেন?

তারা মিয়া : আমার পূর্ব পুরুষদের ভেতর আমার বাবা মাঝে মাঝে বাউল, ভাটিয়ালি, জারিগান এলাকাভিত্তিক করতেন। তবে উনি পেশাদার শিল্পী ছিলেন না। আনন্দ-উৎসবের সয়ম মাঝে মাঝে তিনি এই গানগুলো করতেন আর আমি তা শুনতাম এবং খুব আনন্দ পেতাম। এছাড়া পূর্বপুরুষদের মধ্যে আর কেউ গান করতেন বলে আমার মনে পড়ে না।

সংগ্রাহক : আপনি কোন ধরনের গান করেন?

তারা মিয়া : আমি একজন বাউল শিল্পী। মূলত বাউল গান করি। এই যেমন সৃষ্টিতত্ত্ব, ভাবতত্ত্ব, পরমতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, বিচারতত্ত্ব-এই গানগুলো আমি করে থাকি। এছাড়া শরিয়ত, মারফত, হকিকত, তরিকত; বড়ো পীড় আবদুল কাদির জ্বিলানী (র.), খাজা মাঈনুদ্দিন চিশতী (র.)-এর জীবনী, কাওয়ালী, জারি, ভাটিয়ালী, দেশের গান, বিচ্ছেদের গান–এই সমস্ত গান করি।

সংগ্রাহক: বাউল গান কেন করেন বা বাউল গান কেন বেছে নিলেন?

তারা মিয়া : শৈশব থেকে বাউল গান আমার দারুণ পছন্দ। বাউল গানের কথা ও মরমী সুর ছোটোবেলা থেকেই আমাকে খুব টানতো। বাউল গানে কোন কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামি নেই। তাই বাউল গান বেছে নিয়েছে। এছাড়া বাউল গান করার পেছনে আরো একটি কারণ আছে। আমি নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারের সন্তান। এক সময় সংসার চালানোর দায়িত্ব আমার উপর আসে। লেখাপড়া শেষ করার পরে চাকরি পাবার জন্যে অনেক জায়গায় হাত পেতেছি। অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি, কিন্তু সেটা আমার ভাগ্যে জুটেনি। আমার যেহেতু গানের গলা আছে, মানুষও বাউল গান ভালোবাসে, তাই আমি বাউল গান করার মাধ্যমে আমার জীবিকা নির্বাহ করেছি। এবং মনে মনে ভেবেছি, বিশ্ব স্রষ্টা যদি আমার সহায় হন, তবে এই গান–ই একদিন আমাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাবে; গান গেয়েই আমি আমার গন্তব্যস্থলে পৌছাতে পারবো।

সংগ্রাহক: বাউল গান কার কাছ থেকে শিখেছেন। আপনার ওস্তাদ কে?

তারা মিয়া : আমি বাউল গান শিখেছি বর্তমানে নেত্রকোনা জেলাধীন পূর্বধলা উপজেলার প্রয়াত বাউল সম্রাট ইদ্রিস মিয়ার কাছ থেকে, তাঁর কাছ থেকেই আমার এই

www.pathagar.com

সংগীত অর্জন। উনি দীর্ঘদিন যাবৎ উনার সাহচর্যে রেখে আমাকে দীক্ষা দান করেছেন। উনার এই দানের উপর নির্ভর করেই আমি আমার সংগীতকে ধরে রেখেছি। বাউল সম্রাট ইদ্রিস মিয়াই আমার ওস্তাদ। সংগ্রাহক : বাউল গানের বৈশিষ্ট্য কী?

তারা মিয়া : বাউল গানের বৈশিষ্ট্য বিবিধ। বাউল গানের মাধ্যমে মানুষের মনকে আকৃষ্ট করা যায়, এই গানে কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কার নেই, বাউল গানের কথা ও সুর অসাধারণ, এই গানের মাধ্যমে মানুষের মনকে স্রষ্টার দিকে ধাবিত করা যায়, মানুষের মনে ভাবের উদ্রেক করা যায়, স্রষ্টার প্রতি, মানুষের প্রতি প্রেমকে আরো প্রগাঢ় করা যায়; বিরহ ব্যথাকে নতুন মাত্রা দেয়া যায়; সবচে' বড়ো কথা এ এক আলাদা জগত, এই জগতে ডুব দিয়ে জাগতিক দুঃখ-যন্ত্রণা, লোভ, হিংসা থেকে দূরে থাকা যায়; নির্মল আনন্দ পাওয়া যায়। আর এগুলোই বাউল গানের বৈশিষ্ট্য বলে আমি মনে করি।

সংগ্রাহক : বাংলাদেশের কোন কোন বাউলের গান আপনার ভালো লাগে?

তারা মিয়া : বাংলাদেশের শিল্পী যারা যাঁরা গান ও লিখেছেন তাদের মধ্যে বাউল সাধক লালন ফকির, ওস্তাদজি ইদ্রিস মিয়া, জালাল উদ্দিন খাঁ, উকিল মুন্সি, আবদুস সাত্তার, বাউল স্রষ্টা রশিদ উদ্দিন–উনাদের গানগুলো আমার বিশেষ ভালো লাগে।

সংগ্রাহক : আর বাংলাদেশের বাইরে, ভারতে?

তারা মিয়া : বাংলাদেশের বাইরে, ভারতে দ্বিজ দাস, দীন শরৎ, মনমোহন, কানাই শীল, উনাদের গান আমার খুব ভালো লাগে।

সংগ্রাহক : বাউল গান ছাড়াও অন্য আর কোন গান করেন আপনি?

তারা মিয়া : বাউল গান ছাড়াও আমি জারিগান, ভাটিয়ালি গান, মুর্শিদী–মারফতি গান করি। সংগ্রাহক : কত বছর যাবৎ গান করেন?

তারা মিয়া : ১৯৭৪ সাল থেকে আমি বাউল গান করছি। এখন পর্যন্ত গানের সাথেই আছি। আল্লাহ চাহে, যদি বেঁচে থাকি, মন থেকে এইটাই আমার একমাত্র চাওয়া, মহান আল্লাহর কাছে এই একটিই প্রার্থনা করি, যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন এই গানের ভেতরেই নিবিষ্ট থাকতে চাই।

সংগ্রাহক : আপনার দর্শক শ্রোতা কারা?

তারা মিয়া : আমার দর্শক-শ্রোতা বলতে, যারা বিবেকবান, যারা মানুষকে বুঝেন-ভালবাসেন, যারা সচেতন–তারাই আমার দর্শক-শ্রোতা। যারা গানকে ভালবাসেন, গান সম্পর্কে দরদী মনোভাব পোষণ করেন–তারাই আমার মূল দর্শক-শ্রোতা বলে আমি মনে করি।

সংগ্রাহক : কোথায় কোথায় গান করছেন?

তারা মিয়া : আমি বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ভেতরে, যতটুকু মনে পড়ে ৪-৫টা জেলা বাদে বাকি সবগুলো জেলাতে গান করেছি। আর বাংলাদেশের বাইরে, ভারতে, ভারতের তেরো জেলায়, মেঘালয়, ত্রিপুরা, শিলিগুড়ি, কুচবিহার, জলপাইগুড়িতে গান করেছি। পরম আল্লাহর অশেষ রহমতে ভারতের বাংলা ভাষাভাষী এলাকাগুলোতে আমি আমার সংগীতের মাধ্যমে অনেক যশ-সুনাম অর্জন করেছি।

সংগ্রাহক : বছরের কোন সময়টিতে গান করেন বেশি?

www.pathagar.com

তারা মিয়া : বছরের শুকনো মৌসুমে এবং শীতকালে, আশ্বিন-কার্তিক, পৌষ-মাঘ, ফাল্গুন-চৈত্র এই মাসগুলোতে গান গাওয়া হয় বেশি। তবে বর্ষাকালে গান খুব একটা বেশি হয় না, প্রাকৃতিক কারণে বৃষ্টি-বাদলা হেতু তখন কম হয়। মূলত শুকনো মৌসুমেই এই বাউল গানগুলো বেশি হয়ে থাকে আমাদের দেশে। সংগ্রাহক : আপনার গানের দল আছে?

তারা মিয়া: হ্যাঁ, আছে। আমার একটা গানের দল আছে। প্রয়াত বাউল সম্রাট ইদ্রিস মিয়া, নেত্রকোনা জেলা ধীন পূর্বধলা উপজেলায় উনার বাড়ি। বাউল সাধক ইদ্রিস মিয়া আমার শিক্ষাগুরু-দীক্ষাগুরু। উনার কাছে আমি দীক্ষা গ্রহণ করি ১৯৭৪ সালে। সংগীত চর্চার ভেতর দিয়েই তিনি আমাকে দীক্ষা মন্ত্র দান করেন, শুধু বাউল শিষ্য হিসেবেই না, আমি উনার একজন পরম ভক্ত এবং মুরিদান বলবো আমি। এরপর ১৯৭৬ সাল, ওই বছর আমি এইচ,এস,সি পাশ করি। এবং ওই বছরই সংগীতের ওপর গবেষণা শুরু করি। এই বাউল গান, মরমী সুর আমাকে আরো টানতে থাকে। আমি বাউল সংগীতের উপর আরো বেশি মনোনিবেশ করি। শুরু হয় আমার সংগীত সাধনা। এবং এরপর ১৯৭৮ সাল, আমি ওই বছর বি.এ পাশ করি এবং ওই বছরই নিজেই গানের দল গঠন করি, নাম দেই 'পল্লী বাউল কল্যাণ সমিতি'। সংগ্রাহক : আপনার গানের দলে সদস্য সংখ্যা কত?

তারা মিয়া : আমার গানের দলের সদস্য সংখ্যা আমাকে নিয়ে নয় জন। এই সারথিদের নিয়েই ১৯৭৮ সালে শুরু হয় আমার স্বপ্নযাত্রা। জানেন তো, প্রত্যেক স্বপ্নযাত্রার নেপথ্যে থাকে নিরন্তর সংগ্রামের গল্প, আমার গানের দলেরও তাই। আমি আমার গানের দল নিয়ে অনেক সংগ্রাম করে আজ এই পর্যন্ত এসেছি, জানি আরো অনেক পথ হাঁটতে বাকি এখনো। সংগ্রাহক : আপনার গানের দশ সদস্যরা কে কোন দায়িত্বে আছে বা কার ভূমিকা কী?

তারা মিয়া : আমার সাথে ছায়ার মতো আছেন আমার সাথীরা। তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ভূমিকা রয়েছে, আমি প্রত্যেকের নামসহ বলছি কে কোন দায়িত্বে আছে : সুরুজ-এ আছেন, ডা. আব্দুল মুতালিব, বেহালা বাদক–মো. খলিলুর রহমান, ঢোল-এ আছেন মো. হারুনুর রশিদ, হারমোনিয়াম-এ আছেন মো. সোহাগ মিয়া, বাঁশিতে আছেন মো. চাঁন মিয়া, করতাল-এ আছেন মো. বাচ্চু মিয়া, একতারায় আছেন মো. জমির উদ্দিন ফকির, ঝম-এ আছেন মো. আলী মদ্দিন ফকির। সংগ্রাহক : আপনার গানের সাথে কী কী বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়?

তারা মিয়া : আমার এই গানের সঙ্গে সাধারণত থাকে বেহালা, একতারা, সরুজ, বাঁশি, করতাল। আর যদি বড়ো মঞ্চে অনুষ্ঠান হয় তবে সাথে ঝম, চটি, হারমোনিয়াম, ঢোল, তবলচি, পেড্রাম-এ সমস্ত বাদ্যযন্ত্রও থাকে। সংগ্রাহক : বাদ্যযন্ত্রগুলো কোথা থেকে সংগ্রহ করেন বা কে তৈরি করেন?

তারা মিয়া : বাদয্যন্ত্রগুলো বিভিন্ন কোম্পানি থেকে সংগ্রহ করে থাকি আমরা। এগুলো আমরা নিজেরা তৈরি করতে পারি না। বাংলাদেশের মধ্যে ঢাকার শাঁখারী বাজার থেকে সুরশ্রী ও যতীন কোম্পানির বাদ্যযন্ত্র আমরা ক্রয় করি। ময়মনসিংহের বড় বাজার থেকেও আমরা বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করি। এছাড়া ভারতের জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি শহর থেকেও আমরা বাদ্যযন্ত্র ক্রয় করে থাকি।

www.pathagar.com

সংগ্রাহক : গান গাওয়ার সময় পরিবেশ অনুযায়ী আপনি বিশেষ কোন পোশাক ব্যবহার করেন কিনা?

তারা মিয়া : হ্যাঁ, অবশ্যই। গান গাওয়ার সময় তো একটা নির্দিষ্ট পোশাক থাকা জরুরি-ই। দেখুন, থানার পুলিশের যদি পুলিশের পোশাক না থাকে, তবে তাকে পুলিশ বলে মনে হবে না। পোশাক কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বাউল শিল্পীদের যদি গেরোয়া পোশাক না থাকে বাউলি ভাব যদি তার মধ্যে বিরাজ না করে, তাহলে তো তাকে বাউল মনে হবে না। কাজেই বুঝতেই পারছেন, পোশাকটা কতো গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যে পোশাকটা সবসময় আমার সাথে থাকে। এবং আমার সাথী যারা আছেন, তাদের সাথেও থাকে। আমার মতো তারাও সাধারণ পোশাক পড়বে না, যেহেতু তারা বাউল এর সহচর, সারথি। বাউলকে অনুসরণ, অনুকরণ করাই তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য। তাই ওরাও আমার মতোই বাউলদের পোশাক পরিধান করে থাকে।

সংগ্রাহক : পোশাকগুলো নিজেই তৈরি করেন?

তারা মিয়া : না, আমরা নিজেরা তৈরি করতে পারি না। যেহেতু আমরা সেলাই মেশিন চালাতে পারি না। আমরা শেরপুর থেকে কাপড় কিনে এনে শেরপুর বা নালিতাবাড়ির টেইলার্স এ পোশাক তৈরি করি। আর বাউলদের পোশাক তো খুব একটা চমকপ্রদ পোশাক নয়, সাধারণ পোশাক বাউলদের পোশাক খুব সাদাসিধে। আর বেশি মূল্যবান পোশাক ও আমরা পরিধান করি না। আমাদের পোশাকের এতো চাকচিক্য নেই। আমরা বিলাস বহুল বসন পছন্দ করি না। আমরা সাধারণ পোশাক পরেই স্বাচ্ছন্দবোধ করি। এবং সাধারণ পোশাক পরেই আমরা চলাফেরা করে থাকি।

সংগ্রাহক : পোশাকের রঙ কী?

তারা মিয়া : আমাদের পোশাকের রঙ গেরোয়া। এছাড়া সাথে আছে সবুজ, সাদা আর জর্দা রঙ। সংগ্রাহক : এ যাবৎ কতগুলো গান করেছেন?

তারা মিয়া : শুধু বাউলগান নয়, মঞ্চে জারি, মুর্শিদী, ভাটিয়ালী-সব মিলিয়ে প্রচুর গান করেছি। সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করতে পারবো না। সংগ্রাহক : এই গানগুলো সুর ও লেখা আপনার না প্রচলতি গান করেন?

তারা মিয়া : এই গানগুলোর ভেতর কিছু গানের সুর প্রচলিত, তবে কথাগুলো সব আমার। আমি সেই ১৯৭৪ সাল থেকে অদ্যাবধি অনেকগুলো গান লিখেছি। দেহতত্ত্ব, ভাবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব–এই গানগুলো আমার লেখা ও সুরও আমার করা। আমি প্রচলিত গানও করি। বাউল সাধক লালন ফকির, আমার ওস্তাদজি প্রয়াত ইদ্রিস মিয়া, বাউল সম্রাট রশিদ উদ্দিন, উকিল মুন্সি, জালাল উদ্দিন খাঁ, ভারতের দ্বিজ দাস, দীন শরৎ মনমোহন-উনাদের গান আমি করে থাকি। গুনী শিল্পী যারা, বাউলদের ভেতর যারা শ্রেষ্ঠজন–তাদের গান আমি করে থাকি। সংগ্রাহক : আপনি বাউল গান ছাড়াও অন্য গান লিখেন কি?

তারা মিয়া : আমি মূলত বাউল গান লিখি। তবে হ্যাঁ, আমি অন্য গানও লিখে থাকি। বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা আমার প্রচুর জারি গান আছে। কিছু ভাটিয়ালি গানও লিখেছি। কিছু দেশের গান আছে। বিশেষ করে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপর আমার বেশ ক'টি গান আছে। চলমান সরকার জননেত্রী

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার উপরও আমার লেখা গান আছে। আর আমার বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক জারি গানগুলো, এই যেমন–জন্ম নিয়ন্ত্রণ, দুর্নীতি প্রতিরোধ, নারী নির্যাতন, আর্সেনিক দূষণ, এইচআইভি ভাইরাস, মাদক নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা বিষয়ক, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বৃক্ষরোপণ, ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১'র মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি।

সংগ্রাহক : আপনার লেখা গানের সংখ্যা কত?

তারা মিয়া : আমার লেখা গানের সংখ্যা এক হাজারের উপরে হবে। এখনো গান লিখছি, সুর করছি। প্রায় প্রতিদিন গান লিখছি, সুর করছি।

সংগ্রাহক : কোথায় গান করে আনন্দ পান?

তারা মিয়া : মঞ্চে অনেক দর্শক-শ্রোতার সামনে গান করে বেশি আনন্দ পাই। বৃহত্তর ময়মনসিংহের ভেতর নেত্রকোনা জেলায় গান করলে খুব ভালো লাগে, তৃপ্তি পাই। বড়ো বড়ো শহর, শিক্ষিত এলাকায় গান করলেও ভালো লাগে। এছাড়া বড়ো বড়ো ওলি আল্লাহদের জলসা, এই যেমন নেত্রকোনায় শাহ কমর উদ্দিন রুমি (র.) উনার মাজার, ওখানে বছরে একটা অনুষ্ঠান হয় ওই অনুষ্ঠানে গান করলে আত্মা তৃপ্ত হয়। শেরপুরে হযরত কামাল (র.)-এর মাজারে বার্ষিক একটা অনুষ্ঠান হয়, ওখানে গান গেয়েও অনেক আনন্দ পাই।

সংগ্রাহক : রেডিও বা টেলিভিশনে গান করেছেন কখনো?

তারা মিয়া : না, করিনি। রেডিও বা টিভিতে গান করার সুযোগ পাইনি। এটা ঠিক মঞ্চে গান করে বেশি মজা পাই, এতে আলাদা একটা মজা আছে। আমি আমার গানগুলো এই পর্যন্ত জেলা সদরে, আমার এলাকায়, আজ পাড়াগাঁয় পরিবেশন করেছি। এখন আমি যদি এই গানগুলো জাতীয় পর্যায়ে, মিডিয়ায় স্ব-শরীরে প্রচার করতে পারতাম–এটা যে আমার জন্যে কতো আনন্দের হতো, বলে বোঝাতে পারবো না। আমি এতে আরও অনেক মানুষের কাছে পৌঁছতে পারতাম, আরো তৃপ্তি পেতাম।

সংগ্রাহক : মঞ্চে গান করার অনুভূতি সম্পর্কে আরো বিস্তৃত বলবেন কী?

তারা মিয়া : মঞ্চে গান করতে খুব ভালো লাগে। মঞ্চে অনেক রকম দর্শক শ্রোতা থাকে, এবং সাড়াটা সাথে সাথেই পাওয়া যায়। অনেক নারী পুরুষের সমাগম হয় সেখানে আর সেই সমাবেশে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সব ধর্মের মানুষ থাকে, যেহেতু ওটা জাতি, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রোগ্রাম, সব ধর্মের লোক-ই ওখানে উপস্থিত থাকে, তখন আত্মাটা ভরে ওঠে। ওই মঞ্চে যখন বিভিন্ন ধর্মের গান পরিবেশন করি, এই যেমন, হিন্দু ঘরানার গানগুলো যখন পরিবেশন করি তখন হিন্দু নারীরা উলু ধ্বনি দিয়ে আমার বরণ করে নেয় যা আমাকে অনেক উৎসাহ, অনুপ্রেরণা দেয়। এমন কী তারা আপ্যায়ণ করে, টাকা-পয়সা দিয়েও আমাকে সম্মানিত করে–তখন মনটা সত্যিই আনন্দে ভরে ওঠে।

সংগ্রাহক : গান-ই কি আপনার পেশা?

তারা মিয়া : হ্যাঁ, যেহেতু আমি গানের সঙ্গে শৈশব থেকে জড়িত, গানকে আমি মনে-প্রাণে ভালবেসে ফেলেছি, এই গানই এখন আমার পেশা, জীবিকা নির্বাহের পাথেয়, অবলম্বন। আমি বর্তমানে গানকেই পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছি। এই গান গেয়েই আমি এখন সংসারের খুঁটিনাটি খরচ যতটা সম্ভব চালাই। বলতে গেলে, সংসারে চালানোর অর্থ আমার গানের মধ্য দিয়েই আসে।

www.pathagar.com

সংগ্রাহক : আপনার ছেলে মেয়ের কেউ কি বাউল সংগীতের সাথে যুক্ত হয়েছে বা যুক্ত হবে?

তারা মিয়া : আমার ৫ ছেলে, ২ মেয়ে। বাউল গানের জগতের কঠিন বাস্তবতার কথা ভেবেই, সবদিক বিবেচনা করেই আমি আমার এই গানের জগতে তাদের কাউকে আনিনি বা আসার সুযোগ করে দিইনি।

সংগ্রাহক : বাউল গানের বর্তমান অবস্থা কী?

তারা মিয়া : বাউল গানের বর্তমান অবস্থা খুব করুণ, শুধু করুণ বললে ভুল হবে, করুণ থেকে করুণতর। এই গানের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব, কর্ণধারের অভাব, এ ধারক, বাহক নেই বললেই চলে। বাউল গানের সুরেরও বিলুপ্তি ঘটছে, পূর্বে বাউল গানের যে মরমী সুর ছিল, এখন তা অনুপস্থিত। আগে যে সুর ছিল বাউলদের ভেতর, আগে বাউলদের গানের যে সুর মানুষের মনে ঐশীভাব জাগ্রত করত—এখন তা নেই। এখন বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র দ্বারা বাউল গানের সে সুর বিলুপ্তির চেষ্টাই চলছে আমি বলবো। বাউল গানের ওই মরমী সুর, ঐশীভাব জাগ্রত হবার সে সুর এখন নেই বললেই চলে। পৃথিবী বদলাচ্ছে, বাউল গানও বদলে যাচ্ছে, সময়, পরিস্থিতি বাউল গানকে বদলে দিচ্ছে।

সংগ্রাহক : আর বাউলদের বর্তমান অবস্থা কেমন?

তারা মিয়া : বাউলদের বর্তমান অবস্থাও করুন। বাউলদের মূল কাজ হলো সাধনা। বাউল গান সাধনার বিষয়। কিন্তু বাউলরা খাবারের জন্য দৌড়াবে, নাকি সাধনা করবে? শুধু এখন নয় বাউলদের আর্থিক অবস্থা সৃষ্টি থেকেই শোচনীয়। আমি বিনীত অনুরোধ জানাবো রাষ্ট্রীয় শক্তিতে যারা উপবিষ্ট, তাদের কাছে, তারা যদি একটু সুদৃষ্টি দেন, তবে অবহেলিত বাউলদের একটা গতি হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এবং আমি মনে করি সরকারের সুদৃষ্টি পেলে বাউলরা আরো অনেক অগ্রসর হতে পারবে। বাউল গানের বর্তমান অবস্থা শুনেই তো বুঝতে পারছেন বাউলদের বর্তমান অবস্থা কী। বাউল গানের এই দুঃসময়ে আমরা বাউলেরা মানসিকভাবেও ভালো নেই, এটা তো আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন।

সংগ্রাহক : বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে বাউল গানের আবেদন কতটুকু আছে?

তারা মিয়া : হ্যাঁ, তথ্য-প্রযুক্তি এখন গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে—এটা ঠিক। কিন্তু এখনো গ্রামে, সঠিক অর্থে গ্রাম পর্যন্ত বাউল গানের আবেদন যথেষ্ট আছে। শ্রোতা যারা, তারা বাউল গানকে ভালবাসে, শুধু ভালোবাসে বললে কম বলা হবে, সত্যিই তারা এই গানকে মনে প্রাণে ভালোবাসে। আজকে আপনি দেখবেন, ব্যান্ড সংগীত, পপসংগীতের বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্র দ্বারা এই বাউল গানের সুরকে বিকৃত করার চেষ্টা চলছে, কিন্তু প্রকৃত শ্রোতা, বিবেকবান মানুষ যারা তারা প্রকৃত সুরটাকে হারাতে চাচ্ছে না।

সংগ্রাহক : এই বাউল গান নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

তারা মিয়া : ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলতে, এই যে গানগুলো লিখলাম, হাজারের ওপরে, গান আমার এখনো আসছে। এই গানগুলো যদি আমি বিশেষ জায়গায় রাখতে

www.pathagar.com

পারি, জীবিত রাখতে পারি, এবং এই গানগুলো যদি আমার অমর হয়ে থাকে, আমি মারা গেলেও আমার গানগুলো যদি বেঁচে থাকে, আর এই চেষ্টাটাই আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা বলতে পারেন। আর আমার মৃত্যুর পর আমার উত্তরসূরি বা শিষ্যরা যেন বাউল গানের সুরেই বাউল গান করে, এই মরমী সুরটাকে ধরে রাখে। আর এই লক্ষ্যে আমি নিরন্তর লিখে যাচ্ছি, গান করে যাচ্ছি এবং আশা করি, আমার গানগুলো থাকবে, আমি মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকতে পারবো। আর যতদিন বেঁচে থাকবো, ততদিন যেন গান নিয়েই থাকতে পারি—এটাই আমার একমাত্র চাওয়া আর কিছু না। আর এটাও মনে রাখতে হবে বাউল গান, বাউলরা কিন্তু সবমসয় পরিবর্তন চেয়েছে ও করে গেছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি, কু-সংস্কার তাদের ভেতর নেই, ছিল না।

সংগ্রাহক : আর যদি স্বপ্নের কথা জানতে চাই, একজন বাউল সাধক হিসেবে কী বলবেন?

তারা মিয়া : স্বপ্নের কথা জানতে চাচ্ছেন, স্বপ্নের কথা জানতে চাইলে শুধু এটুকুই বলবো 'বাউল মরমী শিল্পী। বাউল গান সাধনার বিষয়। আর এই মরমী গান এখন পপ, রক ...এসব গানের জোয়ারে প্রায় হারাতে বসেছে। আমরা যদি এই গানকে, এই মরমী কথা ও সুরকে ধরে রাখতে পারি, জনসমাদৃত করতে পারি-তবে ভবিষ্যত প্রজন্মের এটা একটা শ্রেষ্ঠ উপহার হবে।'

সংগ্রাহক : আপনি আপনার উত্তরসূরি রেখে যাচ্ছেন কি না?

তারা মিয়া : আমার উত্তরসূরি বলতে, আমার এই পর্যন্ত পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, যারা আমার এই গানগুলো পরিবেশন করছে—ওরাই, ওরা আমার ভক্ত, ওরাই আমার উত্তরসূরী এবং আমার গানের ধারক, বাহক। ওরাই আমার গানকে মাঠে-ঘাটে, পাড়াগাঁয়ে, শহরে-বন্দরে, জলে-স্থলে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে, পরিবেশন করছে, এবং ভবিষ্যতেও করবে। আমার উত্তরসূরি বলতে আমি আমার শিষ্য, ভক্তদেরই বুঝি, আর আমি তাদের কথাই বলবো। নালিতাবাড়ি নন্নীতে মো. আমজাদ হোসেন আমার গান করেন, নন্নীতে আরো আছেন, আনোয়ার হোসেন, শেখ ফরিদ, আলকাস মিয়া, এখলাছ মিয়া, আব্দুল আলীম, এরা সবাই আমার গান করেন। নালিতাবাড়ির ছেলে, এটিএন বাংলার তিন চাকার তারকা মো. মোখলেছুর রাহমানও আমার শিষ্য। এছাড়া নকলাতে আছেন আহসান হাবীব, আয়াতউল্লাহ, কিশোরগঞ্জে আছেন মুসলেম উদ্দীন, পূর্বধলা নেত্রকোনাতে আছেন হাফেজ উদ্দিন, খালেক চৌধুরী, ঢাকাতে আছেন মাঈনুদ্দিন এবং মেয়েদের মধ্যে জামালপুরে সরিষাবাড়িতে আছেন খালেদা পারভীন, নকলাতে মনোয়ারা বেগম।[৩]

তথ্যনির্দেশ

১. সাক্ষাৎকার : তারা বাউল, ৩০ মার্চ ২০১২, বিকাল ৩-৫টা
২. সাক্ষাৎকার : আবেদ আলী বয়াতি, ২ এপ্রিল ২০১২, বিকাল ৪-৫টা
৩. সাক্ষাৎকার : বাউল তারা মিয়া, ৫ নভেম্বর ২০১২, বিকাল ৩-৪টা

www.pathagar.com

লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্যে রয়েছে গোষ্ঠীসমাজের তথা পল্লি বাংলার লোকপরম্পরাগত চিন্তাধারা। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা রয়েছে। সাহিত্যসাধক মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী লোকসাহিত্যের নানা মনীষীর মতামত গ্রহণ করে বলেছেন, "আদিম যুগের মানুষ ক্রমে সংহত সমাজে আবদ্ধ হইয়া ভাব, চিন্তা ও অনুভূতির যে অভিব্যক্তি প্রদান করিয়াছেন, তদ্সমুদয়কে এক কথা লোকসাহিত্য বলে।" বৃহত্তর ময়মনসিংহের পৃথক জেলা হিসেবে শেরপুর অঞ্চলেও রয়েছে সমৃদ্ধ লোকসাহিত্য।

ক. লোকগল্প

লোকসাহিত্যের অন্যান্য সমৃদ্ধ শাখার মতো লোকগল্প শেরপুর অঞ্চলের মানুষ আড্ডায়, বিচার-আচারে, বিয়ের আসরে পরিবেশন করে থাকেন। এসব গল্পের একক কোনো স্রষ্টা নেই। গ্রামীণ মানুষেই এসব গল্প ঘটনাক্রমে ও অভিজ্ঞতার আলোকে সৃষ্টি করেছেন। আর মানবসমাজে তা পরম্পরাগতভাবে প্রচলিত।

লোকগল্প-১

কোনো এক গ্রামের এক লোকের একটা ছেলে ছিল। ছেলেটির বুদ্ধি আক্কেল কম। যাহাকে বলে নির্বোধ। ঐ ছেলেকে অন্য গ্রামের এক লোকের মেয়ের সাথে বিবাহ দেওয়া হইলো। বিবাহের পর নতুন জামাই শ্বশুর বাড়ি যাইবে। শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় পিতা ছেলেকে বলিলেন, তুমি ঐ বাড়িতে গিয়া শ্বশুরের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবা, উঁচু জায়গায় বসবা এবং আদর কম করিলে খাওয়া-দাওয়া করবা না। ছেলে শ্বশুর বাড়ি গিয়া শ্বশুরকে বলিল, বাবাজান এই পুকুরের মাটি কী করিয়াছেন? শ্বশুর বুঝিল, জামাই আস্ত একটা বোকা। তিনি বলিলেন, পুকুরের অর্ধেক মাটি আমি খাইয়াছি আর অর্ধেক তোমার পিতা খাইয়াছে।

জামাই বলিল, খুব বালা করছেন, মাটি যে অর্ধেক অর্ধেক করিয়া খাইছেন তাতে ন্যায় বিচার হইছে, অন্যায় কিছু হয় নাই। এরপর জামাই ঘরে গেলে তাকে চেয়ারে বসতে দেওয়া হইলো, সে বসিল না। তারপর টোল দেওয়া হইল, তারপর মোড়া দেওয়া হইল কিন্তু কোনোটাতেই সে বসিল না। পিতার কথা অনুযায়ী বসার জন্য উঁচু জায়গা খুঁজিতে লাগিল।

অবশেষে পানির চৌকিকে উঁচু দেখিয়া সেখানে গেল এবং গিয়া কলসি সরাইয়া তাহার উপর বসিল। এরপর রান্না-বান্না হইলে, খাবার জন্য শ্বশুর জামাইকে ডাকিল।

www.pathagar.com

জামাই গেল না, সে তার পিতার কথা মনে করিল। এরপর অন্যান্য সকলেই কয়েক বার ডাকিল কিন্তু সে গেল না। অবশেষে সবাই খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বাতি নিভাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

একমাত্র জামাই না খাইয়া বসিয়া থাকিল। মধ্যরাতে দিকে তার অনেক ক্ষুধা লাগলে, সে চুপি চুপি রান্না ঘরে যাইয়া পাতিল থেকে ভাত বাড়িয়া থালায় যখন তরকারি নিতে গিয়াছে তখনই পাতিলে ঢাকনা হাত থেইক্যা পড়িয়া গেলে, ঝনাৎ করিয়া শব্দ হইল। শব্দ শুনিয়া সবাই চোর চোর বলিয়া উঠিয়া পড়িল এবং চোরকে হাতেনাতে ধরে পিটাতে শুরু করিল। পিটনি খাইয়া জামাই বলিল, আমি চোর না, আমি জামাই— আমারে মাইরেন না।

লোকগল্প-২

নতুন জামাই গেছে শ্বশুর বাড়ি। জামাইয়ের বুদ্ধি বা আক্কেল কম না বেশি তা পরীক্ষা করিতে চান শ্বশুর। সেজন্য তার স্ত্রীকে বলিল, তুমি ৫টি ডিম পাক করো। স্ত্রী ৫টি ডিম, ভাত ও তরকারি রান্না করিয়া স্বামীকে বলিল, জামাইকে নিয়ে খান। শ্বশুর জামাই ও স্ত্রীকে নিয়ে খাইতে বসিল। খাওয়ার আগে শ্বশুর বলিল, জামাই ৫টি ডিম রয়েছে আপনি ৩ জনের মধ্যে সমান করিয়া ভাগ করিয়া দেন। জামাই নিজের কাছে ১টি রাখিল, ১টি শ্বশুরকে দিল ও ৩টি শাশুড়িকে দিল এবং বলিল, আমার কাছে ২টি ডিম, শ্বশুর-আব্বার কাছে ২টি ডিম আর শাশুড়ির কাছে কোনো ডিম নেই বলে তাকে ৩টি ডিম দেওয়া হইলো।

লোকগল্প-৩

নতুন জামাই গিয়াছে শ্বশুর বাড়ি। শ্বশুর বাড়িতে নাই। জামাই শাশুড়িকে সালাম করতে গেলে, শাশুড়ি তাড়াতাড়ি জামাইয়ের কাছ থেকে সরিয়া পড়িল। কারণ জামাইয়ের মুখে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ, মুখভর্তি ময়লা। জামাইকে সরাসরি না বলে শাশুড়ি কৌশল করিল। নিজের ছেলেকে বলিল, তুমি জামাইকে নিয়া বাজারে যাও এবং দুইজনে মিলিয়া কুশার (আখ) খাইয়া আসো, জামাইয়ের মুখের ময়লা পরিষ্কার হইবে। মায়ের কাছ থেইক্যা টেহা লইয়া ছেলে দুলাভাইকে নিয়া পাশের বাজারে গেল। গিয়া কুশার কিন্যা খাওয়ার জন্যে দুলাভাইকে প্রস্তাব দিলো। কিন্তু জামাই মশায়, কুশারের পরবর্তী বাঙ্গি কিইন্যা খাইলো। কোথায় দাঁত পরিষ্কার হইবে বরং দাঁতে ও মুখে আরও ময়লা হইলো।

খ. কিংবদন্তি

কিংবদন্তি এক ধরনের কাহিনি বলা যায়। তবে তা লোকগল্পও নয়, রূপকথা বা লোককথাও নয়। কোন বিশেষ স্থান বা ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে কিংবদন্তি। লোকশ্রুতির মধ্য দিয়েই কিংবদন্তি টিকে আছে। কিংবদন্তিতে লোকসমাজের বাস্তবতা ও প্রখর কল্পনার প্রকাশ ঘটে। শেরপুর অঞ্চলে অন্যান্য অঞ্চলের মতোই কিংবদন্তির মৌখিক ঐতিহ্য পরিলক্ষিত।

www.pathagar.com

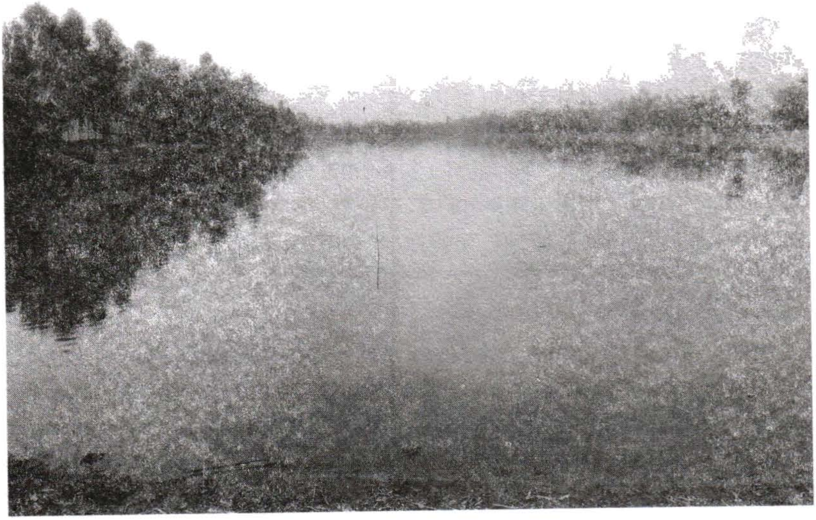

সুতানালী দিঘি

জরিপ শাহের দরগাহ-র উত্তর পাশ সংলগ্ন বিশেষ পাথর

www.pathagar.com

কিংবদন্তি-১ : শের আলী গাজী ও পদ্মাবতী

'নাও ঘোড়া নারী যখন যার হাতে তারই' কথার কথা। সত্য কথা। নৌকা জল-পথের, ঘোড়া স্থল-পথের, নারী জীবন-পথের সাথী। কিন্তু নারী কখনও জীবনের আলো নিভায়। নারীর কারণে কেউ হারায় সিংহাসন, কেউ হারায় জমিদারিত্ব, কেউ হারায় প্রাণ। যুগে যুগে এ রকম অসংখ্য ঘটনা, কাহিনি, কিংবদন্তি আছে। শেরপুরের জমিদার শেরআলী গাজীর জীবনে রূপসী পদ্মাবতীর আগমন ও বিচ্ছেদ এ রকমই একটি দুঃখভরা গাথা। কয়েকশ বছর আগে। মুর্শিদাবাদ সরকারের অধিনস্ত শেরপুর অঞ্চলের জমিদার শেরআলী গাজী। যার নামেই নাম হয়েছে শেরপুর। শেরআলী গাজী শের বংশের শেষ জমিদার। সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা পুরুষ শেরআলী গাজী। অধীনতা তার পছন্দ নয়। তাই একদিন মুর্শিদাবাদ সরকারের অধীনতা ছিন্ন করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে জমিদারিত্ব শুরু করেন।

রাজধানী স্থাপন করেন গড়জরিপা। এই গরজরিপার একটি ইতিহাস আছে। বহু আগে এই অঞ্চলকে কামরূপ বঙ্গ বলা হতো। এই কামরূপ বঙ্গের অধিকারে ছিলেন স্থানীয় অনার্য আদিবাসীরা। শেরপুরের এই গরজারিপা কোচদের অধীনে ছিল মুসলমান শাসক-সেনাপতিরা এসে এই অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো দখল করতে থাকে। ইতিহাসবিদদের কাছ থেকে জানা যায়, ইলিয়াস শাহর আমল থেকে আলাউদ্দিন শাহর আমল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩৫৭ থেকে ১৫১৯ সাল পর্যন্ত মুসলিম সেনাপতিদের সাথে লড়াই করে অবশেষে গড়জরিপা কোচ বংশীয় সামন্তরা ছাড়তে বাধ্য হয়। তখন গড়জরিপার নাম ছিল গড়দরিপা। সেখানে জরিপা নামে এক দরবেশ ছিলেন, পরে তার নামানুসারে গড়জরিপা হয়। বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার মতো শেরপুরের শেষ মুসলিম জমিদার শেরআলী গাজী এই গড়জরিপাকে রাজধানী করেন। অত্যন্ত সুদর্শন যুবক শেরআলী গাজী। বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত জমিদারিত্বে তাঁর মন নেই, অনেক খাজনা বাকি পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সপ্তদশবর্ষী সুপুরুষ শেরআলী গাজী শিকার করা পছন্দ করতেন। ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করতেন। তো, একদিন নদী পথে নৌকা ভাসালেন। উদ্দেশ্য শিকার করা। পাখি শিকার অথবা হরিণ শিকার। নদীর নাম মৃগী। নৌকা যাচ্ছে, শেরআলী গাজীও চোখ ফেরাচ্ছেন এদিক ওদিক। যেতে যেতে নদী তীরবর্তী গ্রাম দর্শায় গিয়ে পৌছালেন। দর্শা গ্রামের নদীর ঘাট। ঘাটে এক অপরূপা, সুন্দরী নারী। নাম তার পদ্মগন্ধা, পদ্মিনী বা পদ্মাবতী। রূপবতী পদ্মাবতীকে দেখে বিমুগ্ধ হলেন নৌকারোহী সুদর্শনশিকারী শেরআলী গাজী। রাজ্যের জমিদার শেরআলী গাজী আর পদ্মাবতী রাজ্যের সামান্য প্রজা এক গোয়াল বা বৈদ্যের রূপসী কন্যা। সে সময় অল্প বয়সেই বিয়ে হতো মেয়েদের। আবার মেয়ে যদি হয় রূপবতী। তো, রূপসী পদ্মাবতীকেও অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়ে দেন গরিব পিতা। পদ্মাবতীর স্বামী রামভল্লব নন্দী। মুর্শিদাবাদ সরকারের কাননগু অফিসের সামান্য কর্মচারি। কোন একদিন রামভল্লব পদ্মাবতীকে ত্যাগ করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন। স্বামীর জীবনাবসানে সুন্দরী পদ্মাবতী শাহজাদা শেরআলীর প্রতি আকৃষ্ট হন। এবং শাহাজাদা শেরআলীর প্রেম কামনা করেন। শাহজাদা পদ্মাবতীকে সাদরে গ্রহণ করেন। তাদের প্রেমের মিলন হয়।

www.pathagar.com

কিন্তু তাদের সুখ বেশি দিন টিকে না। শুরু হয় তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। শাহাজাদা শেরআলীর বিরুদ্ধে পরস্ত্রী হরণ, জেনা এবং রামভল্লবকে হত্যার অভিযোগ আনে পদ্মাবতীর নিকট আত্মীয় হিন্দুরা। মুর্শিদাবাদ নেজামতে শেরআলীর বিচার হয়। বিচারে শেরআলী গাজীর প্রাণদণ্ড হয়। শর্ত থাকে যদি শাহাজাদা জমিদারিত্ব ছেড়ে দেন তাহলে তার মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হবে। এ সময় পদ্মাবতী মৃত্যুবরণ করেন। শাহাজাদা শেরআলী গাজী ও পদ্মাবতীর একমাত্র শিশুপুত্র রামানাথ নন্দীকে (প্রকারান্তরে পদ্মাবতী ও রামবল্লবের সন্তান) সমস্ত জমিদারিত্ব দিয়ে হতভাগা শাহজাদা শেরপুরের অদূরে তার নিজস্ব খামার বাড়ি (যা বর্তমানে গাজীর খামার) নির্বাসনে চলে যান বা অজ্ঞাত বাসে যান এবং এই অজ্ঞাত বাসেই কষ্টে-দুঃখে, ক্ষোভে, বেদনায় জমিদার শেরআলী গাজী ফকিরের মতো জীবনকে শেষ পরিণতির দিকে ঠেলে দেন। একদিন তার জীবনের আলো নিভে যায়।

শেরআলী গাজী ও পদ্মাবতীর কাহিনির নানা মতান্তর আছে। কেউ বলেছেন, পদ্মাবতীর স্বামী রামবল্লভকে নৌবিহারে নিয়ে হত্যা করে শেরআলী পদ্মাবতীকে লাভ করেন। কেউ বলেন, স্বামী পদ্মাবতীকে ত্যাগ করলে, শাহাজাদার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজেই শেরআলীর কাছে প্রণয় প্রার্থী হন।

কেউ বলেন, হিন্দুরা জমিদারিত্ব লাভ করার জন্য পদ্মাবতীকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে, এ জন্য তারা রামবল্লভকে হত্যা করায় ও মুর্শিদাবাদ নিয়ে গিয়ে পদ্মাবতীকে দিয়ে শেরআলীর বিরুদ্ধে নরহত্যা, পরস্ত্রী হরণ, জেনা ইত্যাদির অভিযোগ করায় স্বয়ং আজিজ খাঁ বিচার করে প্রাণদণ্ড প্রদান করেন। ষড়যন্ত্রের শিকার শেরআলী অপমানে, দুঃখে অজ্ঞাতবাসে জীবন নিঃশেষ করে দেন।

শেষকথা : শেরআলী গাজী আর পদ্মাবতীর প্রেম-উপাখ্যান আজও শেরপুর অঞ্চলের প্রবীণদের হৃদয়ে দুঃখ স্মৃতি হয়ে বাজে। হয়ত বাজবে বহুদিন। হয়ত বিস্মৃত হয়ে যাবে এক সময়।

এখনও সমাজে প্রচলিত রামানাথ নন্দীর জমিদারীত্বের অভিষেকের মধ্য দিয়েই হিন্দুদের উত্থান ঘটে শেরপুর অঞ্চলে।

কিংবদন্তি-২ : জরিপশাহ মাজার

শেরপুরের গড়জরিপায় যে মাজারটিতে এখনো অনেক মানুষ তাদের মনের বাসনা-কামনা পূরণের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করে, সেটি জরিপ শাহ'র মাজার বা সমাধিসৌধ। এক সময় জরিপ শাহ এখানকার বাদশাহ বা শাসক ছিলেন। আর তখন দিল্লির বাদশা বা শাসক ছিলেন তার মামা। বহুদিন নিজেদের মধ্যে দেখা হয় না বলে, দিল্লি থেকে মামা একদিন দূতের মাধ্যমে জরিপ শাহকে দেখার জন্য খবর পাঠালেন। জরিপ বাদশা একটি পাতিল ওই দূতের হাতে দিয়ে বললেন, এটি নিয়ে মামাকে দিবে তবে শর্ত হল—এটি খুলে দেখা যাবে না অর্থাৎ যেভাবে দেয়া হল, সেভাবেই তার মামার হাতে পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু শর্ত ভঙ্গ করে দূত পথিমধ্যে এই পাতিল খুলে ফেলে। দেখে পাতিলের ভিতর জরিপ শাহ'র মাথা। সঙ্গে সঙ্গে এটি বন্ধ করে নিয়ে যায় তার মামার কাছে। মামা দেখে বলে, এ কী করেছো তুমি—এ যে জরিপের মৃত মস্তক-খণ্ড? তখন

www.pathagar.com

মামা তার মস্তকটির দাফন করে দিল্লিতে আর ধর অর্থাৎ দেহটি দাফন করা হয় বর্তমান মাজারের এই জায়গাটিতে। এই কিংবদন্তিটি এখনো এই অঞ্চলে লোকমুখে প্রচলিত আছে।

কিংবদন্তি-৩ : কালিদহ সাগর

শেরপুরের বিখ্যাত গড়জরিপার পাশেই এখন যে জলাশয়টি দেখা যায়, সেটি কালিদহ সাগর নামে পরিচিত। বহু আগে এই কালিদহে দেবীর অভিশাপে অন্যান্য স্থানের মত ডুবে যায় চাঁদ-সওদাগরের ডিঙ্গা। ডিঙ্গাটির ধ্বংসাবশেষ এখন রয়ে গেছে এই কালিদহ সাগরে। কিন্তু ধ্বংসাবশেষটি এখন মাটির রূপ পেয়েছে। এটি এখনও জলাশয়টির মাঝখানে আছে এবং ভূমির উচ্চতা থেকে আনুমানিক দুই ফুট উঁচু। মজার ব্যাপার হল—বন্যার সময় যতই পানিতে সাগরটি ভরে যায়, ডিঙ্গিটি সেই দুই ফুট উপরেই থাকে। এই অঞ্চলের মানুষেরা এখনো কালিদহ সাগরের চাঁদ-সওদাগরের ডিঙ্গার রহস্যের উন্মোচন করতে পারেননি। এই কিংবদন্তিটিও মানুষের মুখে মুখে রয়েছে।

কিংবদন্তি-৪ : ঐতিহাসিক সুতানালী দিঘি বা বিরহিনী দিঘি

নালিতাবাড়ি উপজেলার কাকরকান্দি ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী একটি গ্রাম শালমারা। উপজেলা সদর থেকে এর দূরত্ব আড়াই কিলোমিটার। কেউ বলেন, মোগল আমলের শেষের দিকে এ গ্রামে কোন এক সামন্ত রাজার বাড়ি ছিল। আবার কেউ বলেন, এখানে একটি বৌদ্ধবিহার ছিল। এ ব্যাপারে সঠিক ইতিহাস এখনো পাওয়া যায়নি।

যা হোক, এই গ্রামে রয়েছে ২৮.৫৮ একর জমির উপর বিশাল এক দিঘি। দিঘিটি সরকারি নথিপত্রে 'বিরহিনী দিঘি' এবং এলাকার 'সুতানালী দিঘি' নামে পরিচিত। কমলা রাণীর দিঘি নামেও দিঘিটি পরিচিত।

দিঘিটি কে, কখন কেন খনন করেছিলেন এ বিষয়ে সঠিক ইতিহাস নির্ভর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কেননা, বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের অনত্যম সমৃদ্ধ জনপদ নালিতাবাড়ির আদি ইতিহাস, সমাজ, জীবনাচার সম্পর্কে কোন সুলিখিত গ্রন্থ বা প্রামাণ্য রচনা নেই। তবে দিঘিটি সম্পর্কে দু'রকমের কিংবদন্তি বা কাহিনি পাওয়া যায়।

এটি কাহিনি এরকম—এখানে রাজবংশী ধর্মপ্রাণ সামন্ত রাজা ছিলেন। সে আমলে একাধিক রাণীর প্রচলন থাকলেও রাজা কমলা দেবীকে রাণী হিসেবে গ্রহণ করে সুখে শান্তিতে দাম্পত্যজীবন যাপন করছিলেন। এক রাতে কোন এক সুন্দর মুহূর্তে রাণী রাজাকে বললেন, 'আমাকে এমন একটা কিছু দান করুন—যা যুগে যুগে লোকে মনে রাখবে।' রাজা চিন্তা করে রাণীকে বললেন, 'অবিরাম এক রাত সুতা কাটলে যে পরিমাণ সুতা হবে, সেই সুতার দিঘির পাশে যে পরিমাণ স্থান হবে, সে পরিমাণ একটি দিঘি তোমার নামে খনন করা হবে। সেই দিঘির পানি জনগণ ব্যবহার করবে এবং তোমাকে মনে রাখবে'। এতে রাণী সম্মতি দেবার পর দিঘির খনন কাজ শুরু হয় এবং অবিরাম পরিশ্রমের ফলে প্রকাণ্ড একটি দিঘি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়। কত বড়ো দিঘি এক পাড়ে দাঁড়ালে আরেক পাড়ের মানুষ চেনা যায় না শুধু দেখা যায়। তবু দিঘিতে জল ওঠে না। রাজা-প্রজা সবাই চিন্তিত। এখন কী করা যায়। অবশেষে রাজা

www.pathagar.com

স্বপ্নে দেখতে পেলেন, 'গঙ্গা পূজা কর রাজা নরবলি দিয়া। তবেত পুকুরে উঠিবে জলেতে ভরিয়া'। সব শুনে রাণী চিন্তিত হয় পড়লেন। নরবলি দিতে তিনি নারাজ। নরবলি না দিয়ে রাণী গঙ্গা মাকে প্রার্থনা জানান। গঙ্গা পূজার প্রসুতি নেন। দিঘির মধ্যে মহা ধুমধামে গঙ্গাপূজার আয়োজন করে রাণী গঙ্গা মায়ের পায়ে প্রার্থনা জানিয়ে বলেন, 'কোন মায়ের বুক করিয়া খালি তোমাকে দিব মাতা নরবলিহ। আমি যে সন্তানের মা, আমার করিয়া ক্ষমা কোলে তুলি নেও মা পুন কর তোমার পূজা'।

হঠাৎ পুকুরের তলায় বজ্রপাতের মতো শব্দ, পুকুরের তলা ফেটে প্রবল বেগে পানি উঠতে লাগলো। লোকজন হুরোহুরি করে পাড়ে উঠতে লাগলো। সবাই উঠলো কিন্তু রাণী উঠতে পারলেন না। পুকুরের টুইটুম্বুর জলে রাণী তলিয়ে গেলেন। রাজা রাণী রাণী বলে চিৎকার করে ওঠেন কিন্তু কোন উত্তর মেলে না। সেই থেকে এই দিঘি—'সুতানালী দিঘি বা বিরহিনী দিঘি' নামে পরিচিত।

অপর কাহিনিটি এরকম—খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শালমারা গ্রামে সশাল নামে এক গারো রাজার রাজত্ব ছিল। শালমারা গ্রামের উত্তরে গারো পাহাড়ে পর্যন্ত তাঁর অধীনে ছিল। বাংলায় তখন সুলতানদের শাসন। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ তখন বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। ১৩৫১ সালে তিনি সালাল রাজার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। সশাল রাজার রাজধানী ছিল শালমারা গ্রামে রাজাধানীর চিহ্ন বিশেষ এখনো দেখা যায়। রাজা পলায়ন করে জঙ্গলে আশ্রয় নেন।

পরবর্তীকালে আবার গারো রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজা সশাল বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাঝখানে ছোটো ভূখণ্ডের মধ্যে একটি ঘর নির্মাণ করে চার দিকে পরিখার মতো খনন করেন। রাজা যখন সেখানে থাকতেন, তখন তাঁর প্রতিরক্ষাবাহিনী ডিঙ্গি নৌকা দিয়ে চার দিকে টহল দিতো। কালক্রমে ঐ ভূখণ্ডটি ধ্বসে গিয়ে এই দিঘির রূপ নিয়েছে। দিঘিটির পশ্চিম পাড়ে বড়ো বড়ো ইটের ধ্বংসাবশেষ এখনো রয়ে গেছে। রাজার শেষ বংশধর ছিলেন 'রাণী বিরহিনী'। ১৯৪০ সালে সরকারি ভূমি জরিপে দিঘিটির 'বিরহিনী রাণী'র নামেই রেকর্ড করা হয়েছিল।

এই কমলা রাণীর দিঘি বা সুতানালী দিঘি বা বিরহিনী দিঘি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সঠিক ইতিহাস জানা না গেলেও এটি যে বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক দিঘি বা নিদর্শন—এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দিঘিটি দীর্ঘদিন পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকায় শ্যাওলা জমে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। ঐ শ্যাওলার উপর দিয়ে পায়ে হেঁটে পাড় হওয়া যেত। গরু বাছুর চড়ে বেড়াতো।

সর্বপ্রথম দিঘিটি সংস্কার করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৯৭ সালে। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার মজাপুকুর সংস্কার ও মৎস্য চাষ প্রকল্পের আওতায় দিঘিটিকে সংস্কার করে মৎস্য চাষ করার পরিকল্পনা নেন। ঐতিহাসিক এই দিঘিটিতে কেন্দ্র করে এখন ১২২ টি ভূমিহীন পরিবার জীবিকা নির্বাহ করছেন। এছাড়া এটা হয়ে উঠেছে শোখিন মৎস্য শিকারীদের মিলন মেলা।

প্রতিবছরই টাকার বিনিময়ে মৎস্য শিকারিদের মাছ ধরার ব্যবস্থা করা হয় ঢাকা ময়মনসিংহ থেকে অনেক অনেক মৎস্য শিকারি অধুনিক বড়শি নিয়ে মাছ ধরতে আসেন। সুতানালী দিঘি বা বিরহিনী দিঘি নালিতাবাড়ির একটি ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান।

www.pathagar.com

গ. লোকপুরাণ

সৃষ্টি রহস্য, আদিম স্মৃতি, আদিম সংস্কার এখনও সাধারণ মানুষের কাছে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। ফলে সৃষ্টি রহস্যকে কেন্দ্র করে আদিম সমাজের যে সব সংস্কার লোক পরম্পরাগতভাবে চলে আসছে বিভিন্ন গোষ্ঠীসমাজে তা কাহিনি হিসেবে বর্ণিত হলেও লোকপুরাণ হিসেবে লোকসাহিত্যের অন্যতম উপাদান বলে গণ্য সৃষ্টি রহস্য, মানুষের উদ্ভব, দেব-দেবীর জন্ম প্রভৃতি বিষয় লোক পুরাণের অন্তর্গত।

লোকপুরাণ-১

সৃষ্টিকর্তার নাম তাতারা রাবুগা। তাঁর দুই অনুচর নস্‌তু-নপানতু'এবং 'মাচ্চি'। এদের সাহায্যে তিনিই জগতের সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সর্ব-শক্তিমান ও সর্বত্র তিনি আছেন। তিনিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁর কাজ ও গুণ অনুসারে তিনি বহুনামে পরিচিত। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তাঁর নাম 'দাক্‌গিপা'। জগতের প্রভু ও মালিক হিসাবে অন্য নাম 'নক্‌গিপা' বা 'নক্ মাগিপা'। গারো ভাষায় 'মিদ্দি' অর্থ দেবতা। 'আমোয়া' অর্থ পূজা। মহান 'তাতারা রাবুগা' হলেন গারোদের প্রধান দেবতা। প্রধান দেবতার উপাসনা বেশ ব্যয় বহুল। প্রধান দেবতা ছাড়া ও আরো কয়েকজন দেবতার কল্পনা করা হয়।

শুরু থেকেই গারোরা প্রকৃতির শক্তিকে ভয় করে আসছে। তাই তারা এই শক্তির প্রতি অনুগত হয়ে তাঁর পূজা করেছে। ভয়, রোগ-ব্যধি, বন্য জন্তু ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য দেবতার পূজা করেছে। ভাল ফসলের জন্য পূজা করেছে। এভাবে গারো ধর্ম মতে নানা দেবদেবীর পূজা করার রীতি এসেছে। তবে এদের কেউই সৃষ্টিকর্ত বা ঈশ্বরের সমান নয়। গারোদের এই ধর্মকে অনেকেই সাংসারেক বলে থাকেন। কেউ কেউ বলেন 'গারো ধর্ম'। গারোরা বিশ্বাস করে যে, মহান অদৃশ্য শক্তি হচ্ছে রাগিবা বুরুম্বি। তিনিই সৃষ্টিকর্তা তাতারা রাবুগা। তিনিই অন্যান্য দেবদেবীর বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

লোকপুরাণ-২

আদি গারো ধর্ম অনুসারে কয়েকজন দেবতার পূজার রীতি আছে। সালজং দেবতা বিত্ত দান করেন। তিনি পৃথিবীকে ফুলে ফলে ভরে তোলেন। রোগ ব্যাধির জন্য সুসিমে দেবীর পূজা করা হয়। তিনি নর-নারীর মিলনে ভূমিকা রাখেন। চুরাবুদি হলেন সব শস্যের রক্ষাকর্তা।

কালকামে হলেন মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবন রক্ষাকারী। গোয়ারা ইন্দ্র দেবতার প্রতীক। আসিমা-দিংসিমা দেবী অমঙ্গলের প্রতীক। তাই তার নাম উচ্চারণ করা হয় না। টংরেমা ছোটো ছেলে মেয়েকে ভয় দেখান। নাওয়াং অপ দেবতা। তিনি বিদেহী আত্মাকে বিপথগামী করার চেষ্টা করেন। তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য মৃতের শয্যায় কিছু টাকা কড়ি উৎসর্গ করা হয়। মেগাপাফিয়া দেবীর পূজা করা হয় নবজাত শিশুর মঙ্গল কামনায়। আল্লেমী দেবীকে সব দেব-দেবীর রাণী বলা হয়।

www.pathagar.com

ঘ. লোককবিতা

বলা হয়ে থাকে, কবির দেশ বাংলাদেশ। গ্রাম-বাংলায় অনেক স্বভাব কবি বা চারণ কবি বা বাউল কবি রয়েছেন। যাঁরা লিখেছেন প্রচুর লোককবিতা। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি ও জ্ঞান সহজ-সরল ভাষায় এবং সুরের মাধুর্যে মুখে মুখেই রচিত হয় লোককবিতা। লোক মুখেই গ্রাম-বাংলার আনাচে-কানাচে লোককবিতা প্রচারিত হয়ে জনপ্রিয় ওয়ে ওঠে। লোককবিতাগুলো সাধারণত গীত হয়ে থাকে।

পাগল তারা বাউলের লোককবিতা

১.
এই পাগলাটারে এমন করে আর কাঁদাইয়াও না
আমি আর কাঁদতে পারি না না॥

আমি তো কাঁদি না কে যেন কাঁদায় আমারে
এক নজরে দেখিতে তারে বড় ইচ্ছা করে
যদি থাকত দয়া তার অন্তরে এমন হত না॥

আমাকে কাঁদাইয়া যদি তুমি থাক খুশি
কাঁদাও যত কাঁদব তত তবু তোমায় ভালবাসি
আমি হবো ঐ চরণের দাসী চরণ ছাড়া কইর না॥

যার কারণে আঁখি ঝরে তারে দেখি নাই নয়নে
কথা ছিল দেখা দিবে সাধু রূপ দর্শনে
আমার কখন কী ভুলের কারণে সাধুর সঙ্গ হলো না॥

যেই পাখিটার গান শুনিয়া তোমরা আমায় বাসলে ভাল
সেই পাখিটার গানে আমায় ঘর ছাড়া করিলে
পাখি গানের ভাষায় কী বলতে চায় আমি নিজেই বুঝি না॥

আত্মার প্রেম না হলে সেই প্রেম অযথা
কান্নাকাটি যতই কর সবি তোমার বৃথা
যদি বুঝতে পার গানের কথা পাবে তারার ঠিকানা॥

২.
জীবন নদীর পাড়ে ও মন বাঁধিয়াছ ঘর
কখন যেন ভেঙ্গে দেবে মরণ নামের ঝড়॥

জীবন আছে যার মরণ আছে তার
বাঁচার উপায় নাই

www.pathagar.com

কি করবে তোর পিতা মাতা কী করবে তোর ভাই
দেবে বিদায় স্ত্রী পুত্র কন্যায়

কেউ কাটবে গিয়ে তোর ঝাড়ের বাঁশ
কেউ করবে গরম পানি
কেউ বানাবে তোর মাটির কবর
কেউ পড়বে কুরআনখানি
সাদা মার্কিন পরাইয়া দিবে শেষ নায়র॥

কয়েকজনে তোরে কাঁধে লইয়া
যাইবে গোরস্থানে
কালেমা শাহাদৎ পড়বে
পিছনের লোকজনে
ভাল-মন্দ যা করছিস
সঙ্গি হবে তোর॥

পাগল তার আর কতদিন
গাইবি বাউল গান
দিনে দিনে দিন ফুরাল
সামনে তোর ঘোর নিদান
এখনও তোর সময় আছে
সেই পাড়ের পুঁজি কর॥

৩.
ভজন যোগ্য দেহ পেয়ে
গুরু ভজন কেন করলি না
হয় যদি শতবার জনম
মানব কুলে আর না॥

আইছ একা যাইবা একা
মন তোর সঙ্গে কেউ যাবে না
দিনে দিনে দিন ফুরাল
দিনের কর্ম করলি না॥
স্ত্রী পুত্র, ভাই বেরাদার মনরে
তারা কেউ আপন না
দিন গেল পরের ঝামেলায়
আপনকে চিনলি না॥

এসে সমন কররে বন্ধন মনরে

www.pathagar.com

কখন কেউ জানি না
একা পথে শূন্য হাতে
হবি তুই রওয়ানা॥

যার হয়েছে গুরু ভজন
মাটির দেহ হইল সোনা
নওশের পাগল থাকতে ভবে
তারা তুই চিনলি না॥

ঙ. লোকছড়া

লোকসাহিত্যের একটি বিরাট অংশ যা দখল করে আছে ছড়া। ছড়া মানুষের মুখে উচ্চারিত—উচ্ছল কিছু শব্দের স্বপ্নিল উচ্চারণ। ছড়া দাঁড়াতে বা বসতে জানে না, ছড়া সব সময় চলমান। লোকছড়ার কোন ছড়াকার কে আমরা খুঁজে পাই না। এবং রচনার কাল ও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই এই সাহিত্য কে আমরা কালোত্তীর্ণ সাহিত্য এবং এর লেখক কেউ আমরা কালোত্তীর্ণ সাহিত্যিক বলবো।

উনবিংশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত লোক সাহিত্য পুথিঁ পুস্তকে স্থান করে নিতে পারেনি। এর পর থেকে কিছু সুধিজন সাহিত্যিক লোক সাহিত্য কে আদর করতে শুরু করেন এবং সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। এই মনীষীদের মধ্যে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ড. দীনেশচন্দ্র সেন বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার চেয়ে লোকছড়া মানুষের মনে দোলা দেয় সব চেয়ে বেশি। এটা ছড়ার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্যই। ছড়া—চপলা, চঞ্চচলা উদাস উচ্ছল। এজন্য ছড়ার প্রয়োজন কান আর কবিতার প্রয়োজন মন।

সংগৃহীত লোকছড়া

খেলার ছড়া

১.
নোন্তা বলরে
একে হলো রে
আমার ঘরে কে রে?
আমি।
কি খাস?
নুন খাই
নুনের দাম দে।
থু থু বায়ে ঠ্যাং

www.pathagar.com

তোরা কয় শ' ভাই কয় শ' বোন
একটা দিবি?
ধরা পাইলে নিবি।

২.
লাল মাটি নীল মাটি
পুতুলের বিয়ে
কে গো পুতুল কান্দ কে?
দূরে দিছে বিয়ে।
দূর থেকে আসবো জামাই
ছোট্ট গাড়ি দিয়ে
ছোট্ট গাড়ি ভাঙমু আমি
পায়ের গোছা দিয়ে
বড় গাড়ি কিনমু আমি
লক্ষ টাকা দিয়ে।

৩.
রোকসানার টিনের গাড়ি
জলদি যাবো তাড়াতাড়ি।
ও ভাই তুই বাঙ্গালী
পুটি মাছের কাঙ্গালী
খলসে মাছের লাকই বাকাই
ফুল তুলিব থোকায় থোকায়ই
ফুলের আগাল (সীষে) কলি
দাঁত ভাঙ্গা শুনি (ফোকলা)।

৪.
আইলো টিটি খাইলো ধান
টিটির মুখে আওলা ধান
আওলা ধানের পিঠে
খাইতে বড় মিঠে
এক কলমে লেখা পড়া
দুই কলমের কালি
দাদী তুমি স্বীকের কর
দাদা তোমার স্বামী।

৫.
মিষ্টিরে মিষ্টি, তোর বলে বিয়ে
কেরা কইল? ঐ বাড়ির টিয়ে
মরার টিয়ে মরেনা

www.pathagar.com

হলুদ গাবী হয়না।
হলুদ হলো বাসি
এক'শ টাকার মইচ (মরিচ)
তোর বিয়ে হলে আমাদের এল্লা (একটু) কইস।

৬.
হেনা, হেনা, হেনা
টাটকা দুধের ফেনা
ভাই গ্যাছে কলেজে
ভাবী গ্যাছে কুয়েতে (কূপ)
ভাবীর পেটে নাজমা
ঝুম ঝুমা বাজনা।

৭.
টুনটুনি ভাই পাখি
নাচতে এল্লা (একটু) দেখি
না, আমি নাচুম না।
পড়ে গেলে বাচমু না।
বড় আপুর বিয়ে
কসকো সাবান দিয়ে
কসকো সাবান ভালো না
বড় আপুর বিয়ে হলো না।

সাধারণ ছড়া

১.
হলদি গাছের তলদি ফুল
খালাগর বাড়ি কত দূর—।
খালা আইল গামিয়ে (ঘামিয়ে)
ছাতি ধরলাম টানিয়ে।
ছাতির উপর গামছা
তিন মাসির তামাশা।
ছোট মাসি আন্দে (রান্দে)
বড় মাশি খায়
মেষ মাশি গাল ফুলিয়ে
বাপের বাড়ি যায়।

২.
ইছন-বিছন দাঁড়কি বিছন
মইষ পইল শুয়া হইল

www.pathagar.com

গাবের বীচি চাইল হইল
চাল কুটেনী মাই গো
আমার ছাতি ধরো গো
ছাতির উপর ঘুঘুরা
কালদি তুল মুগুরা
এল হাত চেল হাত
ছেড়ি আংটি তুল হাত।

৩.
কালা গাই এর দুধ
ধলা গাই এর দুধ।
আমি কাঁডল (কাঠাল) পাহে (পাকে)
কায়ে-কুলি ডাহে (ডাকে)।
অর (ওর) বাঁশি বাজেনা
আমার বাঁশি বাজে—
টন্‌টস টন্‌নস করে।

কোচদের লোকছড়া

ঘুম পাড়ানোর গান
হদু হাদা মক্কন মাট্টা
নূয়ে তংতো গান গারাছি
তাইবন নাং মক্কন লায়চা
জুবা বিতেনে তাইবন নাং
হদু হাদা তংয়ু আং
জুলা দিহা নাও সনা
মক্কন কের দক সানা
করত তাবার তাপচি তং
মক্কন দাল দাল চায় তো আং
গেগেন কান দিনান নাং
গেন দেখে বনতায় বাং
নাকুং দাকার মক্কন লায়
মক্কন দাওখে নাং তাচাই
মক্কন লায় দিহা তাই

ঝড়ের সময় ছড়াকাটা
রাং লাম্পার ফায় তো
কারা সং আন্দার তো

www.pathagar.com

কাওরা পিদিক দং হ
গাদলা নামায় খেৎ তো
পিছা দমক মানছা তো
বালা ছালা দংতং তো
কানা শেলনি বিয়া দংতো
ওাং রাসান মিনি তো
জমার ছরং থলক তো
হা পিচ্চালাখে দাৎ তো
গুড় গুড়াইখে রাং কারতো
ওাং নামায় দিসু ফুর তো।

গোসল করানোর ছড়া

কচঃ সনা নাও জং
রংকায় কা কা থলঃ তং
গুমরারখে রংকাইছি
হুরখে নান্দা তিলু তং
তুট্রি তুট্রি জমার সরং
খাই খালাকখে ছন্দাখে
ফৎনি বাবা ফৎচাখে
তিলু তো তাম্পাক খকখে
হই হই হই

ধান ভাঙার ছড়া

মাই সুতো থুল থুল
বাছা তংতো দনি কামফুল
কন্দুক কারছি গিছা বানি
ভন্দা লায়তো আনি বৈনী
মাই সুকে জিরি তো
ফা কেচ্চা চাও মিনি তো
চিংকুত খাজি মেরা নিংনি
মরত নুকবেরে আহাই লানি
বার থাওচা দাপ্লান্নি
ও আনি সানাধন বৈনি

শুটকি মাছ খাওয়ার ছড়া

তুট্রি মাট্রা বেবাক বাবু নাছউ সায়ু
কেংকের বেংকের নাছাউ জাগু
ছাউ ছানি মেংখেরনি চামা খায়ু

www.pathagar.com

কাৎথামুড়ি ছানি গেনান থায়ু
নাছাউ তেকনি মচু বুরনি
গাংআই ছা মানচা ষা পেলেক নি
নাছউ দংগিনি চামা বুতংনি
আহা মেরা তং বেরে
বার থাওচা থুরুমিনি

ভয় দেখানোর ছড়া

দিমাই পিলাও মক্কন মাট্টা
নুখে তংতো লামছি আপা
তা দন্দাৎলা আপা তাপি
কাকনা নানে বংবেরে আপা
তালাই দিহা দকান গাগড়া
ছিক্ লাংলানা ও মরতজা।

অলস ছড়াগান

হারও হারও দন্দাৎ না
চারাও চারাও বাছানা
থারাক থারাও গায়না
জমা জমা চাক্রেং থুকনা
ধেং ক্লক ধেং ক্লক বেড়াই না
দাল দালছে চাই তং না
ফাগ্রং ফাগ্রং মিনি না
কিরসুম কিরসুম দুনুক নাৎ
গির গির চিবখে নিন্দা
বৈয়া বৈয়া খেৎতং না।

www.pathagar.com

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি

বাঙালির গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজব্যবস্থায় বৃত্তিনির্ভর অনেক পেশাজীবী রয়েছেন যাঁরা পৈতৃক সূত্রে সৃষ্টি করছেন এমন কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহারিক শিল্প যাকে আমরা বস্তুগত লোকসংস্কৃতি হিসেবে অভিহিত করে থাকি। যেমন—বাঁশবেতের শিল্পসামগ্রী, মাটির তৈরি শিল্পসামগ্রী, নকশি কাঁথা প্রভৃতি।

লোকশিল্প

একটি ভৌগোলিক পরিবেশে বাস করে একটি মানব গোষ্ঠী তার জীবন ব্যবস্থা, তার ভাষা জীবিকা এবং ঐতিহ্যকে একই সূত্রে গেঁথে যা সৃষ্টি করে সেগুলো হলো লোকশিল্প। ইংরেজিতে যা 'ফোক আর্ট এন্ড ক্রাফ্‌ট'। আদিকাল থেকেই মানুষ লোকশিল্প সৃষ্টি করে আসছে। লোকশিল্প হলো বস্তুকেন্দ্রিক ফোকলোর যার মধ্যে থাকে সৌন্দর্য চেতনা—যাতে সাহিত্য আবেদন প্রতিভাত হয়। বলা যেতে পারে, নকশি কাঁথা, বাঁশের ফুলদানি, নক্সা করা টুপি কিংবা মাটির তৈরি নানা বৈচিত্র্যের সামগ্রী। যা পূর্ব পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষ বংশ পরম্পরায় সমাজের একজন থেকে সমগ্রের কাছে, এক দেশ থেকে অন্য দেশে নানা পদ্ধতিতে প্রবর্তিত ও অনুসৃত হয়। মানুষ এগুলো মুখে মুখে শোনে, দেখে শিখে কিংবা অনুকরণ করে সৃষ্টি করে।

বাঙালির লোকশিল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বলা যায়, লোকজীবনের নিত্য ব্যবহৃত পণ্য হিসাবে নানান কাজে আচার অনুষ্ঠানে, উৎসবে, মেলায় পালা-পার্বণে বাঁশের শিল্পকর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়, বাংলার অন্যান্য লোকশিল্পকর্মের মতো বাঁশের শিল্পকর্মেও থাকে শিল্পীদের নান্দনিক চেতনা, সৃষ্টিশীল সৌন্দর্যবোধ ও শিল্পনৈপুণ্য। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই বাঁশের শিল্পকর্ম তৈরি হয় গ্রামের সাধারণ শিল্পীর হাতে। এর কারণ প্রথমত গ্রীষ্মপ্রধান বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বাঁশের চাষ হয়। দ্বিতীয়ত গ্রামবাংলার প্রতিটি সাধারণ মানুষই বাঁশ দিয়ে কোন না কোন উপাদান ও শিল্পকর্ম তৈরি করতে সক্ষম। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়, লোক ও কারুশিল্পের অন্য শিল্পকর্ম যেমন— মৃৎশিল্প, দারুশিল্প, শোলা শিল্প, শামুক শিল্প, কাঁসা শিল্প, ছাঁচ শিল্প, চামড়া শিল্প, পাটি শিল্প, পাট শিল্প কিংবা নকশি কাঁথা প্রভৃতির কথা। এসব শিল্পকর্মের শিল্পীরা আলাদা সম্প্রদায়, বংশ বা নির্দিষ্ট শ্রেণির মানুষেরা বংশ পরম্পরায় তৈরি করে থাকে, কিন্তু বাঁশ শিল্পকর্মের শিল্পীরা সাধারণ মানুষ হলেও কোন নির্দিষ্ট গোত্র, সম্প্রদায়, বংশ বা শ্রেণির মানুষ নয়। তাই বাঁশের শিল্পকর্মেরশিল্পীরা মুসলমান, হিন্দু, খ্রিষ্টান বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষেরাও আদিকাল থেকে বাঁশের শিল্পকর্ম তৈরি ও ব্যবহার করে আসছেন।

www.pathagar.com

বাঁশজাত শিল্পকর্ম সৃষ্টির ক্ষেত্রে শুরুতেই সাধারণ মানুষ তাদের নিজস্ব মেধা, মনন, বুদ্ধিমত্তা ও সৃজনশীল চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। আর বাঁশের শিল্পকর্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া ও ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রেও পূর্বপুরুষ থেকে উত্তরপুরুষ পরম্পরাই বজায় থেকেছে। দেখা গেছে, বাঁশের শিল্পকর্মের ব্যবহার ও চাহিদা ক্রমান্বয়ে নতুনত্ব ও ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।

বাঁশ দিয়ে তৈরি হয় ঘরের খুঁটি, ঘরের চাল, ঘরের ছাউনি, ঘরের বেড়া, ঘরের দরজা, দরজার খুঁটি, ঘরের চালের টানা, ছাউনি আটকানো শলা, পাখি পোষার খাঁচা, পাখি ধরার ফাঁদ, মাছ ধরার কয়েক রকমের ফাঁদ, মাছ রাখার পাত্র, মাছ কেটে ধোয়ার পাত্র, বাঁশের চাং, হাঁড়ি-পাতিল রাখার মাচা, শৌখিন দ্রবাদি রাখার ফুলচাং, বস্ত্র রাখার আড়, পশু বাধার খুঁটি, পশুর মুখ বেঁধে রাখার খাঁচা, পশুর খাবার রাখার পাত্র, পশুর খাবার দেয়ার বেড়, গরু ও মোষের গাড়ির কাঠামো ও জোয়াল, হাল—চাষের লাঙলের দিস্তামই, জোয়াল, চাটাই, ঘরের বেড়া বাধার খাপ, কুলা, ডালা, চালুন, মুগইর, পলমাপনি, ধান মাপনি, চাল মাপনি সের, লাইট কাটি, ঝাড়, বেড়ি খৈ-মুড়ি ভাজার ঝাপরি, মাথাল, পাওলা, সাজি, ধান রাখার ডোলা, জাল বয়নের নলি, জাল বয়নের চটি, হাতের লাঠি, ঢাল, হুক্কা রাখার স্ট্যান্ড, চকমা, আঁচড়া, চুল আঁচড়ানো চিরুনি বা কাঁকই, তেল মাপনি, দুধ মাপনি, তামাক রাখার চুংগা, টিক্কার চুংগা, দলিল-দস্তাবেজ রাখার চুংগা, ঠুসি বা ফুপা, ঝুড়ি, জালটানা বাঁশ, বাঁশি, একতারার ডাটি, গরু-মোষের গাড়ির চাকার তৈল রাখার চুংগা, দড়ি ও সুতা পাকানো যন্ত্র (টাকুর), বাঁশের দরমা, আসবাবপত্র, খাট, সোফা-সেট, কাগজ ইত্যাদি। এছাড়াও বাঁশ দিয়ে নিত্য নতুন ও অভিনব অনেক ক্ষুদ্র শিল্পকর্ম তৈরি হচ্ছে। আর বাঁশজাত শিল্পের চাহিদাও বেড়ে চলেছে—কারণ বিশ্ব বাজারে, বিশেষ করে উন্নত দেশসমূহে প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ থেকে তৈরি হস্ত কুটির শিল্পের চাহিদা প্রচুর। কারণ পরিবেশের জন্যও বাঁশজাত ক্ষুদ্র শিল্প বেশ উপকারী।

তাই বাঁশজাত শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে যদি পৃষ্ঠপোষকতা ও বিনিয়োগ করা যায়, তাহলে অন্যান্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কিংবা পোশাক শিল্পের মতো বাঁশজাত শিল্পও দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানি করা যায় এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। কারণ বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে রয়েছে সৃজনশীল বাঁশশিল্প।

বাঁশজাত শিল্প প্রধানত তিন রকমের- নির্মাণ শিল্প, কাগজ শিল্প ও ক্ষুদ্র হস্তশিল্প। বাঁশশিল্পীরা এই ধরনের শিল্পে কাজ করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। বাঁশশিল্পীদের কাজে লাগালে বাঁশ দিয়ে আরও চমৎকার নান্দনিক উপাদান তৈরি করা সম্ভব। যেমন—মুলিবাঁশ দিয়ে কাগজ তৈরি হচ্ছে—এই বাঁশ দিয়ে প্লাইবোর্ড, পার্টিকেল বোর্ড, বাঁশের প্যানেল, টিন তৈরি করা সম্ভব। সম্ভব অধিক হারে টেলিফোন ও বিদ্যুতের সাময়িকী খুঁটি, সেতু, গরুর গাড়ি, ঠেলা গাড়ি, নৌকার ছই ও পাটাতন, জোয়াল, মাস্তুল, মঞ্চ, টেলিভিশনের এন্টেনার খুঁটি, নৌকার হাল ও দাঁড়, কলা গাছের ঠেস, মাচা, জাঙলা, সীমানা বেড়ার খুঁটি, পতাকার দণ্ড, দ্রব্য শুকানোর আড়াসহ নির্মাণ শিল্পের নানা উপাদান। পাশাপাশি হস্তশিল্পের অল্প পরিমাণ বাঁশ ব্যবহার করে সব ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির এবং বয়ন শিল্প নির্মাণ করা সম্ভব। বাঁশ থেকে ফুলদানি, কলমদানি, দাঁত খিলনি, খেলনা, চাটাই, ডোলা, ডালা, কুলা ঝুড়ি, খাঁচা, চালনি, টুপি,

www.pathagar.com

কলম, হাতপাখা ইত্যাদি তৈরি করা যায় খুব সহজেই। কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক লোক ও কারুশিল্পের মতো বাঁশশিল্পও দিন দিন বিলুপ্ত বা হারিয়ে যাচ্ছে। বাঁশশিল্প যাতে হারিয়ে না যায়, সেজন্য এখনই সকলের এগিয়ে আসা দরকার। পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার উদ্যোগ নিতে হবে এ শিল্পে। শেরপুর জেলার বাঁশ শিল্পীদের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। প্রাচীনকাল থেকে এখানেও বাঁশের বিভিন্ন ধরনের শিল্পকর্ম তৈরি হয়ে আসছে। বাঁশের শিল্পকর্ম তৈরিতে বিশেষ ধরনের বাঁশের প্রয়োজন হয়। মোটা আঁশ জাতীয় বাঁশ এই শিল্পের জন্য অনুপযোগী। নিচে তিনজন শিল্পীর সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার তুলে ধরা হল।

১. হাত পাখা

হাত পাখা, পাঙ্খা বা বিছুন বাঙালিদের ঘরে অপরিচিত কোন বস্তু নয়। হাত পাখা বিভিন্ন উপাদান বা বস্তু দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। যেমন : তাল পাতা, বাঁশ, রঙিন সুতা, কাপড় ইত্যাদি। এছাড়াও বাজারে এখন নানা রঙের প্লাস্টিকের হাত পাখা পাওয়া যায়। সাধারণত শিল্পী কোন বস্তু যদি বিশেষভাবে তৈরি করেন এবং দর্শকের দর্শন যদি সেই বস্তুতে আকর্ষিত হয়, তবেই সেই বস্তুকে আমরা শিল্পগুণ-সম্পন্ন বস্তু বলে থাকি। এরূপ একটি নন্দিত হাত পাখা শিল্পী, শেরপুর জেলার শ্রীবরদী থানাধীন উত্তর শ্রীবরদী গ্রামের বাসিন্দা লতিফা বেগম। তিনি বিশেষ করে বাঁশের তৈরি হাত পাখার শিল্পী। এযাবৎ বাঁশের তৈরি নানা প্রকার নকশি কেটে হাত পাখা তৈরি করেছেন এবং করছেন। এই শিল্পীর একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার নিচে দেওয়া হলো।

সংগ্রাহক : আপনার বয়স কত?

লতিফা : ৬২ বছর।

সংগ্রাহক : কবে থেকে আপনি এ কাজ করছেন?

লতিফা : প্রায় ১৬-১৭ বছর বয়স থেকে কাজ শুরু করেছি।

সংগ্রাহক : আপনি কি ব্যবসায়িক-ভিত্তিতে এ কাজ করেন?

লতিফা : না, শখ করে করি?

সংগ্রাহক : কার কাছে, কীভাবে এ কাজ শিখেছেন?

লতিফা : প্রথম প্রথম অন্যের দু' একটা কাজ দেখে পরে শখের বশবর্তী হয়ে নিজে নিজেই এ কাজ শিখেছি।

সংগ্রাহক : আপনাকে এ কাজে সাহায্য করে কে?

লতিফা : সংসারের সবাই সাহায্য করে। বিশেষ করে বাঁশ কাটার কাজে। তবে বাঁশের তেমাল (যা দ্বারা পাখা গাথা হয়) আমি নিজেই দাঁতে তুলি।

সংগ্রাহক : আপনার তৈরি হাত পাখা দেখে মনে হয় বাজারে বেশ দাম হবে। আপনি কি কখনো এ চিন্তা করেছেন?

লতিফা : বাজারজাত করার চিন্তা এখনো করিনি, তবে ভবিষ্যতে করতে পারি।

সংগ্রাহক : এ কাজের উপর ভবিষ্যৎ কোন চিন্তা করেছেন কী?

www.pathagar.com

লতিফা : এটা একটা কুটির শিল্প। ভবিষ্যতে ব্যবসায়িকভাবে করার ইচ্ছে রয়েছে। পাশাপাশি বলতে চাই, দেশের বেকার যুব সমাজ যদি এ কাজ শিখে ব্যবসায়িক-ভিত্তিতে কাজ করে তাহলে জাতির অনেক উন্নতি হবে এবং বেকার সমস্যার অনেক সমাধান হবে বলে আমি মনে করি।[১]

বাঁশের তৈরি দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিস পত্র

২. দরমা

দরমা আঞ্চলিক শব্দ। শেরপুর অঞ্চলে দরমা বলতে নান্দনিক বা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা বেড়া। যা মূল ঘরের মাচা বা মাচানকে বুঝায়। সৌন্দর্য বৃদ্ধি বা গোপনীয়তা রক্ষা করেন. মূল ঘরকে যে বেড়া আলাদা করে সেই বেড়াই দরমা। দরমা সাধারণত বাঁশের তৈরি কিন্তু সাধারণ বেড়া থেকে বেশ মূল্যবান। একটি দরমা তৈরিতে ৩৫০০ থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। শেরপুর জেলার শ্রীবরদী থানাধীন দহেরপাড় গ্রামের ফিরোজ মিয়া একজন দরমা নির্মাতা। তার বাড়িতে গিয়ে একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়, এটি নিচে তুলে ধরা হল।

সংগ্রাহক : আপনার বয়স কত?

ফিরোজ : ৪৭ বছর।

সংগ্রাহক : আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কী?

ফিরোজ : ৬ষ্ঠ শ্রেণি পাশ।

সংগ্রাহক : এ কাজে কীভাবে এলেন?

www.pathagar.com

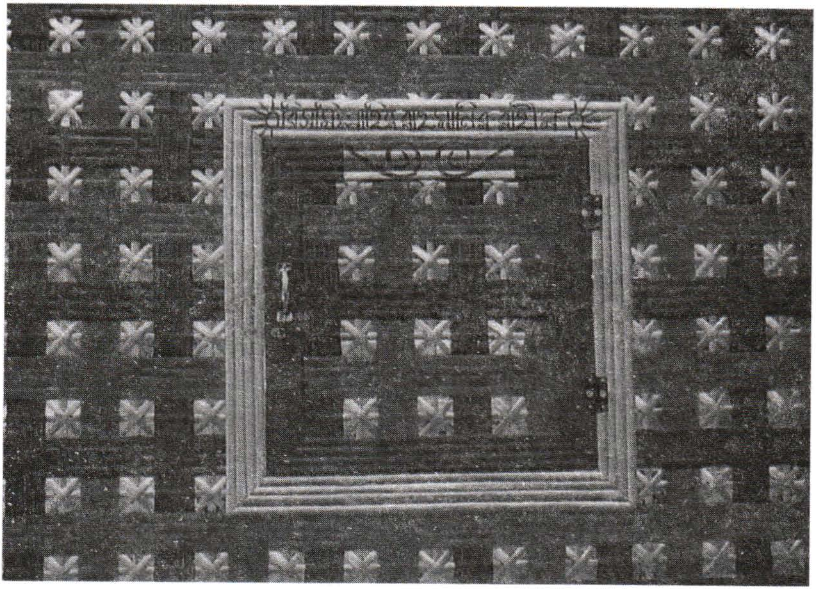

বাঁশের তৈরি দরমা

ফিরোজ : ছোটোবেলা থেকেই আশপাশের অনেককে এ কাজ করতে দেখে মনে মনে চিন্তা করি, কীভাবে বাঁশ দিয়ে এমন সুন্দর কাজ করা যায়? চিন্তা করতেই একদিন দরমা করার কাজে হাত দিলাম। প্রথমে নিজের একটা-দুইটা করি এবং পরে পড়শীদের জন্য কিছু কাজ করে বেশ প্রশংসা পাই। এরপর নিয়মিত কাজ করছি।

সংগ্রাহক : কারো কাছে একাজ শিখেছেন কি না?

ফিরোজ : না, ওই যে বললাম, দেখে দেখে এবং নিজের ইচ্ছা থেকে। আসলে কাজ করতে করতেই শিখছি।

সংগ্রাহক : বর্তমানে ব্যবসায়িক-ভিত্তিতে কাজ করছেন না শখ করে?

ফিরোজ : প্রথমে শখের বসেই করেছি, এখন ব্যবসায়িক-ভিত্তিতে করছি। কারণ দরমার চাহিদা বেড়েছে। বেড়েছে প্রয়োজনে এবং নকশা ও নান্দনিকতার কারণে।

সংগ্রাহক : কী কী কাঁচামাল লাগে?

ফিরোজ : বাঁশ, রং ও তুলি।

সংগ্রাহক : যন্ত্রপাতি কী কী লাগে?

ফিরোজ : দা, করাত, প্লায়াস, হাতুড়ি, বাটাল।

সংগ্রাহক : একটি দরমা তৈরি করতে কতদিন সময় লাগে?

ফিরোজ : একটি দরমা তৈরি করতে ১০-১২ জন কামলা বা যোগালি লাগে। আমি একা কাজ করলেও ১০-১২ দিনই লাগে। যদি ক্রেতা চাহিদার তাড়া থাকে তবে কামলা নিয়োগ করে সময় মতো তৈরি করি।

www.pathagar.com

সংগ্রাহক : এখানে আপনাকে কে সাহায্য করে?

ফিরোজ : আমার বড়ো দুই ছেলে হামিদুর, হাফিজুর। পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে একটু সাহায্য করে?

সংগ্রাহক : আপনার সংসারে সদস্য সংখ্যা কত জন?

ফিরোজ : ৭ জন।

সংগ্রাহক : প্রতিটি দরমা সাধারণ কত টাকা বিক্রি করেন?

ফিরোজ : চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি করি।

সংগ্রাহক : তাতে আপনার সংসার কি ভালই চলে?

ফিরোজ : হ্যাঁ, বেশ ভালই চলে?

সংগ্রাহক : এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্য করুন?

ফিরোজ : আমার মনে হয়, আমি এ কাজ করে সফল হচ্ছি, দেশের বেকার যুবক পুলাপান যদি এসব কাজ শেখে এবং কাজ করে উপার্জন করে তা হলে সরকারের উপর অনেক চাপ কমবে।[২]

৩. নকশি কাঁথা

বাংলাদেশের অন্যতম লোকশিল্পকর্ম হলো 'নকশি কাঁথা'। প্রাচীনকাল থেকে গ্রামীণ নারীদের হাতে তৈরি নকশি কাঁথা এখন ঐতিহ্যের অংশ। নকশি কাঁথাকে বিখ্যাত করেছেন পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীন তাঁর নন্দিত কাব্য গ্রন্থ 'নক্সি কাঁথার মাঠ' এর মাধ্যমে। আদিকাল থেকেই আবহমান বাংলার সাধারণ ঘরের নারী বা বিভিন্ন ধরনের কাঁথা তৈরি করছেন। যেমন—বড়ো আকারের লেপ কাঁথা, শুজনি কাঁথা, ছোটো আকারের রুমাল কাঁথা, আসন কাঁথা, বস্তানি বা গাত্র, আর্শিলতা, দস্তর খান, গিলাফ এবং জায়নামাজ প্রভৃতি।

কাঁথাকে গ্রামাঞ্চলে খ্যাতা বা ক্যান্থা ইত্যাদি নাম রয়েছে। চকি বা খাটে বিছানোর জন্য, গায়ে দেয়ার জন্য, বসে খাওয়া-দাওয়া করার জন্য, খাবার-দাবার রাখার জন্য জিনিস-পত্র রাখার জন্য (যেমন- কুরআন শরীফ, আয়না-চিরুনি, কাজলদান ইত্যাদি) নানা ধরনের, নানা আকৃতির কাঁথা তৈরি করা হয়।

মহিলাদের পুরনো শাড়ি কাপড় পুরুষদের ব্যবহৃত লুঙ্গি, ধুতি ইত্যাদি দিয়ে কাঁথা তৈরি করা হয়। সাধারণ কাঁথাগুলো সাধারণ সুতা দিয়েই সেলাই করা হয়। কিন্তু নকশি কাঁথা তৈরির ক্ষেত্রে শাড়ির পাড়ের রঙিন সুতাগুলো দিয়ে ছোটো ছোটো তরঙ্গের মতো করে নকশা করা হয়। প্রান্তিক পর্যায়ের স্বল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর নারীরা নান্দনিক কারুকাজে তৈরি করেন শৈল্পিক নকশি কাঁথা।

নানা রকম ফুল-পাখি, পশু-প্রাণী কিংবা আরবী অক্ষর তৈরির মাধ্যম আল্লাহ, বিসমিল্লাহসহ ধর্মীয় অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলেন। বিশেষ করে জায়নামাজে। অনেক সময় প্রেমানুভূতিকে চমৎকার করে সুই-সুতায় ধারণ করেন তারা। কখনো রাধা-কৃষ্ণ, হিন্দু দেব-দেবী, হিন্দু পুরানের বিভিন্ন দৃশ্য মটিফে প্রকাশ করেন। বিশেষ করে বিভিন্ন অলংকার, কুলা, হাতি, ঘোড়া, ময়ূর, নৌকা, নৌকা বাইচ, কবুতর, শিকার, তীর ধনুকের মটিফ ফুটিয়ে তুলেন নকশি কাঁথার কারিগর বা শিল্পী নারীরা।

www.pathagar.com

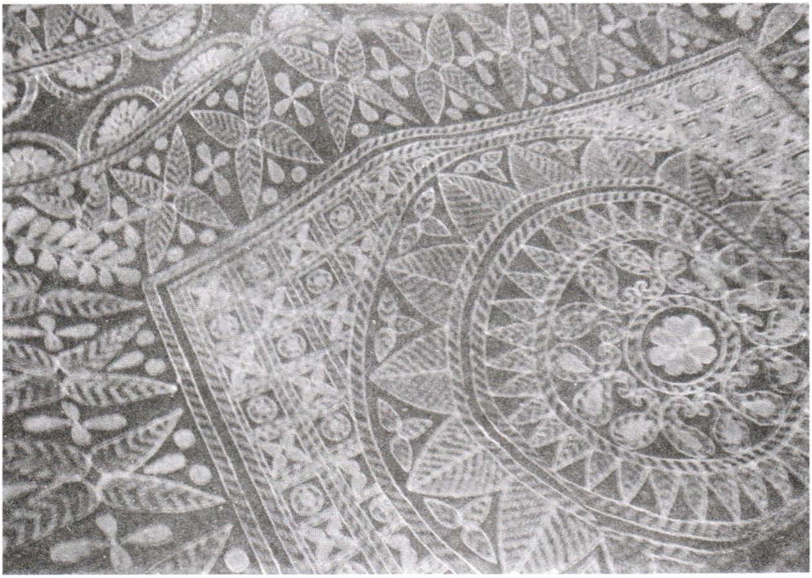

নকশি কাঁথা

রাবেয়া খাতুনের তৈরি নকশি কাঁথা পছন্দ করছেন ক্রেতারা

www.pathagar.com

এসব মটিফ বা কাজে তাদের আবেগ-অনুভূতির প্রতিফলন ঘটে এবং কখনো কখনো সূচিশিল্পীর সুখ-সমৃদ্ধি, জন্ম-বিয়ে, উৎসব, ব্রত, আলপনা বা মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়ে তোলা হয়। কোনো কোনো কাঁথায় প্রেমানুভূতির প্রকাশ থাকে—যেমন : 'সুখে থাকো'। কখনো শিল্পীরা নিজের নাম বা স্বাক্ষর রেখে দেন সুই-সুতার কারুকাজে।

বৃহত্তর বাংলায় আগে শুধুই ব্যবহারিক কাজে কাঁথা তৈরি হাতো। কিন্তু নকশি কাঁথার প্রচলন হয় আধুনিক যুগে। নকশি কাঁথা এখন শুধু ব্যবহারিক কাজেই ব্যবহার হচ্ছে না। ছোটো ছোটো নকশি কাঁথা ঘরের শোভা বর্ধনে দেয়ালেও অলঙ্কার হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। নকশি কাঁথার আকর্ষণ এখন বহু বিদেশির কাছেও। ব্যবসায়িকভাবে বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নকশি কাঁথা তৈরি ও বিপণন করছে। কাঁথা বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই তৈরি হয়, তবে নকশি কাঁথার জন্য বিশেষ কয়েকটি অঞ্চল বিখ্যাত। যেমন—শেরপুর, জামালপুর, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, দিনাজপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, চাপাইনবাবগঞ্জ। কাঁথা শিল্পীরা গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায়ের দরিদ্রজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা প্রচুর সময় ও শ্রম ব্যয় করেও উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করতে পারে না। এছাড়া তথ্য-প্রযুক্তির আধুনিক ছোঁয়ায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আধুনিক উপাদানের কারণে কাঁথা বা নকশি কাঁথার অনেকটা কদর কমে যাচ্ছে। সুতরাং বাংলার লোকশিল্পের এই ঐতিহ্যিক উপাদানকে হারিয়ে যেতে দেয়া ঠিক হবে না। শিল্পীদেরকে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে। শুধু তাই নয় বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যর অংশ হিসেবে নকশি কাঁথাকে তালিকা ভুক্ত করতে হবে। কারণ বাংলার হাজার বছরের লোক-সংস্কৃতি ও লোক শিল্পের এক প্রধানতম নন্দিন শিল্প নকশি কাঁথা। যে শিল্পের খুঁজে পাওয়া যায় বাঙালির আত্ম-পরিচয়।

এবারে শেরপুর জেলার নকশি কাঁথা নিয়ে কয়েকটি কথা। পূর্বেই যেমনটা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের যে ক'টি জেলায় কাঁথা ও নকশি কাঁথা প্রাচীন কাল থেকে তৈরি হয় এবং হচ্ছে, সেই একটি অঞ্চল হলো শেরপুর। নিজেদের প্রয়োজনে এই অঞ্চলের নারীরা কাঁথা সেলাই করে থাকে। এবং এটি বয়স্কদের কাছ থেকে পরম্পরায় চলছে। তবে ইদানীং বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে প্রচুর নকশি কাঁথা তৈরি হচ্ছে। সংগ্রাহক কোহিনূর রুমা এই অঞ্চলের কয়েকজন কাঁথা শিল্পীর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। তবে এখানে একটু উল্লেখ করতে হয় যে, কাঁথা শিল্পীরা অধিকাংশই প্রায় নিরক্ষর, ফলে তারা রুমার প্রশ্নের গভীরে গিয়ে উত্তর দিতে পারেনি। যতটুকুই তাদের কাছ থেকে জানা গেছে, সেটুকুই উপস্থাপন করা হল।

এক সময় বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামের মত নালিতাবাড়ির বিভিন্ন গ্রামের প্রত্যেক পরিবারেই কাঁথার খুব কদর ছিল, বিশেষ করে নকশি কাঁথার। কোন আত্মীয়-স্বজন বা নতুন জামাই বেড়াতে এলে এ কাঁথা বের করে বিছানায় বিছাত শৌখিন পরিবারগুলো। এছাড়া ঘরের মেয়েরা বড়ো হলে, মায়েরা এসব মেয়েদের জন্য নকশি কাঁথা সেলাই করত এবং মেয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবার সময় তাকে দিয়ে দিত সেই নকশি কাঁথা।

সেই সময় গ্রামের সহজ-সরল বউ-ঝিয়েরা সংসারের কাজ-কর্ম শেষ করে পানের বাটা নিয়ে বসে যেত নকশি কাঁথা সেলাই করতে। তাদের লতার মত হাত দিয়ে মনের মাধুরি মিশিয়ে নকশি কাঁথায় আঁকত ফুল, পাখি, ঘর, গাছ, হাতি, ঘোড়া আরও কত কিছু। কাঁথা সেলাই করতে করতে তারা তাদের পরিবারের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার গল্পগুলো একে

www.pathagar.com

অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিত। এভাবে দিনের পর দিন কাজ করে তারা তৈরি করত এক একটি নকশি কাঁথা। এমনকি কখনো কখনো কারো কারো ঘরে অভাব-অনটনের দুর্যোগ নেমে আসত, সেই দুর্যোগ যেন দুলে উঠত তাদের নকশি কাঁথার ঘরও। আর এরকম অভাবের সময়ে গ্রামীণ নারীরা নকশি কাঁথা সেলাই করে তাদের সংসার চালাত। নকশি কাঁথায় অঙ্কিত ফুল, পাখি, ঘর, গাছ যেন হয়ে উঠত তাদের স্বপ্নের সংসারেরই প্রতিচ্ছবি।

এখন নালিতাবাড়ির কয়েকটি গ্রামে একটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে নকশি কাঁথা তৈরি করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করে একটি বেসরকারি সংস্থা দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে তুলেছেন এই সব সেলাইকেন্দ্র। আর এই সেলাইকেন্দ্রগুলোতে নকশি কাঁথা, শাড়ি, পাঞ্জাবি, কামিজ তৈরি করেন আমাদের ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রেখেছেন গ্রাম-বাংলার নারীরা। তবে এক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন থেকে ডিজাইনের দ্বারা নক্শা গুঁজে দেয়া হয়। তারা কেবল সুই-সুতার মাধ্যমে নকশা ফুটিয়ে তুলেন। এখন আর গ্রামের নারীরা নিজেদের মনের সমস্ত মাধুরী দিয়ে নক্শা এঁকে তৈরি করতে পারেন না, তাদের স্বপ্নময় সেই নকশি কাঁথা আর এজন্যে আনন্দ বা তৃপ্তিও কম পান। এছাড়া সংস্থাটির কড়া দিক-নির্দেশনাও থাকে।

বাংলাদেশে এখন রকমারি কম্বল আসায়, নকশি কাঁথার ব্যবহার একেবারেই কমে গেছে। এর প্রভাব নালিতাবাড়িতেও পড়েছে। তবে এখনো নালিতাবাড়ির ধনী-অভিজাত প্রত্যেক পরিবারে বাংলার ঐতিহ্যবাহী নকশি কাঁথা পরিলক্ষিত হয়।

রাবিয়া খাতুন, একজন নকশি কাঁথাশিল্পী। এখন নকশি কাঁথার কাজ করেন রাজানগরে একটি বেসরকারি সংস্থার কেন্দ্রে। সেখানেই তার সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয়।

সংগ্রাহক : আপনার বর্তমান ঠিকানা?

রাবিয়া খাতুন : আমার বর্তমান ঠিকানা—গ্রাম : রাজনগর, ইউনিয়ন : রাজনগর, উপজেলা : নালিতাবাড়ি, জেলা : শেরপুর।

সংগ্রাহক : আপনার বাবার নাম?

রাবিয়া খাতুন : মৃত আইয়ুব আলী।

সংগ্রাহক : আপনার মায়ের নাম?

রাবিয়া খাতুন : মৃত মমেনা খাতুন।

সংগ্রাহক : আপনার বয়স কত?

রাবিয়া খাতুন : পঁয়তাল্লিশ বছর।

সংগ্রাহক : আপনি কোন পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন?

রাবিয়া খাতুন : পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত।

সংগ্রাহক : সূচিকর্মে কীভাবে এলেন?

রাবিয়া খাতুন : সংসারে খুব অভাব আছিল। সংসারের খরচ পাঁচ টাকা স্বামী উপার্জন করেন আড়াই টাকা, সংসারে স্বচ্ছলতা ছিল না। পাশের বাড়ির ভাবী সেলাইকেন্দ্র আসতেন এখানে নকশি কাঁথা, শাড়ি, সেলাই করে তার সংসার স্বচ্ছলতা আসছে। এরপর ভাবীকে দেখে একদিন আমিও সংসারের উপার্জন আরেকটু বাড়ানোর জন্যে সূচিকর্মের কাজে আসি।

সংগ্রাহক : কবে থেকে এখানে কাজ করছেন?

www.pathagar.com

রাবিয়া খাতুন : পনের বছর ধরে কাজ করছি?

সংগ্রাহক : আপনার কাজের অনুপ্রেরণা কে?

রাবিয়া খাতুন : আমার কাজের অনুপ্রেরনা আমার এই ভাবী-ই, যাকে দেখে আমি সূচিকর্মে এসেছি।

সংগ্রাহক : এই কাজ কার কাছ থেকে শিখেছেন?

রাবিয়া খাতুন : এই কাজ আমি ভাবীর কাছ থেকে শিখেছি। এছাড়া পদ্মরানী বৌদিও শিখিয়েছেন। পদ্মরানী বৌদি, আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশনে, রাজনগর ইউনিয়নের সুপার ভাইজার।

সংগ্রাহক : আপনার পরিবারে আরো কেউ সূচিকর্মের কাজ করেন কি না?

রাবিয়া খাতুন : হ্যাঁ, আমার মেয়েও আমার সাথে এখানে কাজ করে?

সংগ্রাহক : আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন?

রাবিয়া খাতুন : আমার দুই ছেলে এক মেয়ে?

সংগ্রাহক : আপনার ছেলেমেয়েরা কে কোন ক্লাসে পড়ে?

রাবিয়া খাতুন : আমার মেয়েটা সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। আর দুই ছেলের একজন দ্বিতীয় আরেকজন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে।

সংগ্রাহক : আপনার পূর্ব পুরুষের আরো কেউ এ কাজ করতেন কিনা?

রাবিয়া খাতুন : আমার যতদূর জানা আছে—আমার পূর্ব পুরুষের আর কেউ সূচিকর্মের কাজ করতেন না।

সংগ্রাহক : গ্রাম-বাংলার সব নারী নিজেদের প্রয়োজনে এই কাজ করে?

রাবিয়া খাতুন : হ্যাঁ সব নারী নিজেদের প্রয়োজনেই এই কাজ করে।

সংগ্রাহক : আপনি এই কাজটি ব্যবসায়িকভাবে করছেন?

রাবিয়া খাতুন : না, আমি ব্যবসায়িকভাবে করি না, ফাউন্ডেশন করে। আমি এখানে দিনমজুরি খাটি মাত্র। পনের বছর ধরে আমি এখানে আছি।

সংগ্রাহক : আপনার কাজের ধরন বা পদ্ধতি কী?

রাবিয়া খাতুন : এখানে ফাউন্ডেশন থেকে নকশি কাঁথা তৈরির জন্যে এক রঙা থান বা গজ কাপড়ে নকশি একে দেয়া হয়। কাঁথার কাপড়ের রঙের সাথে মিলিয়ে বিভিন্ন রঙের সুতা দিয়েও দিয়ে দেয়। নক্শার কোন অংশে কোন রঙের সুতা ব্যবহার করবো—সেই দিক-নির্দেশনাও দেয়া হয়। আমরা সুই-সুতার সাহায্যে ওই নকশা অনুযায়ী সেলাই করে নকশি কাঁথা তৈরি করি।

সংগ্রাহক : একটি নকশিকাঁথা তৈরি করতে কতদিন সময় লাগে?

রাবিয়া খাতুন : আমরা চার-পাঁচজন মিলে একটি নকশিকাঁথা তৈরি করি। একটা নকশিকাঁথা তৈরি করতে সাত থেকে দশ দিন সময় লাগে।

সংগ্রাহক : একটা নকশি কাঁথা সেলাই করে কত মজুরি পান?

রাবিয়া খাতুন : কাজের ধরন অনুযায়ী এক একটি নকশি কাঁথা তৈরি করে আমরা এক হাজার থেকে তিন হাজার টাকা মজুরি পাই। মাস শেষে সেই টাকা যে ক'জন আমরা সেলাই করি তাদের প্রতেককে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হয়। এছাড়াও ঈদ-পূজায় দুই থেকে তিন হাজার টাকা উৎসব বোনাস ও চিকিৎসা সেবা পান।

সংগ্রাহক : এতে সংসার চলে?

www.pathagar.com

রাবিয়া খাতুন : হ্যাঁ চলে। স্বামী উপার্জন করেন আড়াই টাকা, আমি দেড় টাকা- সংসার আগের চেয়ে ভালোই চলে। তবে পরিশ্রম অনুযায়ী মজুরি কম। আরো মজুরি পেলে সংসার আরো ভালো চলতো।

সংগ্রাহক : বর্তমানে নকশি কাঁথার চাহিদা কেমন?

রাবিয়া খাতুন : বর্তমানে নকশি কাঁথার চাহিদা আগের চেয়ে কম। এজন্যে আমরা এখানে শুধু নকশি কাঁথা তৈরি করি না। নকশি কাঁথা পাঞ্জাবি, ফতুয়া- সবকিছু করি। এখন বাজারে নানা রকম কম্বল পাওয়া যায়, তাই নকশি কাঁথার কদর কমে গেছে।

সংগ্রাহক : শেরপুরের কাঁথা বা নকশি কাঁথার বৈশিষ্ট্য কী?

রাবিয়া খাতুন : শেরপুরের কাঁথা সেলাইয়ের ফোঁড়াগুলো ঘন, কাজ নিঁখুত, দেখতে বেশি সুন্দর। আর নকশি কাঁথার কারুকাজও বেশি সুন্দর। এখানের নকশি কাঁথার ঘর ফুল পাখি, নৌকা হাতপাখা, কলা, পুতুল গাছ গাছালি—এইসব আঁকা হয়, এতে আমাদের ইতিহাস - ঐ তিহ্যের পরিচয়ও পাওয়া যায়। দেশের বাইরেও শেরপুর-জামালপুরের নকশি কাঁথার চাহিদা রয়েছে।

সংগ্রাহক : অন্যান্য এলাকার সাথে শেরপুরের কাঁথা বা নকশি কাঁথার পার্থক্য কী?

রাবিয়া খাতুন : পার্থক্য তো এগুলোই। শেরপুরের কাঁথার সেলাই ঘন, দেখতে বেশি সুন্দর আর নকশি কাঁথার কারুকাজও অন্য এলাকার চেয়ে অনেকটা আলাদা, বেশি সুন্দর হয়। সংগ্রাহক : নকশি কাঁথা ও নকশি কাঁথা শিল্পীদের অবস্থা কেমন?

রাবিয়া খাতুন : নকশি কাঁথা শিল্পের বর্তমান অবস্থা বেশি ভালো না। তাই শিল্পীদের অবস্থাও ভালো না। সবাই যদি একটু সচেতন হয় দেশীয় ঐতিহ্যবাহী এই নকশি কাঁথা কিনে, ব্যবহার করে-তবে বর্তমান এই অবস্থার পরিবর্তন হবে।

সংগ্রাহক : আগের নকশি কাঁথার সাথে এখনকার নকশি কাঁথার পার্থক্য কী?

রাবিয়া খাতুন : আগের নকশি কাঁথার চেয়ে এখনকার নকশি কাঁথার কিছু পার্থক্য আছে। আগে এক রঙা পুরাতন শাড়ি বা এক রঙা পুরাতান কাপড়ের বিভিন্ন সাইজের টুকরো একসাথে জোড়া দিয়ে নকশি কাঁথা তৈরি করা হতো। তাতের শাড়ির পাড়ের সুতা বা সাধারণ সুতা ব্যবহার করা হতো। এখন নকশি কাঁথা করার জন্যে থান বা গজ কাপড় ব্যবহার করা হয়। তাতের শাড়ির পাড়ের সুতার ব্যবহার নেই, উন্নতমানের সুতা ব্যবহৃত হয়। এছাড়া আগের চেয়ে নকশি কাঁথার কারকাজে বৈচিত্র্য এসেছে। বর্তমানে নকশি কাথা টেকসই করে বেশি, আর দেখতে বেশি সুন্দর দামও একটু বেশি। সংগ্রাহক : আপনার কি ধারণা নকশি কাঁথা টিকে থাকবে?

রাবিয়া খাতুন : হ্যাঁ থাকবে। এখনো টিকে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে এ শিল্পে সরকার ও কর্তৃপক্ষের সুনজর দরকার; সরকার ও কর্তৃপক্ষের সুনজর দিলে সূচিকর্মের মাধ্যমে আমরা নিজেদের ও দেশের আরো উন্নতি করতে পারবো। বিশেষ করে আমাদের মেয়েদের সূচিকর্মের মাধ্যমে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলতে পারবে।

সংগ্রাহক : নকশি কাঁথা শিল্প নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

রাবিয়া খাতুন : আমার বিশেষ কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই। এখন কাজ করছি সংসারের অভাব অনেক খানি দূর হইছে, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে পারছি- আমি এতেই খুশি। তবে নকশি কাঁথা শিল্পের আরো প্রসার ঘটলে আমি আরো খুশি হবো। সংগ্রাহক : আর যদি স্বপ্নের কথা বলি, তবে?

www.pathagar.com

রাবিয়া খাতুন : স্বপ্ন দেখি, নকশি কাঁথার কাজ করে আমার মতো আরো অনেক মেয়ে স্বাবলম্বী হবে। আমাদের দেশের মানুষ আরো নকশি কাঁথা ব্যবহার করবো। আমাদের মজুরি আরো বাড়বো। নকশি কাঁথা শিল্প বেঁচে থাকবে, শিল্পীরাও আরো ভালোভাবে বাঁচবে। সংগ্রাহক : আপনি কি একজন নকশি কাঁথা শিল্পী হিসেবে জীবনে তৃপ্ত?

রাবিয়া খাতুন : হ্যাঁ, তৃপ্ত। তবে আগে যেরকম নিজ নক্শা একে, তাতের শাড়ির পাড়ের সুতা বা পছন্দের রঙের সুতা দিয়ে নকশি কাঁথা করা হতো এখনও এভাবে করতে পারলে আরো তৃপ্তি পেতাম। কিন্তু এখানে তো এভাবে করার সুযোগ নেই। তবে হাতে দুটো পয়সা আসছে আরো ভালো চলতে পারছি, ছেলেমেয়েদের স্কুলে পড়াতে পারছি-আমি এতেই তৃপ্ত।

সংগ্রাহক : আপনি এই সূচিকর্ম আপনার উত্তরাধিকার কাউকে শিখিয়ে রেখে যেতে চান?

রাবিয়া খাতুন : হ্যাঁ, শিখিয়ে রেখে যেতে চাই। আমি তো আমার মেয়েটিকে শিখিয়েছিও।

সংগ্রাহক : একটি নকশি কাঁথা তৈরিতে কী কী উপাদান/সরঞ্জাম প্রয়োজন হয়?

রাবিয়া খাতুন : নকশি কাঁথা তৈরি করতে এক রঙা গজ বা থান কাপড়, সুই, সুতা এসবই লাগে। আগে নকশি কাঁথা এক রঙা নতুন বা পুরাতন শাড়িতে করা হতো, কাঁথায় তাঁতের শাড়ির পাড়ের সুতা ব্যবহার হতো; কখনো কখনো পুরাতন শাড়ির কয়েক রকম টুকরা ব্যবহার করে নকশি কাঁথা করা হতো, কিন্তু এখন ওইভাবে তৈরি করা হয় না। আর নকশা আগে হাতেই আঁকা হতো, এখন ট্রেসিং পেপার থেকে ছাপ দিয়ে নকশা করা হয়—অবশ্য আমাদের এখানে ফাউন্ডেশন থেকেই নকশা এঁকে দেয়।

সংগ্রাহক : একজন নকশি কাঁথা শিল্পীর জীবন কেমন হওয়া উচিত?

রাবিয়া খাতুন : নকশি কাঁথা শিল্পীর জীবন স্বচ্ছল-সুন্দর হওয়া উচিত। আমাদের বেশি কিছু চাওয়ার নেই; আমরা যেনো খেয়ে-পরে একটু ভালোভাবে চলতে পারি, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে পারি, সংসারে কোনো অভাব-অনটন না থাকে—আমাদের চাওয়া এইটুকুই। এইটুকু প্রত্যাশা পূরণ হলেই আমরা সন্তুষ্ট।

সংগ্রাহক : আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন।

রাবিয়া খাতুন : আপনাকেও ধন্যবাদ। আপনিও ভালো থাকবেন।

তথ্যনির্দেশ

১. লতিফা বেগম, স্বামীর নাম : লুলু আবদুর রহমান, মা'র নাম : রৌশন আরা বেগম, ঠিকানা : কলেজ রোড, শ্রীবরদী, শেরপুর, সাক্ষাৎকারের তারিখ : ১২.০৮.১২, সময় : ১০.০০ ঘটিকা, স্থান : কলেজ রোড, শ্রীবরদী
২. আবদুল ছালাম চৌধুরী (ফিরোজ), বাবা : ফৈ মদ্দিন চৌধুরী, মা : উম্মে কুলসুম, ডাকঘর : দহেরপাড় বাজার, শ্রীবরদী। সাক্ষাৎকারের স্থান : দহেরপাড়, তারিখ : ৩০.০৭.২০১২, সময় : ৪.৪৩ মিনিট
৩. সাক্ষাৎকারের তারিখ : ১৫.০৫.১২, সাক্ষাৎকারের সময় : সকাল : ১১টা সাক্ষাৎকারের স্থান : রাজনগর গ্রাম: রাজনগর, ইউনিয়ন পরিষদ : রাজনগর, উপজেলা : নালিতাবাড়ি, জেলা শেরপুর

www.pathagar.com

লোকস্থাপত্য

কোচ পরিবারে কমপক্ষে তিনটি ঘর থাকে। শোবার ঘর, রান্না ঘর ও কাছারি ঘর। ঘর তৈরি হয় সাধারণত বাঁশ, খড় ও মাটি দিয়ে। কোচদের ঘর বাড়ি থাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রান্না ঘর লেপন না করে নারীরা রান্নার কাজে হাত দেন না। প্রতিটি পরিবারে তুলসী ঘর আছে। সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালিয়ে ধূপধুনা দেয়া হয়। ঘর বাড়িতে আসবাবপত্র থাকে সীমিত।

গারোদের লোকস্থাপত্য

গারোদের বাড়ি ঘর তৈরি মধ্যে আছে বিশেষ রীতি। পাহাড়ি এলাকায় ঘরগুরো তৈরি হত বাঁশ বা কাঠ দিয়ে। ভূমি থেকে সামান্য উঁচুতে মাচাং এর মত। এ ধরনের ঘরকে গারো ভাষায় বলে নক্। নক্ তৈরি হত পাহাড়ি জীবজন্তু ও সাপের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য।

পাহাড়ি গারোদের ঘরগুলো ছিল দু'চালা ও লম্বা ধরনের। সামনে ও পেছনে একটি করে দরজা। জানালা সব বাড়িতে থাকতো না। কক্ষ বড়োজোর দু'টি। ঘরের সামনের দিকে একটু জায়গা। খোলা রাখা হত। বারান্দার মত। এর নাম বাল্লিম। এখানে বসে গল্প গুজব করা হত। অতিথি আপ্যায়ন করা হত। সংসারের জিনিসপত্র রাখার জন্য একটি ছোটো ঘরও তৈরি হত। ঘরের এক কোনে মোরগ মুরগী রাখা হত। মাচাং এর নিচেও কিছু জিনিসপত্র থাকত। ঘরের চাল বানানো হত বাঁশ ও শন দিয়ে। যা দুই তিন বছর পর বদল করা হত। মুলি বাঁশের চাটাই বা নল খাগড়া দিয়ে বেড়া বানানো হত। ঘর বাঁধার কাজে সুতলি বা দড়ির বদলে বাঁশের পাতলা ছ'টি ব্যবহার করা হত। এগুলোকে স্থানীয়ভাবে বল হয় বেত্তি।

গারো পাহাড়ে জুম ক্ষেতের পাশে এক ধরনের ছোটো ঘর তৈরি হত। ক্ষেত পাহাড় দেবার জন্য ছিল এই ঘর। উঁচু গাছের ডালে তৈরি এই ঘরের নাম বোরাং। আজকাল মাচাং এর মত ঘর দেখা যায় না। অবশ্য গারো পাহাড়ে এরকম ঘর আজও আছে। তবে বাংলাদেশের গারোদের ঘর বাড়ি এখন সাধারণ বাঙালিদের মত তৈরি হচ্ছে। এখন পশু পাখির ঘর, থাকার ঘর থেকে একটু দূরে বানানো হয়। বসা ও রান্না বান্নার জন্য আলাদা ঘর তৈরি হয়, তবে তা মূল ঘরের সাথেই। গরিব গারো পরিবার এখনো দু'চালা লম্বা ঘর তৈরি করেন। ধনীরা গ্রামে ও আধুনিক নিয়মে ঘর তৈরি করে থাকেন। টিনের বেড়া, টিনের চাল, পাকা খুঁটি ইত্যাদি দিয়ে। বাড়িগুলোকে সীমানা বেষ্টনী দিয়ে আলাদা করা হয়। বাড়িতেই ফলমূল ও ফুলের চাষ করা হয়।

নকপান্থে হলো অবিবাহিত যুবকদের থাকার ঘর। পরিবারের মূল ঘর থেকে এই ঘর থাকে আলাদা। এর আকার অনেক বড়ো। ও মজবুত গাছের খুঁটির উপর তৈরি।

www.pathagar.com

নক্‌পান্থের দু'টি অংশ। এক অংশে যুবকরা রাত কাটায়। অন্য অংশে চলে সামাজিক কাজ কর্ম। এখানে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। বর্তমানে গারো পাহাড়ে অখ্রিষ্টান গ্রামে কিছু নক্‌পান্থে আছে। অন্যান্য এলাকায় নক্‌পান্থে দেখা যায় না। নক্‌পান্থে ছিল সামাজিক কাজ কর্মের কেন্দ্র। এখানে বয়স্করা যুবকদের নানা রকম গল্প বলতেন। নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। এখানে খেলা ও সংস্কৃতি চর্চা চলত। বাংলাদেশী গারোদের বাড়িতে নক্‌পান্থে প্রায় নেই। তাই তারা এ সম্পর্কে কিছু জানে না এবং এর গুরুত্ব তাদের মাঝে নেই।

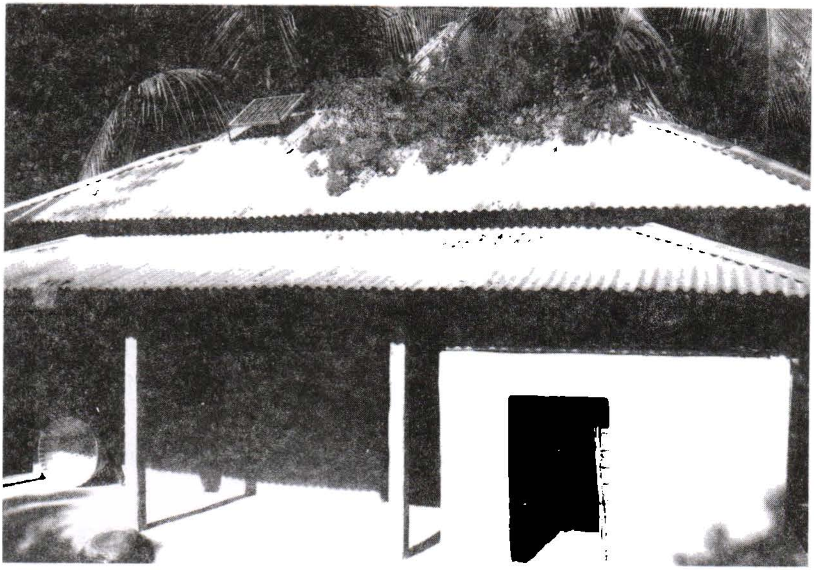

মাটির দেয়াল ও টিনের ছাউনির ঘর

www.pathagar.com

লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

গ্রামীণ জনগোষ্ঠী লোক পরম্পরায় ঐতিহ্যগতভাবে কিছু পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন যা লোক পোশাক-পরিচ্ছদ হিসেবে পরিচিত। এক সময় বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো শেরপুর অঞ্চলেও হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ধুতি ব্যবহার করত। কাল পরিক্রমায় বর্তমানে ধুতি কেবল হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরাই ব্যবহার করে। ধুতি ছাড়া লুঙ্গিও ব্যবহার করে তারা। তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ ধুতির ব্যবহার ছেড়ে লুঙ্গি ব্যবহার করছে। হিন্দু মুসলিম গ্রামীণ মহিলারা সাধারণত শাড়ি পরে থাকেন। ব্যতিক্রম কিছুটা রয়েছে শেরপুর অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পোশাক-পরিচ্ছদে।

কোচদের পোশাক-পরিচ্ছদ

নারী ও পুরুষ উভয়েরই গায়ে জোর আছে। পুরুষদের চেয়ে নারীরা বেশি পরিশ্রমী। তারা বিভিন্ন কাজে শ্রম দেন। মাঠে কাজ করেন। বেশিরভাগ কোচ নারী নিজেদের তৈরি করা কাপড় পরেন। যে যন্ত্র দিয়ে কাপড় তৈরি হয় তাকে বলে বানা বা গান্দি। মেয়েদের প্রধান পোশাক হলো লেফেন। বুকে পরেন বুকচিলি। লেফেন নানা রঙের হয়। কাপড়কে কোচ ভাষায় ছকা বলে। আগে কোচ নারীরা কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত কাপড় পরতেন। উপরিভাগে কোমর পর্যন্ত কাপড় ওড়নার মত ব্যবহার করতেন। এখন তারা ঐ পোশাক বাদ দিয়ে হাজংদের মত পাথিন ব্যবহার করেন। পুরুষরা সাধারণত ধুতি পরেন।

কোচ নারীরা আগে নানা রকম অলংকার পরতেন। সিনলেবক হলো কোমরের বিছা। কাটাবাজু কনুইয়ের উপর পরা হত। গাগলাভাঙা, হাসুলিগতা, চনমনিহার, দুনিলোবা ও হারছড়া গলায় পরা হত। হাসুলিগতা একটু মোটা হয়। দুনিলোবা পয়সার তৈরি। হারছড়া বিয়ের সময় পরা হত। না বেন্‌তা ও করমফুল হলো কানের অলংকার। করমফুল বিয়ের সময় পরা হত। বাকখাড় হলো পায়ের অলংকার। সেংনাপুর হলো পায়ের নূপুর। বিবাহিতা নারীরা সিঁথিতে সিঁদুর দেন। হাতে শাঁখা পরেন। হাতে দস্তার বালা ও চুড়ি পরেন। কানে দুল ও নাকে ফুল পরেন। পুরুষরা মাথায় টিকি রাখেন। গলায় কুণ্ঠি পরেন। ১৯৬২ সালে ব্রাহ্মণ্য লাভের পর থেকে অনেকে পৈতা বা লগুর ব্যবহার করেন। এটি ৬টি সুতা দিয়ে তৈরি করা হয়।

গারোদের পোশাক-পরিচ্ছদ

গারোদের রয়েছে নিজস্ব রীতির পোশাক। বিশেষ করে মেয়েদের পোশাক। তবে বর্তমানে ঐসব পোশাক পরার চল খুব বেশি নেই। নারী পুরুষ সবাই সাধারণ বাঙালিদের মত পোশাক পরে থাকে।

www.pathagar.com

গারো পুরুষদের প্রধান পোশাক ছিল গান্দো। যা ছয় ইঞ্চি চওড়া ও সাত ফুট লম্বা এক টুকরো সুতি কাপড়। এটি কোমরে পেঁচিয়ে পরা হয়। উৎসবে পুরুষরা মাথায় পাগড়ি পরতেন। গাঢ় নীল বা সাদা রঙের পাগড়ি। বর্তমানে তারা শার্ট-প্যান্ট, গেঞ্জি-লুঙ্গি সবকিছুই পরেন। পাঞ্জাবি এবং চাদরও পরেন অনেকে।

মেয়েদের প্রিয় পোশাক হলো দমকান্দা। এটা হলো ৪/৫ হাত লম্বা ও আড়াই হাত চওড়া কাপড়। দেখতে ছোটো শাড়ির মত। পরা হয় শাড়ির মতই কোমরে পেঁচিয়ে। এর জমিনে অনেক সুন্দর চিত্র আঁকা থাকে। কদমান্দার সাথে কালো গেঞ্জি পরার রীতি ছিল আগে।

এখন এসব পোশাক পরার রীতি কমে গেছে। অবশ্য গ্রাম এলাকায় এখনও এসব পোশাক কিছুটা দেখা যায়। তবে শহরের মেয়েরা শাড়ি, ব্লাউজ, পাজামা, কামিজ ইত্যাদি পরে অভ্যস্ত। নিজস্ব অনুষ্ঠান ছাড়া নিজেদের পোশাক পরতে এখন আর দেখা যায় না।

গারো মেয়েরা অলংকার খুব পছন্দ করেন। তারা এক সময় প্রচুর অলংকার পরতেন। গলায় পরতেন 'থাংকাসরা' নামের মালা। এটা ধাতুর মুদ্রা দিয়ে বানানো হত। আরো পরতেন 'রিপ্‌বক'। যা হাতির দাঁতের তৈরি। কোমরে পরতেন বাজুরী বা কোমর বন্ধনী। এখন অবশ্য সেই দিন নেই। আজকাল অতীত কালের অলংকার পরতে গারো মেয়েদের খুব একটা দেখা যায় না। এক সময় গারোরা আরো যে সব অলংকার পরতেন তা হল—জাকমান, নাদির, সেংখি, মালদং, জাকস্টেং, ফিলনি, জাস্রাং, নাথেক, সারচাক জাকসিল, খাদিসিল।

হাজংদের লোকপোশাক

পুরুষরা তাঁত তা তৈরি মোটা কাপড়ের ধুতি পরেন। এটি লম্বায় পাঁচ হাত ও পাশে আড়াই হাত। একে ফটা ধুতি বলে। গায়ে নিমার মত করে কাপড় পরা হয়। একে টোয়া বলে। বানা দিয়ে তৈরি করা লম্বা গলাবন্ধ তারা পরেন। এটাকে 'কম্পেশ' বলে।

নারীরা বুক থেকে পায়ের গোঁড়ালি পর্যন্ত কাপড় পড়েন। এই কাপড়ের নাম পাথিন। দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিন হাত ও পাশে আড়াই হাত। গায়ে চাদরের মত পোশাক ব্যবহার করা হয়। এই চাদরকে বলা হয় আর্গন। এছাড়া নারীরা কোমর পর্যন্ত লম্বা ব্লাউজ পরে থাকেন। কাজের সময় তারা কোমরে কোমরবন্ধ ব্যবহার করেন। বিয়ে ও অন্যান্য উৎসবে ব্যবহার করা কাপড়ের রং আলাদা থাকে। বিয়েতে মেয়েরা গায়ে আর্গন পরেন।

নারীরা কানে ধিরি, দুলুং, মাকড়ি ইত্যাদি পরে থাকেন। বাহুতে পরেন বাজুবন্ধ। হাতে বয়লা চুড়ি, শঙ্খের চুড়ি পরেন। পায়ে পরেন পায়ের পাতা, বাক গুঞ্জরি, খাবু ইত্যাদি। কোমরে বিছা, গলায় সিকিছড়া ইত্যাদি। কিন্তু সবাই আজকাল এ যুগের গহনা সামগ্রী ব্যবহারে অভ্যস্ত। বিবাহিত নারীরা কপালে ও সিঁথিতে সিঁদুর পরেন। আগে হাজং সমাজে উল্কি বা ভঁইফোঁটার প্রচলন ছিল। কিছুদিন আগেও নারীদের ভঁইফোঁটা দিতে দেখা যেত। এটা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত থাকত।

www.pathagar.com

ডালুর লোকপোশাক-পরিচ্ছদ

ডালু নারীরা বুক থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত কাপড় পরেন। এই কাপড়কে বলা হয় পাথানি। এটি লম্বায় তিন থেকে চার হাত। পাশে আড়াই হাত থেকে তিন হাত। আগে নারীরা নিজ হাতে তৈরি করা পাথানি ব্যাবহার করতেন। এখন সুতার অভাবে তা আর নিজ হাতে তৈরি করা হয় না। বাজার থেকে কেনা শাড়ি দিয়ে পাথানি বানিয়ে ব্যবহার করে থাকেন বর্তমানে অনেক ডালু নারী শাড়ি পরেন। সাথে ব্লাউজ, পেটিকোট প্রভৃতি ব্যবহার করেন। পুরুষেরা সুতি কাপড়ের ধুতি ও গামছা ব্যবহার করে থাকেন। গায়ে অনেকে নিমা পরে থাকেন। বর্তমানে ডালু সম্প্রদায়ের অনেক নারী পুরুষ বাঙালিদের মত পোশাক পরে থাকেন।

আগে ডালু নারীরা নানা রকম অলংকার পরতেন। গলায় পরতেন মাদলী মালা, হাঁসুলী ও সিকিছড়া। কানে খিরি ও বাহুতে কাটাবাজু। নাকে নাকঠাসা বা নোলক। পায়ে বেকীখাড়ু ঠেংপাতা ইত্যাদি। এখনকার নারীরা গলায় বড়ো দস্তার মালা পরেন। হিন্দু নারীদের মত হাতে শঙ্খের চুড়ি, কপাল ও সিঁথিতে সিঁদুর দেন। পুরুষরা মাথায় টিকি ও জটা রাখেন। গলায় বড়ো বড়ো কুণ্ঠি ও তুলসী মালা পরেন। দুই বাহুতে এই তুলসী মালা ব্যবহার করে থাকেন।

উৎসব- অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী পোষাক

www.pathagar.com

অলংকার

www.pathagar.com

লোকসংগীত

লোকসংগীত লোকসংস্কৃতির অন্যতম ঐতিহবাহী ও সমৃদ্ধশালী শাখা। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ লোকসংগীতের রচয়িতা এবং লোকসংগীতের শ্রোতা। সমাজ ও জনজীবনে মানুষিক গঠনে লোকসংগীতের ভূমিকা রয়েছে। কেননা মানুষের শ্রম জীবন সংগ্রাম এবং জীবিকার সঙ্গে লোকসংগীতের সম্পর্ক সুনিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য। গ্রামীণ সমাজজীবনের বিশেষ পরিবেশে লোকসমাজ কর্তৃক মুখে মুখে এর সৃষ্টি। লোকসংগীতে রয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত সুর। এর লিখিত রূপ খুব বেশি দিনের নয়। লোকপরম্পরাগতভাবেই তা পরিবেশিত হয়ে আসছে।

১. মেয়েলি গীত

মেয়েলি গীত মেয়েদের তৈরি হলেও অনেক অনুষ্ঠানে বা অনুষ্ঠান ছাড়াও অনেক সময় পুরুষেরা গেয়ে থাকেন। কিন্তু পুরুষদের এখানে প্রতিনিধিত্ব নেই। বিবাহ অনুষ্ঠানাদিতে ধারাক্রমানুসারে যেমন—হল্‌দি তোলা, বাটা এবং বরকনের গায়ে মাখা থেকে সিংরান, বরকনে সাজান, বর বিদায়, বর বরণ, এবং বিয়ে চলাকালে বর বিদায় কনে বরণ, পাশা খেলা এবং বাসি গোসল পর্যন্ত মেয়েরা মনের মাধুরী মিশিয়ে গীতে তাদের মনের আবেগ প্রকাশ করে থাকেন।

আমরা মেয়েলি গীতকে সাধারণত তিন ভাগ করে থাকি। যথা—বিয়ের গীত, আনুষ্ঠানিক গীত এবং মেয়েলি গীত।[১]

১. বিবাহপর্ব—পানচিনি, গায়ে হলুদ, মেহেদি তোলা, পান খিলি, পানি ভরণ, বরণ ডালা, মাড়োয়া সাজান, বর বিদায়।

২. বিবাহকালীন—বর বরণ, কনে সিংরান, শা-নজর, মাড়োয়া সাজান।

৩. বিবাহোত্তর—বধূ বরণ, পাশা খেলা, বাসর জাগা, বাসি গোসল, মেলানি।

মেয়েলি গীতের গবেষক ও সংগ্রাহক সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী মেয়েলি গীতকে এভাবে বলেছেন—"প্রকৃতির নিরালা-নিকুঞ্জ বিহারী ঘুঘুর কাকলী কিংবা বনলতার মর্মর ধ্বনির ন্যায় সমগ্র নারী মনের ব্যথাবেদনা ও আনন্দলহরীর স্বতঃস্ফূর্ত সরল স্বাভাবিক অনুভূতির অভিব্যক্তি"।

মেয়েলি গীত সাধারণত একক বা কয়েকজন মিলে গেয়ে থাকে। মেয়েলি গীত গাওয়ার সময় কোনো প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয় না। কোনো কোনো গীতের দ্যোতনায় কোনো কোনো মেয়ে নাচ পরিবেশন করে থাকেন। নিচে সংগৃহীত কয়েকটি মেয়েলি গীত উপস্থাপন করা হল। গীতগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে এই অঞ্চলের কয়েকজন নারী কাছ থেকে।[২]

www.pathagar.com

সংগৃহীত মেয়েলি গীত

১.

কোন মেন রসিয়ে ডুমে গো ই পাডি (পাটি) বানায় গো
পাডির চুতুর গো মুড়ে দিয়ে ই নকশা কাটছে গো
নকশা দেখিয়ে গো কনের মায় হাসে মুনে মুনে গো
থাক মোর বেডির গো বিয়ে, আমি যামু সঙ্গে।
কোন মেন রসিয়ে ডুমে গো ই কুলে বানায় গো
কুলের চুতুরগো মুড়ে দিয়ে ই ঝানঝুরি কাটছে গো
ঝানঝুরি দেখিয়ে কানের ভাবি হাসে মুনে মুনে গো
থাক মোর নন্দের গো বিয়ে আমি যামু সঙ্গে। ঐ

টীকা : কোন মেন – অনির্দিষ্ট ব্যক্তি। পাডি – পাটি। চুতুর গো মুড়ে – চারিপাশে।

২.

ছাওয়াল দামান গোছল গো করে বকুল গাছের তালে
দেখিতে শোভা।
এক জোড়া বকুলের ফুল দামান পইল দামানের গায়ে গো
দেখিতে শোভা।
আশিব্বাদ দেও মাইগো করি হাওসের বিয়ে
হাওসের বিয়ে করিয়ে মাইগো সুজমু দুধের দাবী
ছাওয়ার দামান গোছল গো করে বকুল গাছের তালে গো
দেখিতে শোভা।
এক জোড়া বকুলের ফুল দামান পইল দামানের গায়ে গো
দেখিতে শোভা।
আশিব্বাদ দেও গো বুবু করি হাওসের বিয়ে
হাওসের বিয়ে করিয়ে বুবু গো সুজমু নাইওরের দাবী
দেখিতে শোভা।

টীকা : ছাওয়াল – ছেলে। দামান – জামাই। মাই – মা। সুজমু – শোধ করা।

৩.

উত্তরে দেওয়া মারল গো চিলিক মধ্যে মধ্যে তাঁরা গো মনিরাজ ওগো
মনিরাজ ওগো সাজ, সাজ ওগো মনিরাজ ওগো
মনিরাজের নাইকে গো দুলা ভাই কেডাই যাব সঙ্গে গো
মনিরাজ ওগো সাজ, সাজ ওগো মনিরাজ ওগো
উত্তরে দেওয়া মারল গো চিলিক মধ্যে মধ্যে তারা গো মনিরাজ ওগো
মনিরাজ ওগো সাজ, সাজ ওগো মনিরাজ ওগো
মনিরাজের নাইকে গো দাদা কেডাই যাব সঙ্গে গো
মনিরাজ ওগো সাজ, সাজ ওগো মনিরাজ ওগো
উত্তরে দেওয়া মারল গো চিলিক মধ্যে মধ্যে তারা গো মনিরাজ ওগো
মনিরাজ ওগো সাজ, সাজ ওগো মনিরাজ ওগো।

www.pathagar.com

মনিরাজের নাইকে গো ভাবী কেডাই যাব সঙ্গে গো।
মনিরাজ ওগো সাজ, সাজ ওগো মনিরাজ ওগো।

৪.

এমুন সুন্দর মাইছ্যে গো রাণী স্বামী কেনতে কালা গো
সুন্দর মাইছ্যের রাণী গো।
না থাকে স্বামীর কালা বাবরী ছাটে ভালা গো
সুন্দর মাছের রাণী গো।
এমুন সুন্দর মাছে গো রাণী স্বামী কেনতে ঘেগা গো
সুন্দর মাইছ্যের রাণী গো।
না থাকে স্বামী ঘেগা মাফলার কিনছে ভালা গো।
সুন্দর মাইছ্যের রাণী গো।
এমুন সুন্দর মাছে গো রাণী স্বামী কেনতে গুঁজে গো
সুন্দর মাইছ্যের রাণী গো।
না থাকে স্বামীর গুঁজে শাট কিনছে ভালা গো।
সুন্দর মাইছ্যের রাণী গো।
এমুন সুন্দর মাছে গো রাণী স্বামী কেনতে নেংড়া গো।
সুন্দর মাইছ্যের রাণী গো।
না থাকে স্বামী নেংড়া জুতা পিনছে ভালা গো।
সুন্দর মাইছ্যের রাণী গো।

৫.

আগা ভালও যাবে কুলি পাছা ভাল যায় যায়
মধ্যে ভাল যায়ে কুলি ঝামপুলি খেলায়।
পাশা হাড়ি খেলাইতে নজর পইল বালির মুখে
আহা বালি কুঠায় যেন পাইছ চাঁন সুরুজের মুখ খানি
আহা সাধু যেই দিনই জন্মেছি কালোনি ময়ের উদ্দরে
সেই দিনই পাইছি চাঁন সুরুজের মুখ খানি।
আহা বালি কুঠায় মেন পাইছ কুন্দে কাটা হাত খানি
আহা সাধু যেই দিনই জন্মেছি কালোনি মায়ের উদ্দরে
সেই দিনই পইছি কোন্দে কাটা হাত খানি।
টীকা : পাশাহাড়ি – এক প্রকার খেলা। কোঠায় – কোথায়।
কুন্দেকাটা – বিশেষ যন্ত্র দিয়ে কাটা।

৬.

তুমি কোন দেশের মাইয়া রসের গোয়ালিনী
আমি শ্রীবরদীর মাইয়া রসের গোয়ালা।
তুমি কী কী খেলা জান রসের গোয়ালিনী
আমি সব খেলাই জানি রসের গোয়ালা
তুমি একবার খেলায় আস রসের গোয়ালিনী

www.pathagar.com

মেয়েলি গীত পরিবেশন কারী শিল্পীবৃন্দ

আমি পাশা খেলা জানি রসের গোয়ালা
আমি মারবল খেলা জানি রসের গোয়ালা
আমি উল্টেবাজি খেলা জানি রসের গোয়ালা
আমি তাশ খেলা জানি রসের গোয়ালা
আমি ডিগবাজি খেলা জানি রসের গোয়ালা

৭.

ডান হাতে পানের গাদি বাও হাতে চমক'বাতি
আয় দুমদুম বাঁশের পাতা আমরা বাইদের মাইয়া ।
বেমাগ বাজি করছি আমি বাগ বাজি করি নাই
আয় দুমদুম বাঁশের পাতা আমরা বাইদের মাইয়া ।
বেমাগ বাজি করছি আমি উল্টে বাজি করি নাই
আয় দুমদুম বাঁশের পাতা আমরা বাইদের মাইয়া
বেমাগ বাজি করছি আমি নেংড়া বাজি করি নাই
আয় দুমদুম বাঁশের পাতা আমরা বাইদের মাইয়া
টীকা : বাও – বাম । বেমাগ – সকল ।

৮.

বালি লো তোর হাতে দেখুম আমি কাঞ্চা মেনদির ফোঁটা
ও ও বালি লো ।
বালি লো কেডাই দিছে তোরে কাঞ্চা মেনদির ফোঁটা

www.pathagar.com

দামান রে ঘরতি আছে আমার হাউসদাইরে ভাবি
তাই দিছে আমায় কাঞ্চা মেনদির ফোঁটা
ও ও দামান রে ।
বালি লো তোর গায়ে দেখুম আমি শুভ হলুদির ছিটে
ও ও বালি লো ।
বালি লো কেডাই দিছে তোরে শুভ হলুদির ছিটে
দামন রে ঘরতি আছে আমার হাউস দাইরে বুবু
তাই দিছে আমায় শুভ হলুদির ছিটে
ও ও দামান রে ।

৯.

পটিতো পাটি গো শীতল মাটির পাটি গো
কারবেন জোরও মন্দির করি আইলে খালি গো
চুরিতো করি নাই গো জারি তো করি নাই গো
আমার ধুতির জুতে বালি আইছে গো । ঐ
পটিতো পাটি গো- শিতল মাটির পাটি গো
কারবেন জোরও মন্দির করি আইলে খালি গো
চুরিতো করি নাই গো জারি তো করি নাই গো
আমার চেহারার জুতে বালি আইছে গো । ঐ
পটিতো পাটি গো- শিতল মাটির পাটি গো
কারবেন জোরও মন্দির করি আইলে খালি গো
চুরিতো করি নাই গো জারি তো করি নাই গো
আমার আলফেটের জুতে বালি আইছে গো । ঐ
টীকা : আলফেট – লম্বা চুল । জুতে – সৌন্দর্যে ।

১০.

সোনারের বাড়ি ডালিমের গাছ
ডালিম নেকর পেকর করে গো ভাওজী
ভাবি সেঁন্দুর কোথায় পালে গো ভাওজী
মিয়ে ভাই গেছে বনিজে বড় ভাই গেছে বনিজে
মিয়ে ভাই আসুক ফিরিয়ে বড় ভাই আসুক ঘুরিয়ে
আমি কমু কথা ঠারে গো
কইও না কইও না গো ননদী
আমি সিন্দুরের বন্ধক দিমুগো ।
সোনারের বাড়ি ডালিমের গাছ
ডালিম নেকর পেকর করে গো ভাওজী
ভাবি বেসর কোথায় পালে গো ভাওজী
মিয়ে ভাই গেছে বনিজে বড় ভাই গেছে বনিজে
মিয়ে ভাই আসুক ফিরিয়ে বড় ভাই আসুক ঘুরিয়ে

www.pathagar.com

আমি কমু কথা ঠারে গো
কইও না কইও না গো ননদী
আমি বেসরের বন্ধক দিমুগো।

১১.

নীলে সুন্দরী আঙনে শোরে সাদু পিছে পিছে ঘুরে
নীলেফা সুন্দরী।
একটা রাওই করগো নীলেফা হাল জোরিবের যামু
নীলেফা সুন্দরী।
কিবেই রাওই করমু গো সাদু তোমার মাও চায়ে আছে
তোমার মায়ই দিবোগো খোটা ভাতার কাঙ্গালির বেটি
নীলেফা সুন্দরী।
নীলে সুন্দরী মরিচগো বাটে সাদু পিছে পিছে ঘুরে
নীলেফা সুন্দরী।
একটা রাওই করগো নীলেফা ধান কাটিবার যামু
নীলেফা সুন্দরী।
কিবেই রাওই করমুগো সাদু তোমার বুবু চায়ে আছে
তোমার বুবু দিব গো খোটা ভাতার কাঙ্গালির বেটি।
নীলেফা সুন্দরী। ঐ
টীকা : আঙনে – আঙ্গিনা। শোরে – পরিষ্কার করে। সাদু – বর।

১২.

কৃষ্ণ নদীর কূলে কূলে নটকর ধরে ঝোকা ঝোকা
কালিয়া নাইমোর কে।
কৃষ্ণ যাব দূরের দেশে আমার পুরাব হিয়া
কালিয়া নাইমোর কে।
তোমার হাতের মহন বাঁশি আমায় করে যাও দানরে
কালিয়া নাইমোর কে।
তোমার কথা মনে হইলে বাঁশি দিমু ফুঁক
কালিয়া নাইমোর কে।
তোমার হাতের আংটি আমায় করে যাও দানরে
কালিয়া নাইমোর কে।
তোমার কথা মনে হইলে আংটি দিমু হাতে
আমার কালিয়া নাইমোর কে।
তোমার হাতের রুমাল আমায় করে যাও দানরে
আমার কালিয়া নাইমোর কে।
তোমার কথা মনে হইলে রুমাল নিমু হাতে
আমার কালিয়া নাইমোর কে।
টীকা : নটকর – নটকন, এক প্রকার ফল।[৩]

www.pathagar.com

১৩

ভরা দুফুর বেলা নেম্বুর তলে রসের খেলা
ছিঁড়িয়ে নেম্বু ফিকিয়ে মারুম বুকে রে
নবু কার ঘরের ছুকুরি । (দুই বার)
গাংগ গেলে ঘষর মষর বাড়িত আইলে খোঁপার যতন
ঢালুয়া খোঁপা আমার সয়না রে... ঐ নবু
গাংগ গেলে ঘষর মষর বাড়িত আইলে শাড়ির যতন
দারুণ শাড়িতো কোমরে সয়না রে... নবু
পায়ে দিলাম পাসুলি গলায় দিলাম হাসুলি
দুই কানে তুলিয়া দিলাম ঝুনুকারে.. নবু
বাড়ির আগে তুশিলদার তাই ডাকে বারে বার
কার হাতে পাডামু পানের বাডা রে ... । নবু
পান দিলাম আড়ে আড়ে গুয়ে দিলাম চোহের ঠারে
চুন দিতে দেখিল দেওর ছেওড়ারে... নবু
টীকা : দুফুর – দুপুর । নেম্বু – লেবু । বাডা – পানের বাটা ।

১৪.

শীষ বান্দন শীষ খানি আগা হলপল করে
শীষের উফরে শীষ থুয়ে নাচে দুলেলী
নাচে দুলেলী জামাই ভুলেলী
আস্তে নাচন ধীরে নাচন কমেলা সুন্দরী ।
এই নাচন নাচিয়ে আইলাম কুলু পাড়া দিয়ে
কুলু ছেড়া নাচিয়ে দিল তেলের ডাবু দিয়ে । ঐ
এই নাচন নাচিয়ে আইলাম ঢুলি পাড়া দিয়ে
ঢুলি ছেড়া নাচয়ে দিল ঢুলের কাডি দিয়ে । ঐ
এই নাচন নাচিয়ে আইলাম জালি পাড়া দিয়ে
জালি ছেড়া নাচিয়ে দিল জালে কাডি দিয়ে । ঐ
টীকা : উফরে – উপরে । ছেড়া – ছোকরা । ডাব – তরল পদার্থ ইত্যাদি তোলা বড় চামচ । কাডি-কাটি ।

১৫.

যায় সোনারে দক্ষিণ সড়ক দিয়ে
সোনারে নাইমর কে । ঐ
ওরে কিনিয়ে দিমু চল্লিশ জোড়া ঘুগরে
সোনারে নাইমর কে । ঐ
ওরে বান্দিয়ে দিমু কনের মায়ের তলে
সোনারে নাইমর কে । ঐ
ওরে হাটিয়ে যাইতে বজবো তালে তালে
সোনরে নাইমর কে । ঐ

www.pathagar.com

১৬.

বগীলে শহরে আছে লো ওলো সই
নারিকেল বাদায় বাদায়
ওরে বাও নাইকে বাতাস-অ নাইকে সই
আপনি মাজ্‌রাই হালে । ঐ
ওরে আবাল কালে বাঁন্দিছি খোঁপা সই
আপনি ঢালিয়েই পড়ে । ঐ
ওরে আবাল কালে পিন্দিছি শাড়ি সই
আপনি হুস্‌কিয়েই পড়ে । ঐ

১৭.

উফুর টানে মরগো ঝাকি (২ বার)
নিচের টানে কান্টফুল রসিয়ে
খেমটা দি নাচমু তালে দেখায়ে দেখায়ে । (২ বার)
কত রঙের আছে গো বেসর (২ বার)
দেও গো নাকে তুলিয়ে তুলিয়ে । ঐ
কত রঙের আছে গো হাসা (২ বার)
দেও গো গলায় তুলিয়ে তুলিয়ে । ঐ
কত রঙের আছে গো শাড়ি (২ বার)
দেও গো শাড়ি পড়ায়ে পড়ায়ে । ঐ
টীকা : উফুর – উপর ।

১৮.

ছাবাল (ছাওয়াল) বুরুরে এতো কালের কামাই তর (তোর)
ঢেমনি মাগীক খিলেছস রে, ছাবাল বুরুরে
বিয়ের কালে না হয় তর (তোর) পালকী আনার টেহারে
ছাবাল বুরুরে । ঐ
বিয়ের কালে না হয় তর (তোর) জেহার কিনার টেহারে
ছাবাল বুরুরে । ঐ
বিয়ের কালে না হয় তর (তোর) কাপড় কিনার টেহারে
ছাবাল বুরুরে । ঐ
বিয়ের কালে না হয় তর (তোর) সিঁন্দুর কিনার টেহারে
ছাবাল বুরুরে । ঐ
বিয়ের কালে না হয় তর (তোর) জুতা কিনার টেহারে
ছাবাল বুরুরে । ঐ
ছাবাল (ছাওয়াল) বুরুরে এতো কালের কামাই তর (তোর)
ঢেমনি মাগীক খিলেছস রে, ছাবাল বুরুরে
বিয়ের কালে না হয় তর (তোর) উর্মেল কিনার টেহারে
ছাবাল বুরুরে । ঐ

www.pathagar.com

১৯.

শেরপুর শহরের জুম্বিরের (বাতাবি লেবু) বিচি
বালুর চরের মাটি
কী কী জেহার আনছস রে নওশা হরপা খুলই দেহি (দেখি)
সবই সবই আনছি লো বালি
তর (তোর) নাহের (নাকের) বেসর ছাড়ছি।
কাল কী ফজরে আনবি রে নওশা
তর ভাবীক বান্দা থুয়ে।
শেরপুর শহরের জুম্বিরের (বাতাবি লেবু) বিচি
বালুর চরের মাটি
কী কী জেহার আনছস রে নওশা হরপা খুলই দেহি (দেখি)
সবই সবই আনছি লো বালি
তর (তোর) গলার (গলার) হাসা ছাড়ছি।
কাল কী ফজরে আনবি রে নওশা
তর মায়েক বান্দা থুয়ে।
শেরপুর শহরের জুম্বিরের (বাতাবি লেবু) বিচি
বালুর চরের মাটি
কী কী জেহার আনছস রে নওশা হরপা খুলই দেহি (দেখি)
সবই সবই আনছি লো বালি
তর (তোর) কানের (কানের) বেসর ছাড়ছি।
কাল কী ফজরে আনবি রে নওশা
তর চাচীক বান্দা থুয়ে।

২০.

থালি মাঞ্জন খুরা মাঞ্জন শানে বান্দা ঘাটেরে
আছাড়ে ভাঙ্গিল তামের কলসি। (২ বার)
শ্বশুরে শুনিলে আমাক করবো বাড়ির বাহির হে
আছারে ভাঙ্গিল তামের কলসি রে
থালি মাঞ্জন খুরা মাঞ্জন শানে বান্দা ঘাটেরে
আছাড়ে ভাঙ্গিল তামের কলসি। (২ বার)
ভাসুরে শুনিলে আমাক করবো বাড়ির বাহির হে
আছারে ভাঙ্গিল তামের কলসি রে
থালি মাঞ্জন খুরা মাঞ্জন শানে বান্দা ঘাটেরে
আছাড়ে ভাঙ্গিল তামের কলসি। (২ বার)
সোয়ামি শুনিলে আমাক মারবো বেতের বারি হে
আছারে ভাঙ্গিল তামের কলসি রে
শ্বশুরেক বুঝেমু আমি হুক্কে তামুক দিয়ে হে
আছরে ভাঙ্গিল তামের কলসি রে

www.pathagar.com

ভাসুরেক বুঝেমু আমি ভাতের থালা দিয়ে হে
আছরে ভাঙ্গিল তামের কলসি রে
সোয়মিক বুঝেমু আমি কোলের যৈগন (যৌবন) দিয়ে হে
আছরে ভাঙ্গিল তামের কলসি রে ।

২১.

বেলা তো উঠে মাগো ডগোমগো হয়ে
আজকে বালির শুভ দিন-অ ফিরছে
বালিতো কাঁন্দে মা গো আমার আম্মার কোলে বসে
আজকে আম্মা যামুনা পরের দেশে
নওশা তো হাসে মাগো মুখে রুমাল দিয়ে
আজকে বালিক ছাড়িয়ে যামুনা দেশে ।
বেলা তো উঠে মাগো ডগোমগো হয়ে
আজকে বালির শুভ দিন-অ ফিরছে
বালিতো কান্দে মা গো ভাবির কোলে বসে
আজকে ভাবি যামুনা পরের দেশে
নওশা তো হাসে মাগো মুখে গামছা দিয়ে
আজকে বালিক ছাড়িয়ে যামুনা দেশে ।
বেলা তো উঠে মাগো ডগোমগো হয়ে
আজকে বালির শুভ দিন-অ ফিরছে ।

২২.

শেরপুর যাইও না গো সাধু শেরপুর যাইও না
সোনার মুখে রোদ তো লাগবে মুনতো মানবো না । ঐ
বাঁধা দিও না গো বালি বাঁধা দিওনা
সঙ্গে আছে মেঘনাল ছাতি রোদ তো লাগবে না । ঐ
রংপুর যাইও না গো সাধু রংপুর যাইও না
সোনার পায়ে ফুসকা পড়ব মুনতো মানবো না
বাঁধা দিও না গো বালি বাঁধা দিওনা
সঙ্গে আছে মখমল জোতা ফুসকা পড়ব না । ঐ
ফুলপুর যাইও না গো সাধু ফুলপুর যাইও না
সোনার অঙ্গ কালা হইবো মুনতো মানবো না ।
বাঁধা দিও না গো বালি বাঁধা দিওনা
সঙ্গে থাকবো আবের ছায়া রোধ তো লাগবো না ।[৪] ঐ

২৩.

ডালার নামটি অঙ্গ গো মালা
ডালার নামটি ফুল-অ গো তোলা
ডালা দেখিয়ে তক্তের কন্যা হাসে গো ।
কে গো মাই কান্দ গো তুমি

কে গো বুবু কান্দ গো তুমি
আমি যাবার চাই বাবরি আলার সঙ্গে গো। (২ বার)।
ডালার নামটি অঙ্গ গো মালা
ডালার নামটি ফুল-অ গো তোলা
ডালা দেখিয়ে তক্‌তের কন্যা হাসে গো।
কে গো ফুবু কান্দ গো তুমি
কে গো চাচি কান্দ গো তুমি
আমি যাবার চাই ধুতি আলার সঙ্গে গো। (২ বার)।
ডালার নামটি অঙ্গ গো মালা
ডালার নামটি ফুল-অ গো তোলা
ডালা দেখিয়ে তক্‌তের কন্যা হাসে গো।
কে গো নানি কান্দ গো তুমি
কে গো দাদি কান্দ গো তুমি
আমি যাবার চাই বাঁশি আলার্‌ সঙ্গে গো। (২ বার)।

২৪.

নীল কালা বাতাসে উড়ে গো (২ বার)
কুণ্ডাই কনের বনাই গো-কনে কান্দে গো।
যিডেই দেহা যায় চামারের মত গো
অডেই কনের বনাই গো কনে কান্দে গো।
নীল কালা বাতাসে উড়ে গো (২ বার)
কুণ্ডাই গবরুর বনাই গো-গাবরু হাসে গো।
যিডেই দেহা যায় চেয়ারম্যানের মত গো
অডেই গবরুর বনাই গো গাবরু হাসে গো।
নীল কালা বাতাসে উড়ে গো (২ বার)
কুণ্ডাই কনের ভাইও গো কনে কান্দে গো।
যিডেই দেহা যায় চাড়ালের মত গো
অডেই কনের ভাইও গো কনে কান্দে গো।
নীল কালা বাতাসে উড়ে গো (২ বার)
কুণ্ডাই গাবরুর ভাইও গো-গাবরু হাসে গো।
যিডেই দেহা যায় মেম্বারের মত গো
অডেই গাবরুর ভাইও গো গাবরু হাসে গো। ঐ

২৫.

হুম হুম দুম দুম করিয়ে দামান নৌকানি সাজাইছে
ঐ নদীর কূলে। (২ বার)
বাচ্চা জামাতার হাউস গেছে বাইছেলি খেলাইতে
ঐ নদীর কূলে।
হুম হুম দুম দুম করিয়ে দামান নৌকানি সাজাইছে

www.pathagar.com

ঐ নদীর কূলে। (২ বার)
নয়া জামাতার হাউস গেছে সাইকেল-অ চালাইতে
ঐ নদীর কূলে।
হুম হুম দুম দুম করিয়ে দামান নৌকানি সাজাইছে
ঐ নদীর কূলে। (২ বার)
বাচ্চা জামাতার হাউস গেছে ঝামফুলি খেলাইতে
ঐ নদীর কূলে। ঐ

২৬.

বারো টাকার শ্যামলাই গো তেরো টাকার শ্যামলাই গো
চুকি জোকে শ্যামলাই নিন্দে গেছে গো। (২ বার)
ওঠো ওঠো শ্যামলাই গো পরের দেশের সিঁন্দুর পরিধান কর গো
শুনেন শুনেন আব্বা, আব্বা গো। (২ বার)
কাঞ্চা ঘুমে সাধু আমায় ডাকিল কে
এখন আমার মুনে কয় যে
সিঁন্দুরের কৌটা ফিকুম সাধুর মুখেতে। ঐ
ওঠো ওঠো শ্যামলাই গো পরের দেশের বেসর পরিধান কর গো
শুনেন শুনেন চাচা, চাচা গো। (২ বার)
কাঞ্চা ঘুমে সাধু আমায় ডাকিল কে
এখন আমার মুনে কয় যে
বেসরের কৌটা ফিকুম সাধুর মুখেতে। ঐ

২৭.

হরপা খানি নড়ে গো চড়ে হরপা কেনতে খলি গো
ডাকাত নৌশা নামর কে। (২ বার)
সি-ও হরপা খুলিয়া দেখুম শুধু এক খান এস- অ গো
ডাকাত নৌশা নামর কে।
সি-ও হরপা ফিকিয়ে মারুম গাবরুর বনায়ের মুখে গো
ডাকাত নৌশা নামর কে।
হরপা খানি নড়ে গো চড়ে হরপা কেনতে খলি গো
ডাকাত নৌশা নামর কে।
সি-ও হরপা খুলিয়ে দেখুম শুধু এক খান বেসর গো
ডাকাত নৌশা নামর কে।
সি-ও হরপা ফিকিয়ে মারুম গাবরুর বাবার মুখে গো
ডাকাত নৌশা নামর কে।

২৮.

হাত্তি দিলাম আড়ে গো আড়ে
মাওত দিলাম সঙ্গে গো-আদে (রাধে) মধুচুরার দেশে।
তবু আদে জিদ্দি করে আদের দাদিক নিবো সঙ্গে

গো-আদে মধুচুরার দেশে।
পরের দেশের মানষ্যে গো কব-অ আদে বান্দি আনছে সঙ্গে
গো-আদে মধুচুরার দেশে।
ব্যন্দি নয় গো দাসি নয় গো- আমার দাদিক আনছি সঙ্গে
গো-আদে মধুচুরার দেশে।
দাদিক আনছে ভালই গো হইছে রান্দন রান্দি খাবো
গো-আদে মধুচুরার দেশে।
হাত্তি দিলাম আড়ে গো আড়ে
মাওত দিলাম সঙ্গে গো-আদে মধুচুরার দেশে।
তবু আদে জিদ্দি করে আদের নানিক নিবো সঙ্গে
গো-আদে মধুচুরার দেশে।
পরের দেশের মানষ্যে গো কব-অ আদে বান্দি আনছে সঙ্গে
গো-আদে মধুচুরার দেশে।
বান্দি নয় গো দাসি নয় গো- আমার নানিক আনছি সঙ্গে
গো-আদে মধুচুরার দেশে।
নানিক আনছে ভালই গো হইছে কাপড় কাইছি খাবো
গো-আদে মধুচুরার দেশে।
হাত্তি দিলাম আড়ে গো আড়ে
মাওত দিলাম সঙ্গে গো-আদে মধুচুরার দেশে।
তবু আদে জিদ্দি করে আদের ভাবিক নিবো সঙ্গে
গো-আদে মধুচুরার দেশে।
পরের দেশের মানষ্যে গো কব-অ আদে বান্দি আনছে সঙ্গে
গো-আদে মধুচুরার দেশে।
বান্দি নয় গো দাসি নয় গো- আমার ভাবিক আনছি সঙ্গে
গো-আদে মধুচুরার দেশে।
ভাবিক আনছে ভালই গো হইছে বারা বাইনি খাবো
গো-আদে মধুচুরার দেশে। ঐ

২৯.

কৃষ্ণ নদীর বাতায় বাতায়—ময়ূর-পঙ্খী ঘুরে
কী অলো অবলা নারী কৃষ্ণ নাই তোর ঘরে।
কদম ডালে থাইক্যে কৃষ্ণ বাজায় মহন বাঁশি
কী অলো অবলা নারী কৃষ্ণ নাই তোর ঘরে।
বকুল গাছে ডালে গো থাইক্যে কৃষ্ণ বাজায় মহনবাঁশি
কী অলো অবলা নারী কৃষ্ণ নাই তোর ঘরে।
বকুল গাছে থাইক্যে কৃষ্ণ যাচে সিঁথির সিঁন্দুর
কী অলো অবলা নারী কৃষ্ণ নাই তোর ঘরে।
কী করি তোর সিঁথির সিঁন্দুর কাঞ্চা চুলের আড়ি

www.pathagar.com

কী অলো অবলা নারী কৃষ্ণ নাই তোর ঘরে।
কৃষ্ণ নদীর বাতায় বাতায়—ময়ূর-পঙ্খী ঘুরে
কী অলো অবলা নারী কৃষ্ণ নাই তোর ঘরে।
কদম ডালে থাইক্যে কৃষ্ণ বাজায় মহন বাঁশি
কী অলো অবলা নারী কৃষ্ণ নাই তোর ঘরে।
বকুল গাছে ডালে গো থাইক্যে কৃষ্ণ বাজায় মহনবাঁশি
কী অলো অবলা নারী কৃষ্ণ নাই তোর ঘরে।
বকুল গাছে থাইক্যে কৃষ্ণ যাচে নাকের বেসর
কী অলো অবলা নারী কৃষ্ণ নাই তোর ঘরে।
বকুল গাছে ডালে গো থাইক্যে কৃষ্ণ বাজায় মহনবাঁশি
কী করি তোর নাকের বেসর কাঞ্চা চুলের আড়ি
কী অলো অবলা নারী কৃষ্ণ নাই তোর ঘরে। ঐ

৩০.

বালি তোমার সিঁথির উপর কী। (২ বার)
আমার মিনি সাপে দুলে-রে সদাগর
সদাগর তুমি ডরাওনা (২ বার)
আমার সিঁথি ঝিলিক মারে-রে সদাগর
বালি তোমার গলায় ওটা কী। (২ বার)
আমার ধোরা সাপে দুলে-রে সদাগর
সদাগর তুমি ডরাওনা। (২ বার)
আমার হাসা ঝিলিক মারে-রে সদাগর
বালি তোমার কোমরে ওটা কী। (২ বার)
আমার প্যাচানি সাপে দুলে-রে সদাগর।
সদাগর তুমি ডরাওনা। (২ বার)
আমার বিছে ঝিলিক মারে-রে সদাগর। ঐ

৩১.

উজেন পুরের আনিছে সিঁন্দুর মণ্ডল (২ বার)
আমারে সিঁথিত দেও গো সিঁন্দুর মণ্ডল
সিঁথি নাড়িচাড়ি কমু কথা মণ্ডল (২ বার)
দাগায়ে দাগায়ে রেখো গো মণ্ডল
চেয়ারে বসে শুন গো মণ্ডল (২ বার)
উজেন পুরের আনিছে বেসর মণ্ডল (২ বার)
আমারে হাতত দেও গো বেসর মণ্ডল
হাত-অ নাড়িচাড়ি কমু কথা মণ্ডল (২ বার)
দাগায়ে দাগায়ে রেখো গো মণ্ডল
টুলেতে বসে শুন গো মণ্ডল (২ বার)
উজেন পুরের আনিছে হাসা মণ্ডল (২ বার)

www.pathagar.com

আমারে গলার দেও গো হাসা মণ্ডল
গলা নাড়িচাড়ি কমু কথা মণ্ডল (২ বার)
দাগায়ে দাগায়ে রেখো গো মণ্ডল
বেঞ্চে বসে শুন গো মণ্ডল (২ বার)। ঐ

৩২.

আকাশে কবুতর আকাশে উড়ে
পাতালে পড়িয়েই ডাকে গো কবুতর
পিরিতির কিবা গুণ জানে (২ বার)।
কোন বা রসিয়ে মারিছে বাটুল
আমার ঢালুয়া খোঁপার পরে লো বন্ধুজন
পিরিতির কিবা গুণ জানে।
আকাশে কবুতর আকাশে উড়ে
পাতালে পড়িয়েই ডাকে গো কবুতর
পিরিতির কিবা গুণ জানে (২ বার)।
কোন বা রসিয়ে মারিছে বাটুল
আমার সরুয়ে মাঞ্জার পরে লো বন্ধুজন
পিরিতির কিবা গুণ জানে। ঐ

৩৩.

বোন কলার আড়াত গো চন্দন বিরিক্ষের ডালো গো
নেলা-ভেলা বাতাসে পারমন হালিয়ে ঢুলিয়ে পড়ে
নীলের বাবা ডাকে গো নীলে সতি বেটি গো
কে তোরে পরাইছে বালির সিঁথি ভরা সিঁন্দর।
যারাই না খাইছে গো গামছা বান্দা গুয়ে গো
অরাইনা পরাইছে বালির সিঁথি ভরা সিঁন্দুর। ঐ
বোন কলার আড়াত গো চন্দন বিরিক্ষের ডালো গো
নেলা-ভেলা বাতাসে পারমন হালিয়ে ঢুলিয়ে পড়ে
নীলের চাচা ডাকে গো নীলে সতি বেটি গো
কে তোরে পরাইছে বালির সিঁথি ভরা সিঁন্দর।
যারাই না খাইছে গো ছাচি পানের বিরে গো
অরাইনা পরাইছে বালির সিঁথি ভরা সিঁন্দুর। ঐ

৩৪.

আমু গুছির তলে জামু গুছির গাছ
সে না গাছের তলে সানাই বান্দার ঘাট
সাধু- সেইনা ঘাটে ঝাম্ফুল খেলইতে
নাকের বেসর জলে হারাইছে
সাধু, ওঠো সাধু নাগাও বাতি
বেসর খুঁজিমু সারা রাতি।

www.pathagar.com

আমু গুছির তলে জামু গুছির গাছ
সে না গাছের তলে সানাই বান্দার ঘাট
সাধু—সেইনা ঘাটে ঝাম্ফুল খেলইতে
গলার হাসা জলে হারাইছে
সাধ—ওঠো সাধু নাগাও বাতি
হাসা খুঁজিমু সারা রাতি ।
আমু গুছির তলে জামু গুছির গাছ
সে না গাছের তলে সানাই বান্দার ঘাট
সাধু- সেইনা ঘাটে ঝাম্ফুল খেলইতে
পায়ের নূপুর জলে হারাইছে
সাধু, ওঠো সাধু নাগাও বাতি
নূপুর খুঁজিমু সারা রাতি ।[৫]

৩৫.

উত্তরে দেওয়া আমার ই সাজন সাজিল
আমার হরিসন রাজা কোনডাই মেন বুজিল ।
কালা যখন বাঁশি বাজায় ঐ কদম গাছের তলে
আমি তখন আন্দন আন্দি নাট মান্দির ঘরে ।
উত্তরে দেওয়া আমার ই সাজন সাজিল
আমার হরিসন রাজা কোনডাই মেন বুজিল ।
কালা যখন বাঁশি বাজায় ঐ কদম গাছের তলে
তখন আমি পান বানাই চেয়ারে বসিয়ে । ঐ
আগে যদি জানতামরে কালা তুই যাবি ছড়িয়া
তোর হাতেরি মোহন বাঁশি রাখতাম রে কাড়িয়া । ঐ

৩৬.

উত্তরের দেওয়া ডগর মগর ছওয়াল দামানও
এই বেলা কতক দূরে যাবা?
গুনারও আছে মইজুদ্দি মন্ডলের পায়রা রে
তাই রাখি দিব পানও বিবিকে কাইড়ি ।
কনের মাইরে বান্দা থুয়ে
পানও বিবিরে উদ্দার করিয়ে আন ।
উত্তরের দেওয়া ডগর মগর ছওয়াল দামানও
এই বেলা কতক দূরে যাবা?
গুনারও আছে মইজুদ্দি মন্ডলের পায়রা রে
তাই রাখি দিব পানও বিবিকে কাইড়ি ।
কনের বুবুরে বান্দা থুয়ে
পানও বিবিরে উদ্দার করিয়ে আন ।
উত্তরের দেওয়া ডগর মগর ছওয়াল দামানও

www.pathagar.com

এই বেলা কতক দূরে যাবা?
গুনারও আছে মইজুদ্দি মন্ডলের পায়রা রে
তাই রাখি দিব পানও বিবিকে কাইড়ি।
কনের ভাবিরে বান্দা থুয়ে
পানও বিবিরে উদ্দার করিয়ে আন। ঐ

৩৭.
ঘোড়া দুল দুল বাতসে ভাঙ্গিল
ঘোড়া ছয়ভাই নিয়রে ভিজিল
যেইনে দেশও গো ভাতের ময়াল নাই
সেইনে দেশেও আমার তোতা যাবার চায় গো
বাপের দেশ আমার ধুলায় অন্ধকার হইল
পরের দেশ আমার সুরুজ উসনাই হইল।
গরু পালিলে গইলের শোভা
বেটি পালিলে সুদেই মন্দির খালি
মুরগী পালিলে খুহ্রার শোভা
বেটি পালিলে সুদেই মন্দির খালি
বাগি পালিলে এক ভাগ পাওয়া যায়
বেটি পালিলে সুদেই মন্দির খালি
বাপের দেশ আমার ধুলায় অন্ধকার হইল
পরের দেশ আমার সুরুজ উসনাই হইল। ঐ

৩৮.
পুবেলে পছেলে বাবা শুয়ে নিন্দে গেছ গো বাবা
ভিন্ন দেশের নওশা আইসে বাবা বাড্ডেগেতে খারা গো বাবা
খুশি মত বিদায় দেও গো বাবা যাইগো পরের দেশে
কিবেই বিদেয় দিমু বেটি গো শুনতেই কলজে ফাঁটে
পুবেলে পছেলে ভাই শুয়ে নিন্দে গেছ গো ভাই
ভিন্ন দেশের নওশা আইসে ভাই গো বাড্ডেগেতে খারা গো ভাই গো
খুশি মত বিদায় দেও গো ভাই যাইগো পরের দেশে
কিবেই বিদেয় দিমু বোন গো শুনতেই কলজে ফাটে।[৬]

৩৯.
সোনার ছুটা রূপার কোটা সাধু জলাপই পাড়িতে যাইও গো
ছুটা ছিড়িল কোটা ভাঙ্গি জলাপই রইল মোর ডালে গো। (২ বার)
এতো রড় জুব্বে বেটি কেমনে রাখিছে ঘরে গো
বাপ-অ পাগলা মাও- চালাক সাধু তারাই বুঝেয়ে রাখিছে ঘরে গো
সোনার ছুটা রূপার কোটা সাধু জলাপই পাড়িতে যাইও গো
ছুটা ছিড়িল কোটা ভাঙ্গি জলাপই রইল মোর ডালে গো। (২ বার)
এতো রড় জুব্বে বেটি কেমনে রাখিছে ঘরে গো

www.pathagar.com

ভাই-অ পাগলা ভাবি-অ চালাক সাধু তারাই বুঝেয়ে রাখিছে ঘরে গো । ঐ

৪০.

পূবে ওঠে পূবেলি ভানু স্বর্গে ওঠে তারা লো বালি
তর (তোর) বাপেরা মানিয়ে থুইছে জুম্মে ঘরের খাসি লো বালি
কি মুতে বুরিয়ে নিমু ছাগল চরানির বেটি লো বালি । ঐ
পূবে ওঠে পূবেলি ভানু স্বর্গে ওঠে তারা লো বালি
তর (তোর) বাপেরা মানিয়ে থুইছে জুম্মে ঘরের খাসি লো বালি
কি মুতে বুরিয়ে নিমু গরু চরানির বেটি লো বালি । ঐ

২. উদাসেনি গান

শেরপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা ফসল নিড়ানির সময় দলগতভাবে এই উদাসি গান গেয়ে থাকে। এই গানের বিষয় প্রেম-বিরহ। গ্রামীণ জনপদ বা সমাজের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্না ইত্যাদি মূর্ত হয়ে উঠে এই গানে। মূলত সারিগানের সমগোত্রীয় হলো এই উদাসি গান। এই গানের তাল ও লয় কাজের ছন্দে ছন্দে প্রস্ফুটিত হয়। সাধারণত এই গানগুলো কর্মসংগীত হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

সংগৃহীত উদাসেনি গান

১.

আমার উড়িল বেদায়ের পায়রা রে। (২ বার)।
পায়রারে বাকুম বাকুম ডাকেরে... আমার উড়িল...
এতোদিন পালিলাম পায়রা পায়রারে- ঠোঁটের আদার দিয়া
যাবার কালে গেলি পায়রারে প্রাণ পায়রা বুকে কেন মারিয়ারে... ঐ
আগে যদি জানিতাম পায়রারে পায়রারে তুই যাবি ছাড়িয়া
দুই চরণ বান্দিয়া রাখতাম রে প্রাণ পায়রা মাথার কেশ দিয়ারে... ঐ
যাইবা যদি নিষ্ঠুর পায়রারে পায়রারে রাখিতাম
বান্দি হাতে দিতাম হাত কড়ারে
প্রাণ পায়রা পায়ে দিতাম বেড়িরে... ঐ
উড়িতে উড়িতে পায়রারে... পায়রা পড়লো বৃক্ষের ডালে
সেও ডাল...ভাঙ্গিয়া পড়লো রে-প্রাণ পায়রা আপন কর্ম দোষেরে...
আমার উড়িল বেদেষের পায়রারে আমার উড়িল... ঐ।

২.

আমার হীরামন মানিক রাজা হে (২ বার)
হীরামন মানিক রাজারে নতুন বাজার বসায়...
ওরে—সেই বাজারে সকল লোকে
কেনা-বেচ্চা করে রে কী হীরামন মানিক রাজা হে... (২ বার)
এক পান খাইয়া মাইছান গো আরেক পান লয় হাতে

ওরে জয় ধ্বনী দিয়া মাইছান খাড়ি নিলো মাথেরে-
কি হীরামন মানিক রাজাহে (২ বার)
মাছের খাড়ি মাথে লইয়ারে চলছে ধীরে ধীরে- ওরে নতুন
বাজারে যাইয়া উপস্তি হলরে—কি হীরামন—মানিক রাজা হে।
খবরদারে পাইয়া খবর বেলদারেকে কয় ওরে সুন্দুর
মাইছেন যাইল নতুন বাজারেয় কী হীরামন মানিক রাজা হে।
নতুন রাজ পাইয়া খবর কে কয় ও ওরে সাজাও ঘোড়া তাড়াতাড়ি
লগে হুরী পরীরে কী হীরামন মানিক রাজা হে।
খবরদারে শুইন্যা কথা ঘোড়া সালায় যাইয়া ওরে
হরী বলা ঘোড়ার পৃষ্ঠে জিন গাজী করিলরে- কী হীরামন মানিক রাজা হে।
একপ্রাণ খাইয়া রাজা গো আরেক পানরে হাতে ও লম্ফ দিয়া
ঘোড়ার পৃষ্ঠে সোয়ার হইলরে...কি হীরামন মানিক রাজারে।
ঘোড়ার পৃষ্ঠে সোয়ার হইয়া আর কতেক দূর যাইও ওরে
নতুন বাজারে যাইয়া উপনিত হইলারে কী হীরামন... ঐ
তুমি তো সুন্দর মাইছেনী গো—তোমার স্বামী কেনরে কালো
ওরে আমার সনে চলো মাইছেনী তোমার হবে ভালোরে... কী হীরামন ... ঐ
আমার স্বামী আছে কালা গো তাতেই আমার ভালা
ওরে তোমার মতো রাজা-আমার ভাল এর কালারে—
কি হীরামন মানিক রাজা (২ বার)।

৩.

জিয়ান বসের কামাই লো দিয়া তুই সুন্দরীকে করলাম বিয়া লো
ও প্রাণ সুন্দরী লো ভুলে রলি তোর বাপ ভায়ের দেশে লো।
আমি নাইওর যাবার বান লাম বাড়া ছরদ মাসের গো
ও প্রাণ সাধুরে সেই চাউল খাইলো জ্বরা পোকায় রে...
আমি নাইওর যাবার আসায় কাপড় ধুইলাম মাসে মাসে গো
ও প্রাণ সাধুরে ধোয়া কাপড় মইলান হইল বাপের বাড়িরে...
নিবার ও আইছিনু মুই যাবি কিনা যাবি তুই লো
ও প্রাণ সুন্দরী লো বাহির হও তোর দেখতো চন্দ্র ও মুখ ওরে..
না যামু না যামু তোর ভাঙ্গারে ঘরে না যামু তো ভাঙ্গা দোয়ারে
ও প্রাণ মাধুরে শুনে দেখা যায় আসমানের ও চন্দ্ররে...
এইবার যাবিলো সুন্দরী—জোড় বাংলা উঠাবো বাড়িতে
ও প্রাণ সুন্দরী লো বেহুলে চিতাবো ঘরের দুয়ারে।

৪.

কোদালে কাটিয়ারে মাটি ও রাই কলা লাগায় সারি সারিতে
বাগানে ঘিরিয়া লইলো রাধের বাড়িরে—ও স্যাম কানাই রে
ও স্যাম কানাই রে ওরে থোর কলা বাদুড়ে রে খাইল—
ও বাই খাজনা দিবে কিসেরে—

www.pathagar.com

রাজার খাজনা বাকী পড়বে এ মৌসুমে রে ও স্যাম কানাই রে
ও স্যাম কানাইরে
ওরে কোদালে কাটিয়ারে মাটি ও রাই লাগাও সাধের সজনারে
সেই সজনা বেচিয়া দিবা রাজার খাজনা রে- ও স্যাম কানাই রে—
ও স্যাম কানাই রে—
ওরে যেদিন আসবে প্রাণের নাথ ও রাই সেই দিন কাটবো কলার পাতারে
দুই জনে বসিয়া খাবো রাধের ভাতরে ও স্যাম কানাই রে- ।

৫.

আমি হারাইলাম বারই বারই রে—আমি দিয়ে পানের দোকানরে
সোনার গায়ের বারই আমি গো ইসলাম পুরের পান
আমি হারাইলাম বারই বারইরে আমি দিয়ে পানের দোকান রে ।
হলিবাও হলোয়া ভাইরে হাতে সোনার নূরী
এখন দিয়ে যাইতে দেখছিনি হাইল্যাড ভাই সোনার বারই আনিছে
দেখিনাই দেখিনাই আমরা গো শুনেছি লোকের মুখে
তোমার আমি চলছে ধারে গো দুটু হস্ত নাড়া দিয়ারে... ঐ
জাল কাণ্ড জালিয়া ভাইরে ছাইফা তোল পানি
এখান দিয়া যাইতে দেখছনি জাইলা ভাই সোনার বারই আনিহে
দেখি নাই দেখি নাই আমরা গো শুনেছি লোকের মুখে
তোমার বারই আনি চলছে ধায়ে- গো দুটু হস্তনাড়া দিয়ারে-
আমি হারাইলাম... পানের দোকান রে ।

৩. থুব গান

থুব গানকে পোষণে গানও বলা হয়। এই গান মূলত পৌষ মাসের চন্দ্রিমা রাতে একদল যুব গায়ক গ্রামের গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পরিবেশন করে। গান পরিবেশন শেষ হলে গায়ক দলকে গৃহস্থেরা ধান বা চাল বা টাকা-পয়সা বকশিস হিসেবে দিয়ে থাকে। গায়ক দলে ৭ থেকে ৮ জন রাখাল থাকে। এরা গোল হয়ে বসে কেউ প্রেমজুরি বাজায়, কেউ হারমোনিয়াম গলায় ঝুলিয়ে বাজায়, কেউ ছোটো কাসা বাজায় ঢিং ঢং শব্দে। দলে একজন নাতি (ছোকরা) ও একজন দাদা ছন্দে ছন্দে গান করে। এই গানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো—গানের ভিতর বাঙালির ঐতিহ্যবাহি বিভিন্ন অলংকারের কথা ফুটে ওঠে। যেমন নাকফুল, বিছা, বাজু কানের দুল প্রভৃতি।

সংগৃহীত থুব গান

১.

সরল দেখিয়া চরলাম রে গাছে
ডাল ভাঙ্গিয়া পইল মোর সাঙ্গে
ওরে চিকন কালা ছাড়িয়া দেও মোর
কাঞ্চের কলসি যায় বেলা— (২ বার)

www.pathagar.com

সরকার বাড়ি করলাম রে—চুরি
লাগাইলোরে ম্যাচ-বাতি—
ওরে চিকন কালা ছাড়িয়া দেও মোর
কাঙ্খের কলসি যায় বেলা। ঐ

২.

আম ধরে ঝোকারে ঝোকা তেতুল ধরে বেকা
পূবের বেল পশ্চিমে গেলরে আমার—
তাও না হইল দেখারে—আমার
আইলোরে সরুয়া মাঞ্জুন সোয়ামীনি আসিলরে... ঐ

কালা বলদে ধলা বলদে জুইড়ে দিছে হাল—
এডা সুতে (যায়ন) এডা—উতেরে—আমার
ঘটিলো জঞ্জাল রে- আমার আহলোরে
সরুয়া মাঞ্জুন বোয়ালিনী—হাসিলো রে... ঐ
গোয়ালে বেঁচে দই- দুগ্ধ গোয়ালিনী গুনে কুড়ি
ওরে এডা কড়ি নিড়ে চড়েরে গোয়ালে মারে চুংগার বাতি রে
আমার আইল রে সরুয়া মাঞ্জুল গোয়ালিনী হাসিলেরে... ঐ

৩.

সুতা আনিবে চৌকি সাড়াবে হে—
শুয়ে থাকবে আমরা দুই জনে—
না যাইও সাধু তুমি বেদেশে। (২ বার)
ও তোর বৈদেশের কামাই তোর সে খাবে
না যাই ও না যাইও সাধু তুমি বৈদেশে—
ওরে তোরে ভিক্ষা লাগিয়া আমি খায়াবো তোরে
স যাইও সাধু তুমি বৈদেশো... ঐ

৪.

নাচে সুন্দর বেহলা খচে বড় ছন্দে
নাচতে ভালো পায়ের নাসা গীছে (গীত) ভাঙ্গিল গলা গো
নাচে সুন্দর বেওলা নাচে বড় ছন্দে।
নাচিতে নাচিতে বেওলার অন্তর ও ঘামিলো গো
নাচ্চন সুন্দর...
এক কুলে ধান দিয়ে নাচুনি বিদেয় করো গো—
নাচে সুন্দর... ঐ

৪. বিচ্ছেদ গান

বাউল গানের আসর ছাড়াও বিচারগানে বিচ্ছেদ গাওয়া হয়। বিচ্ছেদ গানে প্রিয়জনকে পাওয়া না পাওয়ার বেদনা ব্যক্ত হয়। স্রষ্টা সৃষ্টির, নারী পুরুষের এবং গুরু শিষ্যের

www.pathagar.com

নৈকট্য কামনা করে বা মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করে বিচ্ছেদগানে। কাছে পাওয়ার এবং দূরে সরে যাবার এই দুই ধরনেরই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় বিচ্ছেদ গানে। শেরপুর অঞ্চলে বিচ্ছেদ গানকে বিচ্ছেদি গানও বলা হয়।

সংগৃহীত বিচ্ছেদ গান

১.

তোমার নাগিয়া বন্ধুরে কাঁদে পোড়া হিয়া
কত সুকে আছি আমি একবার যাও দেখিয়ারে — ঐ

প্রথম দেখার কালে তুমি হাতে হাত রাখিয়া
বন্ধুরে প্রেরীতি শেখাইয়া
এ জীবনে বুলিবে না থাকবে চির সাথী হইয়ারে — ঐ

মাতা ছাড়লাম পিতা ছাড়লাম জোরের ভাই
বন্ধুরে ছাড়লাম জোরের ভাই
তুমি ছাড়া এ জগতে আপন কেহ্ নাইরে — ঐ

তোমায় ভালবাসি বলে আপন হইল বৈড়ী
বন্ধুরে আপন হইল বৈরি
কুল নাশিনী কলংকিনি উপায় কী আর করিরে — ঐ

তোমার যদি হয় গো দয়া যাইও দেখিয়া
বন্ধুরে যাইও দেখিয়া
তোমার প্রেমের স্মৃতি বুকে নিয়া'
কাঁদে পাগল তারা মিয়ারে — ঐ

২.

চির দুঃখী পথের কাঙ্গাল
জনম গেল যে কাঁদিয়া
আর কত কাঁদাইবে রে বন্ধু নিঠুর দরদীয়া — ঐ
যারা আমায় এনেছিল এই সুন্দর ভুবনে
এক এক করে ছেড়ে তাহারা দুইজনে
তাদের মত নেই আপনা বুঝেছি হারাইয়া — ঐ

পিতা হারা মাতা হারা হইয়া এই সংসারে
মনের দুঃখ মনে লইয়া ঘুরি ধারে ধারে
হঠ্যাৎ বান্ধব এসে ভালবেসে দিল সবকিছু ভুলাইয়া — ঐ

মুখ দেখিয়া দুখ বুঝিত গেল তার দরবারে
সকল জ্বালা দূরে যাইত বান্ধরের রূপ হেরে
হঠাৎ করে গেল ছেড়ে আমায় দেউলিয়া বানাইয়া — ঐ

www.pathagar.com

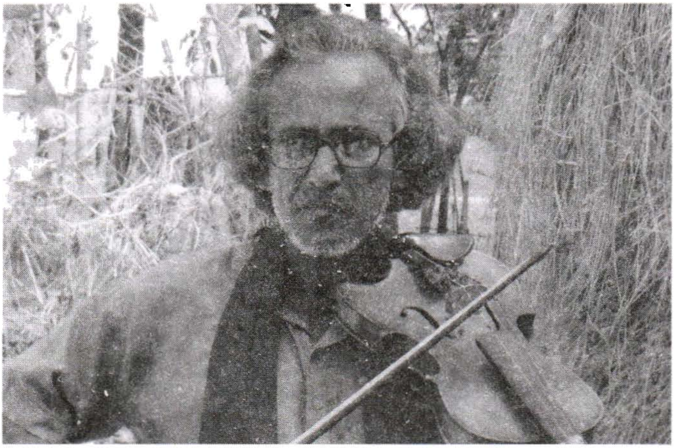

গানের আসরে তারা বাউল

কার মুখ দেখে এই পোড়া বুক করি শীতল
থাকার মধ্যে আছে শুধু দুই নয়নের জল
পাগল তারার শেষ সম্বল তাও নিলি কারিয়া

৩.

যত দিতে চাও আঘাত দিয়ে যাও সইতে শক্তি
দিও মোরে ও বন্ধু আমিত ভুলব না তোমারে — ঐ

সেদিন তুমি বলেছিলে তুমি যে আমার
সে দিন হতে দেখি আমি ঘোর অন্ধকার
যে চাই তোমাকে পাই ঐ রূপ এসে জলক মারে — ঐ
যে দিন তুমি আমায় দিয়ে ছিলে মন
যে দিন তুমি আমার দিয়ে করেছি আপন
মনে মনে তাই হলো আলিঙ্গন এখন কেন যাবে ছেড়ে — ঐ

তোমার ঐ সুন্দর মন দিয়েছে যারে
রাখিও তুমি তারে হৃদয়পুরে
আমি দুঃখী না হয় থাকব দূরে তুমি থাক সুখের বাসরে — ঐ

পাগল তারার প্রেমের স্মৃতি তুমি ভুল না

www.pathagar.com

এক মন দুই জনকে দেওয়া চলে না
মন দিয়েছি ভাল বেসেছি প্রতিদানে কাঁদালে মোরে — ঐ

৪.

গাছের শিকড় কেটে পানি দিলে সেই গাছ আর প্রাণ থাকে না
সবিতো ছলনা, এতদিনে বুঝলাম বন্ধু আমি তোমার কেউ না — ঐ
যে প্রেমে এই জগত সৃজন, সেই প্রেম হয় প্রেমিকদের জীবন মরার ভয় করে না।
বন্ধুর প্রেমে পুড়া যারা দেখলে তাদের যাইরে চেনা — ঐ

মনটারে বুঝাইলাম কত মন হইল না আমার মত
তার শনে পারলাম – ঐ

আমি হই নাই বন্ধুর মনের মতো গো হইলে কেন এই যন্ত্রণা – ঐ

প্রেম যে না করছে, সে ঠকেছে যে করছে সে মরেছে
প্রেমের এই নমুনা
ও সে চিরদুঃখী পথের কাঙ্গাল ডাক শুনিয়াও কথা কয় না – ঐ

পাগল তারা বন্ধুর কারণ কেঁদে কেঁদে গেল নয়ন
কান্নার শেষ হইল না
বন্ধুর প্রেমের চিতা বুকে নিয়া গো আপন দেশে হব রওয়ানা – ঐ

৫.

আমার গানের পাখি উড়ে গেল রে হঠাৎ করে অচিনপুরে
আর আসবে না ফিরে – ঐ

কতদিনের কত স্মৃতি মনে পড়ে দিবারাত্রি
কাঁদায় যে আমারে
যত ভাবি ভুলে যাব রে তত বেশি মনে পড়ে রে – ঐ

শত লোকের ভীড়ে বসত মনানন্দে গান শুনিত
দেখতাম পরান ভরে
ভাবের গান শুনিলে পাখি কাঁদত আমার গলে ধরে – ঐ

আসলে খাজার এই দরবারে আগুন জলে ধাও ধাও করে
মানে না অন্তরে
পায়ে ধরে বলি খলিল ভাই একবার এনে দেখাও তারে – ঐ

যার হারায় নাই সে বুঝে না আত্মার সাথী হারানোর কী যন্ত্রণা
তাদের বুঝাই কেমন করে
তার বিরহে পাগল তারা দিবানিশি আঁখি ঝরে – ঐ

www.pathagar.com

৬.
হঠাৎ করে ছেড়ে গেলি দিয়া আমায় ফাঁকি
তোর কারণে নিশিদিনে ঝরে দুইটি আঁখি – ঐ

তোমার আমার ছিল বন্ধু মধুর পীড়িতি
কার বৈশাখির ঝড় এসে করল যে ডাকাতি
নিয়তির নির্মম খেলায় দিলা চির লুকি – ঐ

যেই দেশেতে গেছে বন্ধু আর ফিরে আসবে না
আর কোন দিন কাছে বসে ভাবের গান শুনবে না
অবুঝ মনে বুঝ মানে না তারে একবার দেখাও দেখি – ঐ

কত দিনের কত স্মৃতি কত মধুর কথা
মনে হইলে হৃদয় মাঝে জলে প্রেমের চিতা
কেন দিলা এত ব্যথা বুঝলাম না চালাকি – ঐ

সাথী হারা পাখি যেমন সাথীকে হারাইয়া
ব্যথার পাহাড় বুকে নিয়া মরে ছটফটাইয়া
তেমনি পাগল তারার দশা কেমন বেঁচে থাকি – ঐ

৭.
সকল কিছু রেখে তুমি যার কাছে যাইবা চলে

এই বাড়ির মালিক ছিলেন দাদা পরে হইলেন পিতা
তুমি এখন সাজিয়াছ যেই বাড়ির বড় কর্তা
ভুলে গেছ দেওয়া কথা যা বলে এসেছিলে – ঐ

তোমার বলতে নাই কিছু যা দেখ দুই নয়নে
তুমি শুধু থাকিবে না আর সব থাকবে এই ভুবনে
সঙ্গী হবে শেষের দিনে ভাল মন্দ যা করলে – ঐ

আইছ একদিন যাইবা একদিন এই তো দুই দিনের খেলা
মাঝের পাঁচদিন ও ভুলা মন কার লাগিয়া কী করলা
সে ধন নিয়ে এসেছিলা সুখী হবে সঙ্গে নিলে – ঐ

সকাল দুপুর বিকাল গেল, সন্ধ্যা আসল ঘনাইয়া
কী ঘুমে ঘুমিয়ে আছ ও পাগল তারা মিয়া
বেলা ডুবলে ঘুম ভাঙ্গিলে লাভ হবে না কাঁদিলে – ঐ

www.pathagar.com

৮.

এসে কাল বৈশাখি ঝর ভেঙ্গে দিল সুখের ঘর
আপন মানুষ হইল পর ভাগ্যেরি দোষেরে
জীবন যাবে বুঝি হা-হুতাসে – ঐ

ও মনরে
স্বর্ণ লতা প্রেম করে গাছকে রাখে ধরে
গাছ মরলে লতা মরে তবু গাছকে না ছাড়ে
যেই প্রেম সৃষ্টি ভুবন সেই প্রেমের নাই মরণ
প্রেম পরীক্ষার জন্য বিরহ আসে – ঐ

ও মনরে
মরা মানুষ মরে না পোড়া জিনিস পুড়ে না
পানি কাটলে দুই ভাগ হয় না এক সঙ্গে ভাসে
না হইলে আত্মার মিলন সেই প্রেম হয় ভুতের কীর্তন
কলঙ্ক রটে প্রেমে অবশেষে– ঐ

ও মনরে
চাতক তৃষ্ণায় গেলে মারা অন্য জল খায় না তারা
চাহিয়া থাকে চাতক মেঘের আশে
ভেবে পাগল তারা কয় প্রেম যদি সত্য হয়
আশেক বাঁচিয়া থাকে মাশেকের আশে – ঐ

৯.

যে যাহার পীড়িতের পোড়া দেখলেই তারে যায় চেনা
হারাইলে ধন আর ফিরে আসে না–(২) বার – ঐ

কত দিনের কত স্মৃতিরে আছে মোর অন্তরে
আমার বুকের সনে বুক মিলাইয়ারে কাঁদতি গলা ধরে
কতজন ডাকে আমারে তোর মধুর বচন শুনি না – ঐ

যত ভাবি ভুলে যাবরে ততই মনে পড়ে
সাথী হারা পাখি যেমনরে ধর ফরাইয়া মরে
তোমরা যে বুঝাও আমারে আমার অবুঝ মনে বুঝে না – ঐ

ছেড়েই যদি যাবি তুই কেন করলি পিরিতি
তোর আশায় বসিয়া থাকি জ্বালাইয়া মোমবাতি
তোর যে দেশে হইল বসতি পাগল তারারে কেন নিলি না – ঐ

www.pathagar.com

১০.

কে গো তুমি সুন্দর করে সাজালে এই বিশ্ব বাগান
কত সাধু মহৎগণে তোমারই সন্ধানে
ঘুরে বনে বনে পাইনা সন্ধান – ঐ

তুমি সুন্দর তাই তো সুন্দর
তোমার সৃষ্টির কৌশল সুন্দর
মানব জীবন করতে সুন্দর
পাঠালে সুন্দর কোরআন – ঐ

তোমার সৃষ্টির ন্যায় তুলনা
কারো সাথে কেউ মিলেনা
সদায় ভাবি এই ভাবনা
নাম ধরেছ তাই শিল্পি মহান – ঐ

তোমার সৃষ্টির নিয়ে ভাবে যারা
তারাই হলো জেন্দা মরা
তোমার দিদার পাইল তারা
তারাই জগতে মানুষ প্রধান – ঐ

পাগল তারা বড় বোকা
তার কাছে সে নিজেই ঠেকা
না পাইয়া তোমার দেখা
গান গেয়ে জোড়ায় তাপিত প্রাণ – ঐ

১১.

কি আগুন জ্বালাইলে বন্ধুরে
ও বন্ধু মনের আঙ্গিনায়
সারা জনম যাবে আমার করতে হায় হায় – ঐ
একা ছিলাম ভালই ছিলাম ছিলাম বড় সুখী
বন্ধু বেসে আইসা কাছে বানাই তুই দুঃখিরে – ঐ

আগে যদি জানতাম আমি হইবে এমন
সাধু সেজে চইলা যাইতাম সাধের বিন্দা বন
সেই বিন্দা বনে থাকলে বইসা ভক্তি পাইতাম পায়
এখন তোষের আগুন হৃদয় মাঝে জ্বলছে সর্বদায় – ঐ

পাগল তারার মনের দুঃখ বলব কাহার দ্বারে
তুমি ছাড়া নাইরে বান্ধব এই ভব সংসারে

www.pathagar.com

আমারে কান্দাইয়া বন্ধু হও যদি তুমি সুখী
কান্তে কান্তে যাই যদি যাক আমার পরাণ পাখি – ঐ

১২.

তোমরা আমারে বুঝাইও না
আমার অবুঝ মন তো মানে না

ঘুমের ঘরে ছিলাম একা
স্বপ্নে বন্ধু দিল দেখা গো
আমি জেগে ঐ রূপ পাইলাম না – ঐ

ঐ রূপ যে দেখিল একবার
ঘরে থাকা দায় হলো কার গো
ও সে কুল কলঙ্ক ভয় পায় না – ঐ

আমার চোখ লাগাইয়া চোখে
একবার যদি দেখাতি তাকে গো
তারে ছাড়া বাঁচতি না – ঐ

পাগল তারা বন্ধুর কারণ
কাঁনতে কাঁনতে গেল নয়ন
তারে একবার এনে দেখাও না – ঐ

১৩.

কেউ কখনো জানতে চাইওনি আমার মনের জ্বালা
সারা জীবন যার যা প্রয়োজন আমার কাছে চাইলা – ঐ

স্বার্থপর এই জগৎ মাঝে দেখি কত স্বার্থের খেলা
স্বার্থের বেঘাত ঘটলে ভাইয়ে কাটা ভাইয়ের গলা।
তোমরা আপন সেজে আমার কাছে এসে
আমায় চুষে চুষে খাইলা – ঐ

যাদের সুখের জন্য আমি এত কিছু করলাম
বিনিময়ে চাওয়ার চেয়ে বেশি ব্যথা পাইলাম
তাদের দেওয়া ব্যথা আর প্রাণে সই না।
অন্তর পোড়ে কয়লা – ঐ

মুখ দেখে দুখ বুঝার মত একজন মানুষ ছিল
মরণে নামে ঝড় আসিয়া তারে নিয়ে গেল।
আমার মনের দুখ মনে রইল

www.pathagar.com

হইল না কাউকে বলা – ঐ

এই জগতে আমার ব্যথার ব্যথি যেদিন পাব
হাত ধরিয়া বুকে নিয়ে পোড়া বুক জুড়াবো
বুক চিরে দুঃখ দেখাইবো
সেই অপেক্ষায় রইল তারা পাগলা – ঐ
কথা, সুর ও শিল্পী : পাগল তারা বাউল

৫. ভজন

সৃষ্টিকর্তার মহিমা কীর্তন ও নৈকট্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিচারগানের বন্ধনার পর অথবা বাউল গানের আসরে বা বৈঠকি গানে ভজন গান পরিবেশন করা হয়। ভজন গান ছাড়া যেন কোনো ওরসের গানের আসর জমে ওঠে না। ডাক, নিবেদন, ভজন বিচ্ছেদ, ভজন প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায় ভজন গানকে।

সংগৃহীত ভজন গান

১.
মুর্শিদ হারা পাগল আমি আর বাঁচিবার আশা নাই
সামনে দাঁড়াও একবার দেখা যায় – ঐ

যে দিন তারে প্রাণ সপেছি আমি কী আর আমার আছি গো – ঐ
আমার বলতে যাহা ছিল সব দিছি মুর্শিদের পায় – ঐ
গলে দিয়ে নামের মালা বারাইয়াছ দ্বিগুণ জ্বালা গো
চিরকাঙ্গাল বানাইলা এই দুঃখ কারে জানায় – ঐ
আমার মুখ দেখে কেউ দুখ বুঝে নয়নের জল মুছে দেয় না গো
পুড়া মনে আর মানে না মনটারে কেমনে বুঝায় – ঐ
গেলে দয়ালের দরবারে মনের আগুন জলে দাও দাও করে গো
ফুলের বাগান আছে পড়ে সেই বাগানের মালি নাই – ঐ
মুর্শিদ হারা ভক্ত যারা তারা বড় কপাল পোড়া গো
তাদের একজন পাগল তারা কাঁদিয়া নিশি কাটায় – ঐ

২.
চাকর যদি লাগে তোমার গো
আমাকে রাখিয়ো
মনে চাইলে কিছু দিয়ো – ঐ
এ জীবনে প্রথম যেদিন দেখেছি তোমারে
কি জানি কী মন্ত্র করে প্রাণ নিয়েছ হরে
এখন তোমার জন্যে আঁখি ঝড়ে

www.pathagar.com

আমায় তাড়াইয়া না দিও – ঐ

ভক্তের অধীন হয় ভগবান সর্ব শাস্ত্রে শুনি
তুমি আমার সাধনার ধন ভজনের স্বামী
পথ হারা পথিক আমি
আমায় পথ দেখাইয়া দিও – ঐ

যে হালেতে রাখ দয়াল সে হালেতে খুশি
কাঁদাও যত কাঁদব তত তবুও তোমায় ভালবাসি
আমি হব ঐ চরণের দাসী
আমায় দাসী বানাইও – ঐ

যে হালেতে রাখ তুমি সেই হালেতে থাকি
সুখে দুঃখে আমি যেন তোমার ঐ রূপ দেখি
যেদিন ওড়ে যাবে তারার দেহের পাখি
তোমার নিজ হাতে সাজাইও – ঐ

৩.
যারে ভজলে দূর হয়ে যায় এই ভবের সকল জ্বালা
তারে কেন ভজলি নারে মন ভোলা – ঐ

আল্লাহর নবীর পারলে তারে ভজন কর
সে খুশি না হইলে খুশি হবে না আল্লাহ – ঐ

আপন ঘরে থাকতে কাবা অযথা কেন মক্কা যাইবা
সুনজরে দেখলেই হজ্জ হয় বলেছেন রাসুলুল্লাহ – ঐ

অন্তরের ধন মানিক রতন দেখলে শীতল হইত নয়ন
হঠাৎ করে হইলে গোপন আমারে করে দেওলা – ঐ
আমি যেই রূপের ভিখারী তুলনা নাই জগৎ জুড়ি
হারাইয়া ধন তালাশ করি দীনহীন তারা পাগলা – ঐ

৬. বিচারগান

লোকসংগীতের ধারায় বিচারগান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন যশোর-নড়াইল অঞ্চলে এ গানকে ভাবগান বলা হয়। টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ অঞ্চলে বাউলার লড়াই বলা হয়। শেরপুর অঞ্চলে বিচারিকগান হিসেবে গণ্য। এই গানে থাকে তত্ত্বজ্ঞান বিশেষ করে ধর্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব। প্রতিপক্ষ দুইজন বাউল বা গায়েনের মাধ্যমে বিচারগান পরিবেশিত হয়।

www.pathagar.com

সংগৃহীত বিচার গান

১.

আমি মানুষ তুমিও মানুষ
মানুষ আমরা সব জানায়
সে আবার কেমন মানুষ
যার জন্য ঘুরে বেড়াই – ঐ

আমায় দেখিতে মানুষের আকার স্বভাবে হইলাম জানোয়ার
মানুষ হইয়াও মানি না তো কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় – ঐ

আমার ভিতর যাহা আছে দেখি জানোয়ারের গায়
শুধু ভাল মন্দ বোঝার শক্তি বনের ঐ পশুটার নাই
ঐ বনের পশু হারাম খায় না আমি মাঝে মাঝে খাই – ঐ

মানুষ কথার অর্থ ভারী ময়ে মানবতা ধরি
নয়ে নম্রতা অধিকারী ষয়ে সৎ ভাব থাকা চাই – ঐ

জন্ম লইয়া মানবকুলে একজন সুক্ষ্ম মানুষ না ভজিলে
ও তার মানব জন্ম যায় বিফলে বলে পাগল তারা মিয়ায় – ঐ

২.

তোদের ভাল মন্দ ধার ধারি না
বাচি না আমার চিন্তায়
তোরা গুরু ডাকলে বড় নজ্জা পাই – ঐ

এই জীবনে কত শিষ্য আসল আমার কাছে
কেউ সন্ত্রাস কেউ লোচ্চা কাউকে গাঁজায় পাগল করছে
কেউ মদ খাইয়া মাতাল হইয়া
সালাম করে আমার পায় – ঐ

কেউ রোগী কেউ দুঃখী কারো চাকরী নাই
নিঃসন্তান আসল কত সন্তানের আশায়
কারো স্মৃতি শক্তি নাই
কেউ প্রেম করিয়া ব্যর্থ হইয়া
প্রেমিকারে এনে চায় – ঐ

মদ গাঁজা নারী ছাড়া
পীরের পীরালি টিকে না
সত্য তরীকা পালন করতে
একজনেও আসে না

www.pathagar.com

জমেছে ভণ্ড পীরদের সব আস্তানা
আল্লাহর অলি কাঁদে গাছ তলায় রে
মানুষ নাই – ঐ

নিজেই কানা পথ চিনে না আরও কিছু কানা লইয়া
টাকা আর পোশাকের জোড়ে
পীর সাব গেল হইয়া
ঐ সব ভণ্ড পীরদের কাছে যাইয়া
পরকাল হারাস না ভাই – ঐ

ভক্ত চিনে ভক্তি নিয়া
হৃদয়ে দিও স্থান
কুভক্তের ভক্তি নিলে
শেষে হারাবি সম্মান
উদ্ধার করতে স্বার্থ হইলে ব্যর্থ
গুরুর কপালে পোড়া ছাই – ঐ

আজ না বুঝলে বুঝবি কাল
ডুবলে আয়ু বেলা
উচিৎ কথা কইয়া শত্রু
হইল তারা পাগলা
তোদের সাঙ্গ হবে রঙের খেলা এই খেলার আর টাইম নাই – ঐ

৩.

মানুষের নাই মানবতা
মানুষ বুঝে না মানুষের ব্যথা
মানুষ ফাটায় মানুষের মাথা
তবু সে মানুষ
আসলে মানুষ নয়
সকলেই বেহুস – ঐ

বেহুসের এই দুনিয়ায়
একজনেরও হুস নাই
এমন মানুষ দেখি নাই
যাহার আছে হুস
গুলেমালে গেল দিন
বাকি মাত্র কয়েক দিন
এমন একদিন আসবে তোমার
কেউ নিবে না খোঁজ – ঐ

www.pathagar.com

এই পৃথিবীর যত মানুষ
একেক জন একেকটার বেহুস
মানুষ রূপী কত বেহুস
গায় মানুষের দোষ
উকিল বেহুস শান্তির জন্যে
বিবাদী বাঁচার আশায় দিতেছে ঘুষ – ঐ
কামুক বেহুস কামের কারণে
প্রেমিক বেহুস প্রেমের জন্যে
ধনী আরও ধনের জন্যে হইল বেহুস
মানী বেহুস মানের কারণ
জ্ঞানী করে জ্ঞান অন্বেষণ
নিঃসন্তান ভবে যারা
সন্তানের বেহুস – ঐ

বাউলের ব্যাস ধরিয়া
মান কুলমান সব ছাড়িয়া
বাউল রূপী পাগল তারা
হয় টাকার বেহুস
হালিম, হাকিম, কেস মিয়া
তারা বেহুস যন্ত্র নিয়া
বাঁশের বাঁশী বাজাইতে
ইয়াহিয়ার নাই হুস – ঐ

৪.
নিজে ভাল না হইয়া
কাউকে মন্দ কইও না
অন্ধরে তো আরেক অন্ধ
পথ দেখাইতে পারে না – ঐ

যার ভিতরে নেই মানবতা
যতই কিছু করুক না সে
সব কিছুই বৃথা
সর্বজীবকে বাসতে ভাল
বলেছেন সাঁই রাব্বানা – ঐ

হিন্দু মুসলিম, বৌদ্ধ আর খ্রিষ্টান
এক আল্লাহর সৃষ্টি সবাই
এক মায়ের সন্তান
আশা যাওয়ার একই বিধান

www.pathagar.com

বিচারেও ভিন্ন দেখি না – ঐ

সুদ খাইতে কুরআনে করেছেন মানা
শুকর খাইলে যায়রে জাতি
সুদ খাইলে যায় না
মুখে কয় ধর্মের কাহিনি
আসলে কেউ মানে না – ঐ

পাগল তারা বড় অজ্ঞানী
পাগল পাড়া এসে
শুধু করল ভোগলামী
এখন ঝরে শুধু চোখের পানি
কাঁদলে দুঃখ ফুরায় না– ঐ

৫.
ও তুই কী করিতে বিদেশ আইলিরে মন
সেই কথা কী তোর মনে নাই
আপন দেশের পুঁজি কর কামাই – ঐ

মনরে
শৈশব গেল, কৈশোর গেল
দারুণ যৌবন দেহে আসল
পাগল হইলি যৌবনের জ্বালায়
ঘরে আনলি এক কাল সাঁপিনী
চোষে খাইল দেহের পানি
ও তুই সোনা দিয়ে পিতল নিলি
কামের যন্ত্রণায় – ঐ

মনরে
সোনার যৌবন একদিন পড়বে ভাটি
হাতে নিবি বাঁশের লাঠি
পূর্বের মত শক্তি দেহে নাই
পেকে যাবে তোর চুল আর দাড়ি
ভিন্ন বাসবে ঘরের নারী
পুত্র কন্যা আড়ে আড়ে চায় – ঐ

মনরে
আর করিস না অবহেলা
হঠাৎ ডুবে যাবে বেলা

www.pathagar.com

বেলা ডুবলে যাইবি কোথায়
করলে পরপারের পুঁজি
দয়াল নবী হইয়া মাঝি
পার করিবেন উঠাইয়া তার নায় – ঐ

মনরে
কয় দীনহীন পাগল তারা
নওশের চাঁনের চরণ ছাড়া
দয়াল নবীর দীদার পাওয়া দায়
মান কুলমান ছেড়ে দিয়া
ঐ চরণে থাক পড়িয়া
নইলে কেশ বাঁচার উপায় নাই – ঐ

৬.
হালাল, হারাম খুঁজি না
সত্য, মিথ্যা বুঝি না
যাহা কিছু আছে তোমার সৃষ্টির নিদর্শন
মানুষের কল্যাণেই করেছ সৃজন – ঐ

মিথ্যা যদি না থাকিত
সত্যের মূল্যায়ন কি
হারাম যদি না থাকিত
হালাল কেমন বুঝি
ধর্ম আছ বলে বিধর্মী লোকে বলে
দিন গেল গুলেমালে করে ভূতের কীর্তন – ঐ

মিথ্যার সৃষ্টি কর্তা যিনি
সত্যকেও সৃষ্টি করে
সত্য মিথ্যা হালাল হারাম
এক ঘরেই বসত করে
ভাল মন্দের বিচার করে দেখি
মন্দের ভিতরে ভাল রয়েছে গোপন – ঐ

যে মুখে খায় হালাল খানা
সেই মুখেই খায় হারাম
সে সুরে গান গায়
সেই সুরেই পড়ে কুরআন
হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান
তোমার নেয়ামত খেয়ে বাঁচায় জীবন – ঐ

www.pathagar.com

লোচ্চা করে লোচ্চার বিচার
বসে বিচারকের চেয়ারে
দিনের চোর আছে যত
রাত চুরা ধইরে মারে
গুণ্ডায় গুণ্ডামী করে শক্তি জোরে
অমানুষের কাছে মানুষ হয় নির্যাতন – ঐ

ভাল মন্দের বিচার করা
পাগল তারার হইল না
যাহা খাওয়াও তাহাই খাই
ওগো সাঁই রাব্বানা
জান্নাত কিংবা জাহান্নাম ঠিকানা
আমি থাকলে তুমি আছ
নাই চিন্তার কারণ – ঐ

৭.

বুঝবি না পাগলের খেলা
নিজে পাগল না হইলে
নাচে পাগল তাল বেতালে
নাচে পাগল ভাবের তালে – ঐ

পাগল হইয়া যায় ফানাফিল্লাহ
জপে শুধু সেই নামের মালা
তার প্রেমে মুগ্ধ নিজেই আল্লাহ
দেখ না মন তুই কোরআন খুলে – ঐ
খাইয়া পাগল নামের শুরা
মজনু হালে করে ঘুরা ফেরা
ঘর বাড়ি বানাই না তারা
জীবন কাটায় বন জঙ্গলে – ঐ

দয়াময়ের ইচ্ছামত চলছে পাগল অবিরত
না খেয়ে ও থাকে তার অনুগত
হুকুম ছাড়া খায় না দিলে – ঐ

মানুষ রূপী জানোয়ারে
সেই পাগলদের কত প্রহার করে
নীরবে সব সহ্য করে
দেখে না দুই নয়ন মেলে – ঐ
ভবের পাগল তারা মিয়া

www.pathagar.com

কি করলি তুই কার লাগিয়া
মানুষ কুলে জন্ম লইয়া
দিন কাটালি পশর পালে – ঐ

৮.

আইছ একা যাইবা একা
সঙ্গে কেহ যাবে না
তবে কিসের এ ভাবনা
যত মিছে সব ভাবনা – ঐ

তোমার বাপে আইল দাদার উছিলায়
একদিন এই বাড়ির মালিক ছিলেন দাদাই
হঠাৎ দাদা নিল বিদায় আর তো এলনা – ঐ
এই বাড়ির মালিক হইল পিতায়
যাহার উছিলায় তুমি আসলে এ ধরায়
সে বর্তমানে আছে কোথায়?
ভেবে দেখ না – ঐ

পরের জায়গায় বেধেঁছে বাড়ি
হুকুম করলে যাইতে হবে
সবকিছু ছাড়ি
তবে কিসের বাহাদুরী
ওরে দিনকানা – ঐ

শেষে কাঁদলে দুঃখ যাবে না
সময় থাকতে পাগল তারা
চেয়ে নে ক্ষমা
ধর্মের কর্ম না করিলে
জাহান্নাম ঠিকানা – ঐ

৯.

তোমার খেলা বুঝে সাধ্যকার
ওগো পরওয়ার- (২)

এলাহি তোমার উদ্দেশ্য করিতে সাধন
আদমকে করিলে সৃজন
প্রেম খেলাইতে বাস না তোমার
ফেরেস্তাদের করলা ফরমান
আদমকে করিতে সালাম
মকরুম কেন দোষি হলো

www.pathagar.com

বুঝলাম না বিচার – ঐ

(এলাহি) আদম একা থাকতে নারে
মনটা তাহার কেমন করে
ভাবে বুঝলা সংগীর হয় দরকার
হাওয়াকে সৃষ্টি করিয়া
তার পাশে রাখলা বসাইয়া
নিষেধ করলা গন্দম খাইবার – ঐ

(এলাহি) ওমা কারু ও ওমা কারুলা
কোরআনেতে প্রমাণ দিলা
তোমার মক্কর বুঝা হইল ভার
মকরমে কার শক্তি নিয়া
জান্নাতে যায় প্রবেশিয়া
আদমকে গন্দম খাওয়াইবার – ঐ

(এলাহি) তোমার সেই প্রিয় আদম
দোষি হলো খেয়ে গন্দম
পাঠাইলা এই জগত মাঝার
গন্দমের উছিলা করে
পাঠাইয়া আদম হাওয়ারে
ফুলের বাগান সাজাইলা তোমার – ঐ

(এলাহি) পাগল তারা বুদ্ধি হত
তোমাকে আর খুজবে কত
আজ অবধি পাইলাম না দিদার
ভাল মন্দ তোমার গড়া
মন্দ নহে তোমায় ছাড়া
তুমি ছাড়া কে আছে আমার – ঐ

১০.
আমি ভাল মন্দ যা করেছি গো
ক্ষমা চাই তোমার কাছে–(২)
যদি ক্ষমা না কর
তোমার দয়াল নাম মিছে – ঐ

তোমার আদেশ মানলে যদি
বিনিময়ে জান্নাত পাই
না মানিলে তোমার কথা

www.pathagar.com

যদি জাহান্নামে যাই
তবে দয়াল ডাকব কিসের আশায়
হবে কর্মে যা আছে-(২) – ঐ

কোরআনে ঘোষণা করছ
লা তাকনাতো মির রাহমাতিলা
যতই গুনা কর বান্দা
মাফ করব আমি আল্লাহ
তবে দোযখের ভয় কেন দেখাইলা
কথাটা জিগায় কার কাছে-(২) – ঐ

হালাল হারাম ভাল মন্দের
তুমিই সৃষ্টিকর্তা
তোমার হুকুম ছাড় না কি
নড়ে না গাছের পাতা
আমায় অপরাধ করার ক্ষমতা
কে দিয়েছে-(২) – ঐ

তুমি গান গাও তুমি শোন
দোষি কেন পাগল তারা
ভক্ত সেজে ভক্তি দিয়া
গুরু হইয়া থাক খারা
হয় না কিছু তোমায় ছাড়া
হাদিসে আছে-(২) – ঐ

১১.

কাল সাপে ধ্বংসিলে মানুষ
হায়াত থাকলে মরে না
মানুষে কামড়াইলে মানুষ
হায়াত থাকলেও বাঁচে না – ঐ

মানুষ হইয়া মানুষ মারে
দেখলাম কত নয়নে
কুকুরে কুকুর মারিলে গো
মারে না তারে প্রাণে
ধৈর্য সহ্য, সবুর ক্ষমা
না থাকিলে মানুষ না সে-(২) – ঐ
হাত-পাও নিয়ে জন্ম নিলে
যদি সে মানুষ হতো

www.pathagar.com

তবে কী ইব্রাহিম বলখী
রাজত্ব ছেড়ে দিত
দাজলা নদীর পাড়ে বসে
করল কিসের সাধন সে-(২) – ঐ

ভবরঙ্গ নাট্যমঞ্চে আর
কত খেলবি খেলা
ভিলেনের অভিনয় করে
ডুবালি আয়ু বেলা
হারাইয়া ধস তালা শিলে
জীবনে আর মেলে না গো-(২) – ঐ

কি বলিয়া এসেছিলে মনে কী পড়ে না তোর
এখন ও তোর সময় আছে
সময় আছে মুর্শিদ চাঁনের সঙ্গ কর
দিনে দিনে দিন ফুরাল
ডুবলে বেলা উঠে না–

১২.

বাড়লেই কমে গণনাতে ভেবে দেখ মূল বিষয়
মানুষের বয়স বাড়ে একথা কোন বোকায় কয় – ঐ

সৃষ্টিতে একদিন কমে গেছে
আজ অবধি কমিতেছে
বাড়ত যদি এই পৃথিবী তবে কেন হবে প্রলয় – ঐ

বয়স বাড়লে আয়ু কমে
কানেও তখন কম শোনে
পিছন থেকে জমে টানে
আয় তোরে দেশে পাঠাই – ঐ

বত্রিশটি দন্ত ছিল দুই এক করে কমে গেল
চুল দাড়ি মোছ পেকে গেল
পাকলে ফল কী গাছে রয় – ঐ

চোখের পাওয়ার কমিতেছে
দেহের টাটকা চামড়া ঢিল হইতেছে
আয়ু বেলা ডুবে যাচ্ছে
বেলা ডুবলে কী উপায়

www.pathagar.com

আগের মত স্মৃতি শক্তি নাই
বিবেক বুদ্ধি কমতেছে ভাই
পাগল তারা ভাবছে সদাই
কি জানি শেষে হয় – ঐ

১৩.
ওগো আলাহ্ পরওয়ার
তোমার খেলা চমৎকার
কে বলে দয়াল নামটি তোমার - ঐ

নিষ্পাপ সন্তান এই জগতে আসে
কেহ সুখি, কেহ দুখী
জানি না কোন দোষে
কাউকে লোকে বলে শালা
কাউকে দাও জয়ের মালা
সকলি কর আল্লাহ কোরআনে প্রচার - ঐ

কাউকে দিলা রাজ সিংহাসন
আর ও রঙ্গের কাচারী
কারো থাকার জায়গা নাই
গাছ তলায় রয় পড়ি
ঐ যে ভিখারী সারাটা দিন ভরি
এক মুঠো ভাতের জন্যে কর হাহাকার - ঐ
যে জন ডাকে তোমাকে
তারে দাও কষ্ট
সে জন স্মরণ করে না
তারে রাখ সন্তুষ্ট
তাই পাগল তারার মাথা নষ্ট
দেখিয়া খেলা তোমার - ঐ

১৪.
দেখনা কিয়ামতের নিশানা - ঐ
দয়াল নবীর মুখের বাণী কিয়ামতের নিশানী
এক মুসলমান আরেকজনকে ভাল বাসবে না
ছেড়ে নামাজ রোজ খাইরে শুধু মদ গাজা
নায়েবে রাসুলকে মানুষ সম্মান করবে না - ঐ

ন্যায় বিচার উঠে যাবে ভাই ভাইকে না চিনবে
মাতা পিতার আদেশ সন্তান মানবে না

www.pathagar.com

সৎ উপদেশ যে দিবে
চোখ রাঙ্গাইয়া বলিবে তোমার চেয়ে আমি
কিন্তু কম বুঝিনা - ঐ

অসতের দেশ শাসন হবে নারী নির্যাতন
মা বোনেরা ইজ্জত রাখতে পারবে না
বিধর্মীয় অনুকরণ করবে মানুষ সর্বক্ষণ
রাসুলের সুন্নত কে কেউ ভালবাসবেনা - ঐ

দ্বিগুণ ফসল হবে বরকত কমিয়া যাইবে
অকালে ফল ফলিবে সাধ লাগবে না
নামে মাত্র মুসলমান মানবে না আল্লাহর কোরআন
ঘন ঘন মসজিদ নামাজ মিল বেনা - ঐ

মাস্তান আর ঘোষ খুরে দেশটা যাবে ভড়ে
অন্যায়ের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলবে না
ও গো আল্লাহর পরোয়ারদেগার
প্রার্থনা পাগল তারার
ঈমান নিয়ে মরতে চাই আর কিছু চাই না - ঐ

১৫.

ও তুই নিজে ভাবুক না হইয়ারে
কাউকে ভাবের কথা কইস না
ও তুই ভাবনা জেনে
ভাব সাগরে সাঁতার খেলতে যাইস না - ঐ

ভাবে পড়ে নিজেই আল্লাহ
আরেক ভাবুক বানায় রাসুল্লাহ
খেলছে দুই জন ভাবের খেলা রে
সেই ভাব সকলেই বুঝে না - ঐ

ভাবুক ছিলেন যুন্নুন মিসরী
থাকত মাওলার ভাবে পড়ি
তারে নিজে আল্লায় সালাম দিল রে
পাগলায় সালামের জবাব দেয় না - ঐ

ভাবুক ছিলেন হযরত বিল্লাল
নবীর ভাবে থাকত বেহাল
দয়াল নবীর নাম শুনিয়ারে
বিল্লাল হয়ে গেল ফানা - ঐ

www.pathagar.com

ইব্রাহিম নবী ভাবে পড়ি
আপন ছেলের গলে চালায় ছুরি
আবার কোন ভাবের ভাবুক ইসমাইল রে
ও সে নিষেধ করিল না - ঐ

অন্তর দৃষ্টি যাহার নষ্ট
ও তার ভাবুক চেনা বড় কষ্ট
চর্ম চক্ষু থাকলে কী লাভরে
এই চোখে ভাবুক ধরা যায় না - ঐ

পাগল তারার স্বভাব দোষে
এখন ও যাওয়ার হয় নাই ভাবের দেশে
নওশের চানের চরণবীনেরে
ও তোর ভাব আখি ফুটল না - ঐ

১৬.

ভোলা মন তোর গান তুই নিজেই বিচার কর
তোর কাছে না লাগলে ভাল
ভাল বলবে কেমন পর – ঐ

গানেতে রয়েছে জ্ঞান
ভাবুক যারা পায় সে সন্ধান
যে শুনতে চায় গানের টান
তার গান শুনা হারাম ধর – ঐ

এই গান সাধকের আত্মার খোরাক
তোর গানে কী আছে সেই ভাব
না থাকলে ভাব চুপ করে থাক
ভাব সাগরের সন্ধান কর – ঐ

বলছেন আল্লাহ্ পরোয়ারদেগার
কোরআন পড় ভাবের সুরে
নইলে কিছু পাবি নারে
পড়লে কোরআন জীবনভর – ঐ

যদি মন দেখতে চাও তারে
ডুবে থাক ভাব সাগরে
বিনয় করে ডাকলে তারে
হইতে পারে দর্শন তোর – ঐ

www.pathagar.com

পাগল তারা বড় বোকা
এই গান করিয়া নিলি টাকা
না পাইলি তুই বন্ধুর দেখা
কি হবে তুই মরার পর – ঐ

১৭.

বাড়লেই কমে গণনাতে
ভেবে দেখ মূল বিষয়
মানুষের বয়স বাড়ে
এই কথা কোন বুকায় কয় – ঐ

সৃষ্টিতে একদিন কমে গেছে
আজও অবধি কমিতেছে
বাড়ত যদি এই পৃথিবী
তবে কেন হবে প্রলয় – ঐ

বয়স বাড়লে আয়ু কমে
কানেও তখন কম শোনে

বত্রিশটা দন্ত ছিল
দুই এক করে কমে গেল
চুল দাঁড়ি মুছ পেকে গেল
পাকলে ফল কী গাছে রয় – ঐ

দেহের শক্তি কমে গেছে
টাটকা চামড়া ঢিল হইতেছে
চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই তেমন
চলাফেরায় কষ্ট হয় – ঐ

আগের মত স্মৃতি শক্তি নাই
বিবেক বুদ্ধি কমিল ভাই
পাগল তারা ভাবছে সদায়
কি জানি কী শেষে হয় – ঐ

১৮.

এক মুহূর্তের লাগিয়া এই ভবে আসিয়া

মা জননী প্রস্রব করল
চলে আসলাম এই ধরায়
শৈশব কৈশোর চলে গেল

www.pathagar.com

আমি কিছু বুঝি নাই
এবারে যৌবনে পড়ল খরা
লোকে বলে বুড়া – (২)
কখন আমি বুড়া হইলাম টের পাইলাম না রে – ঐ

ঐ যে একটি বৃক্ষ লাগিয়া ছিলাম আমি
ভাবে বুঝি আমার চেয়ে ঐ বৃক্ষটায় দামী
ওরা গাছ বেচলে পাবে টাকা
আমি হতভাগা
গাছের চেয়ে মূল্যহীন হয়ে গেলাম রে – ঐ

দিনে দিনে ঐ বৃক্ষটায় হয়েছে ভারী
দেহ বৃক্ষে সার ছিল আমি মূল্যায়ণ না করি
সময় অসময় করেছি অপচয়
এখন খালি বাকল কেউ ধরে না রে – ঐ

আমাকে না চিনিয়া করিছে মস্ত ভুল
নয়ন জলে বুক ভাসিয়ে দিয়ে গেলাম ভুলের মাশুল
বলে পাগল তারা
সাবধান হই তোমরা
সময় থাকতে চিনে নিও আপনারে – ঐ

১৯.
শুক্র, শনি, রবি, সোম
মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি
এই সাতের যে কোনদিন
হবে জীবন তোর ইতি – ঐ

ও তুই প্রতিজ্ঞা করেছিস শর্ত
মেনে চলবি সকল শর্ত
মোহ মায়ায় হয়ে মত্ত
তুই করলি তোর ক্ষতি – ঐ
আজ গেলে কাল আসবে
কালের পর পরশু দিন
অতিরিক্ত সময় পাইলে
পাবি তুই আর চার দিন
হঠাৎ একদিন আসবে সেদিন – ঐ
যেদিন হবে কাল রাতি – ঐ
আসলে মরণ, পালায় জীবন

www.pathagar.com

ছিন্ন করে সকল বাঁধন
যা হবার তা হয়ে যাবে-(২)
রক্ষা পাইতে নাই শক্তি – ঐ

শোন তোরে কই বোকা বাউল
ও তোর কথায় কাজে রয়েছে ভুল
যদি দিতে হয় সেই ভুলের মাশুল-(২)
পাগল তারার নেই গতি।
কথা, সুর ও শিল্পী : পাগল তারা বাউল

৭. সংসারতাত্ত্বিক গান

মানুষ জাগতিক মায়ায় নিজেকে ও স্রষ্টাকে ভুলে গিয়ে, যা করার কথা তা না করে–বিবেকের বিরুদ্ধে সদা কাজ করে যায়। আর সেই কাজে থাকে অন্যায়, অপরাধ, ধোকাবজি এবং মানুষ ঠকানো। এই ঠকানোর মধ্য দিয়েই সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এতে আসলে পরকালের দীর্ঘ জীবনের কোনো অর্জন হয় না। তাই পরিশেষে মনে হয়, সবই ভুল। মনে হয়, জগত-সংসার, স্ত্রী-সন্তান কোনো কিছুই কাজে আসে না। এটিই হলো সংসারতত্ত্বের মূল কথা।

সংগৃহীত সংসারতাত্ত্বিক গান

১.

মাগো সেই যে গেলে আর এসে দেখলে না আমারে
আর এসে দেখলে না আমারে
তুমি কেমন আছ জানিতে
ইচ্ছে করে ও প্রাণের মাগো – ঐ

আগে যদি জানতাম খবর মাগো
শুক্রবারে যাইবি নায়র
জানলে কী আর যাইতে যাইতাম বাড়ি ছেড়ে – ঐ

যদি কোথাও যাইতাম চলে মাগো
বুক ভাসাইতে নয়ন জলে
বলতে তাড়াতাড়ি আসিও লক্ষ্মী ঘরে – ঐ

যেদিন হতে গেলে ছেড়ে মাগো
তোমার স্মৃতি কাঁদায় শুধু আমারে – ঐ
গভীর রাতে ঘুমে ছিলাম মাগো
স্বপ্নে তোমার দেখা পেলাম

www.pathagar.com

দেখি বসে আছ মাগো আমার শিয়রে – ঐ

নিদ্রা নাই মোর দুই নয়নে মাগো
তোমার বুকে কবে নিবে আমারে – ঐ

মায়ের আঁচলে জান্নাতের হাওয়া
ওসে হাওয়া অন্য কোথাও যায় না পাওয়া
জান্নাত হারা পাগল তারা সংসারে – ঐ

২.
টাকার পিছে ঘুরছে জনগণ
যারে বলি কেমন আছ,
সেই দেখায় শুধু টেনশন – ঐ

টাকা পয়সা না থাকিলে এই ভব সংসারে
আপন ভাই পর হইয়া যায় টাকার অহংকারে
ভাই পরিচয় দেয় না তারে পরিচয় রাখে গোপন – ঐ

এত যে আদরের স্ত্রী টাকা না থাকিলে
দুই একদিন পরে কথা গাল ফুলাইয়া বলে
টাকা কামাই করে হাতে দিলে
করে প্রেমের আলাপন – ঐ

আপন হয়ে বন্ধু বান্ধব আসে যারা কাছে
টাকা থাকলে সবাই আছে, না থাকলে সব মিছে
সব সম্পর্ক টাকার সাথে টাকা পয়সা মূল কারণ – ঐ

টাকা থাকলে হজ্জ করতে যায় মক্কা আর মদিনা
সকল গুনা মাফ করে দেন আল্লাহ সাঁই রাব্বানা।
টাকার জোরে মাফ হয় গুনা, এখানেও টাকার প্রয়োজন – ঐ

পাগল তারার পকেট খালি, নেই তো টাকা পয়সা
যেখানেই যাই ঘৃণার পাত্র, কেউ দেয় না ভালবাসা
হাতে না থাকিলে পয়সা হয় না তো সাধন ভজন – ঐ

৩.
আমি কী করিব-২
কোথায় যাব
দিশা নাহি পাই
কি করিলাম কার লাগিয়া
আপন কেহ নাই – ঐ

www.pathagar.com

যখন আমি শিশু ছিলাম
ছিলাম তখন ভালা।
মন আনন্দে মায়ের কুলে, থাকিতাম একেলা
আমার ভাই বেরাদর-(২)
করত আদর সকল জনাই
আমার চোখের পানি দেখে করিত হায় হায় – ঐ

দিন আর দিন দারুণ যৌবন আসিল দেহেতে
যৌবনের জ্বালায় আমি, পারলাম না কুলাইতে
আমার ভাব দেখিয়া- (২)
করাই বিয়া, পিতা আর মাতায়
আগে যারা আপন ছিল, পর হইয়া যায় – ঐ

দিন রাত পরিশ্রম করে করি উপার্জন
দুই চার দিন পেলাম হয়ত গৃহিনীর মন
হইলো মেয়ে ছেলে- (২)
নিলাম কোলে বুক ভরা আশায়
দূর দিনের সাথী এরা হবে দুনিয়ায় – ঐ

চুল পাকিল, দাঁত পড়িল হইলাম দুর্বল
স্ত্রী সন্তানের কাছে সাজিলাম ব্যাকুল
আমায় ঘৃণা করে- (২)
রাখে দূরে ফিরিয়া না চায়
আমাকে রাখিয়া দূরে কত কিছু খায় – ঐ

এত দিনে বুঝলাম আমি ওগো মালিক সাঁই
তুমি ছাড়া এই জগতে আমার কেহ নাই-
আমি যা করেছি ভুল করেছি রিপোর তাড়নাই-(২)
দীনহীন পাগল তারা ক্ষমা ভিক্ষা চায় – ঐ

৪.

ও তুই দিন কাটালি রঙ্গ রসে
শেষে হবে কী উপায়
সময় থাকতে পুঁজি কর
নইলে কিন্তু উপায় নাই – ঐ
আসার সময় 'কালু বালা'
প্রতিজ্ঞা ছিল তোমার
তুমি তো ভুলিয়া গেছ
হাদিসে তার রয় প্রচার

www.pathagar.com

ও তুই গুরু ভজবে বলে আইলি
সেই কথা ভুলিয়া গেলি
মিছে মায়ায় দিন কাটাইলি
শেষে করবি হায়রে হায় – ঐ

নিয়ে আইলি ষোল আনা হিসাব করিয়া
লাভ করিয়া দেশে যাবি
আসল ঠিক রাখিয়া
ও তোর লাভের খাতা শূন্য দেখি
আসল ক্যাশে, পড়ল বাকি
খাটিবে না ফাঁকি- ঝুঁকি
মহাজন ধরলে তোমায় – ঐ

কালো চুল সাদা হলো
ভেবে দেখ মন আমার
কলপ দিয়ে কালো করে
কয়দিন বেঁচে থাকবি আর
ও তোর চোখের পাওয়ার কমে গেছে
টাটকা চামড়া ঢিল হইতেছে
আয়ু বেলা ডুবে যাচ্ছে

সময় থাকতে সাধন কর
ওরে আমার মন পাগলা
শক্ত গুরুর ভক্ত হইয়া
জপ সেই নামের মালা
আসিলে শেষ পরওয়ানা
সেই দিন কেউ যামিন দিবে না
পাগল তারার এই প্রার্থনা-
খাও গুরুর নামের মিঠাই – ঐ

৮. গুরুতাত্ত্বিক গান

গুরুতাত্ত্বিক হচ্ছে এক ধরনের মুর্শিদি গান। বাউল গানের একটি শাখাও বলা যায়। কেননা বাউল গানে গুরুকে মুর্শিদ বলা হয়ে থাকে। গুরু বা মুর্শিদ ভক্তের নিকট শিক্ষকস্বরূপ। গুরুর কাছেই ভক্ত আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে থাকে। বাউল গানের আসরে সাধারণত গাওয়া হয় গুরুতাত্ত্বিক গান। গুরুর কাছে শিষ্যের কামনা থাকে তার মাধ্যমে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের।

www.pathagar.com

সংগৃহীত গুরুতাত্ত্বিক গান

১.

থাকলে ভক্তি পাবি মুক্তি
ভক্তি বিনে মুক্তি নাই
ভক্তের মুরশীদ বিনে আর ভরসা নাই – ঐ
লাভের আশায় ভবে এসে
ওরে মন মূল হারাইলি কালের বশে
বেলা শেষে কাঁদবি বসে- (২)
দেখবি পাশে কেহ নাই – ঐ

সকাল গেল দুপুর এল ওরে মন
এখন ও তোর ঘুম না ভাঙল
হইলে বিকাল, হবি নাজেহাল – ঐ
কই যাবি সন্ধ্যা বেলায় – ঐ

ঐ চরণে যার হলো স্থান ওরে মন
ভয় পায় না সে আল্লাহর জাহান্নাম
জমে তারে করে সালাম – (২)
পাগল তারার জনম বৃথায় যায় – ঐ

২.

ও তর মানব জনম কোথায় গেল
ও তুই সুক্ষ্ম মানুষ হইলি না (২)
একজন মানুষ বুঝলি না – ঐ

জন্ম লইয়া মানব কুলে রইলি পশুদের
দলে পশুর স্বভাব গেল না
ও তর অনুরাগের সময় গেলে শেষে কাঁদলে
দুঃখ যাবে না-(২) – ঐ

মানুষ হয় সৃষ্টির প্রধান কোরআনে
রয়েছে প্রমাণ ও তুই বুঝলি না
নাদান মানুষের জন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ
ও তুই সময় থাকতে খুজলি না-(২) – ঐ

জগতে যাহা দেখা যায় আছে মানুষের
দেহায় কোরআনে বলেছে মাওলায়
ও তর দেহ কোরআন পরে রইল
কাগজের কোরআন নিয়ে দেওয়ানা- (২) – ঐ
গুরুর কাছে যাইয়া দেহ কোরআন

www.pathagar.com

লওগা দিনিয়া ও সে দিবে দেখাইয়া
ও তর আপন দেহে আছে কাবা
মুর্শিদ ছাড়া কেউ বলবে না ও রে মুর্শিদ
ছাড়া তুই পাবি না – ঐ

পাগল তারা মিয়া কই ও তর ভজিবে সংশয়
ও তুই ভুজিবি নিশ্চিয় মানুষ কে ভজনা
করলে ও তুই পারিবে সাই রাব্বানা – ঐ
কথা, সুর ও শিল্পী : পাগল তারা বাউল

৯. শরিয়তি গান

শরিয়ত হলো আল্লাহ ও রাসুল (সা.)-এর আইন—যা জাহির বা প্রকাশ হয়েছে মানুষের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণের জন্য। নবী করিম (সা.) বলেছেন, শরিয়ত হচ্ছে আমার জবান। সুতরাং তাঁর আইন, বিধান বা হুকুম পালন করা সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। উল্লিখিত বিষয়ে রচিত ও গাওয়া যে গান, সেগুলোই শরিয়তি গান। এই গান বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো শেরপুরেও বাউলরা শিল্পীরা এই গান বহু সময় ধরে পরিবেশন করে চলেছেন।

সংগৃহীত শরিয়তি গান

১.
শরিয়ত তুই না জানিয়া লাভে মূলে সব
হারয়েলে হাদীস কোরআন ছেড়ে দিয়ে
লাভ কিরে ভণ্ডামী করলে
ত্রিশ হাজার আছে জাহেরে নবীর
আইন অনুসারে ইহার বেশি বলিস নারে
নিষেধ আছে দলিলে – ঐ

আল্লাহ নবীর কথা ধর কালিমা
নামাজ রোজা কর। হজ্ব কর আর
যাকাত কর ইহাকে শরিয়ত বলে – ঐ

শুধু কালিমাতে কাজ হবে না ঠিক রাখিও
পঞ্চবেনা ভুল করিলে মরবিরে তুই
দয়াল নবী গেছেন বলে – ঐ

তালি বালি শয়তানি ছেড়ে দিয়ে
আয় চলে নবীজীর দলে – ঐ
তারা মিয়ার এই প্রার্থনা নবী তুমি

www.pathagar.com

ভুলে যাও না তুমি দয়া না করিলে
উপায় নাই নিদানের কালে – ঐ

২.
নবী মরে নাই মরে নাই মরে নাই
হায়াতুল মুরসালীন নবী কুরআনেতে প্রমাণ পাই – ঐ

নবী বিশ্ববাসীকে ফাঁকি দিয়া
মদিনায় আছেন শুইয়া
উম্মতি উম্মতি কইয়া নয়ন জলে বুক ভাসায়
মরা মানুষ কাঁদিতে পারে? তোমরা নি কেউ দেখছ ভাই – ঐ

নবীর আশেক যাইয়া রওজার পাশে
সালাম দিলেই জবাব আসে
মরা মানুষ কথা বলে আমি তো আর শুনি নাই – ঐ

নবীর এক ভক্ত ছিল নবীর রওজা জিয়ারতে গেল
নবীর রওজার পাশে বসে নয়ন জলে বুক ভাসায় – ঐ

রওজার পাশে বসে করছে রোদন
দীনহীনের এই আকিঞ্চন
আপনার হাতের সাথে হুজুর আমার হাত মিলাতে চাই – ঐ

শেষ হইল যখন মুনাজাত
নবী রওজা থেকে বাহির করলেন হাত
নবীর হাতে হাত মিলায়া মনানন্দে প্রেম খেলায়
পাগল তারা এই মিনতি
আপনি ছাড়া নাই মোড় গতি
শেষের দিনে হবেন সাথী মিনতি আমি জানাই – ঐ

৩.
আল আরাবী ইসলাম রবি
হাজার ছালাম তোমায় – ঐ

আউওয়ালু মাখালা ক্বাল্লাহু মিন নূরী
প্রমাণ রই হাদিস বুখারী
তোমায় প্রথম সৃজন করি

তোমায় সেই পবিত্র নূরে,
এই ত্রিভুবন সৃজন করে
নবীগণের সর্দার করে
পাঠাইলেন আল্লাহ তোমায় – ঐ

www.pathagar.com

আদি হইতে অনন্তকাল
মিলে না সেই রূপের মিছাল
পাপি তাপি উদ্ধারীতে
আসলে তুমি এই ধরায় – ঐ

পাগল তারা তোমায় পাইবার আশে
ঘুরিতেছে বাউল বেসে
তুমি ছাড়া আর কে আছে
আমার শেষ পাড়ের বেলায় – ঐ

৪.

নেই কেহ নেই আল্লাহ ছাড়া
লা ইলাহ ইললাল্লাহ
ভুল করই নারে পড়তে লা ইলাহ ইললাল্লাহ

আদি হতে অনন্তকাল
ছিলেন আছেন থাকবেন বহাল
যে জন সেই নামের কাঙাল
থাকে না ভবের জ্বালা – ঐ

অসীমের অশেষ দয়ায়
দিন কাটালি মিছে মায়ায়
ওরে আমার মন ভুলা – ঐ

যাহার জায়গায় বেঁধেছ ঘর
তারে কেন ভাবিলে পর
যাহা খেয়ে প্রাণ বাঁচে তোর
সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহ – ঐ

পাগল তারার স্বভাব দোষে
হারাইয়া ধন কাঁদে বসে
পাইয়া না যারে ভালবাসে
সেই কারণে হয় দেউলা – ঐ

১০. প্রেমতত্ত্বের গান

প্রাথমিকভাবে প্রেম পাঁচ প্রকার। প্রথমত: বাৎসল্য প্রেম। পরিবারের সকলের সঙ্গে অর্থাৎ পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তান, চাচা-চাচি, খালু-খালার সঙ্গে যে প্রেম, সেটিই হলো বাৎসল্য প্রেম। দ্বিতীয়ত: দাস্যপ্রেম। শিক্ষাগুরু, মুরুব্বি, গুরুজন অর্থাৎ সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যে প্রেম, তাই-ই হলো দাস্যপ্রেম। তৃতীয়ত: সুখপ্রেম। সুখপ্রেম হলো–নিষ্কলঙ্ক প্রেম, যাতে আল্লাহ ও নবীজিকে পাওয়ার প্রেম, যার

www.pathagar.com

মাধ্যমে নিজেকে পাওয়া যায়। চতুর্থতঃ মধুরপ্রেম। স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রেমকেই মধুরপ্রেম বলা হয়। পঞ্চমতঃ শান্তপ্রেম। শান্তপ্রেম হলো–সবার সঙ্গে নিজেকে শান্তপ্রিয় রাখা, সবার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করা, কখনো কোনো বিষয়ে উত্তেজিত না হওয়া। উল্লিখিত পঞ্চপ্রেম নিয়ে মানুষের জীবন চলা। প্রেমতত্ত্বের মূলকথা হলো–প্রেমের মাধ্যমে মানুষ যাকে কামনা করে, তাকে পাওয়া সম্ভব। যেমন–কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য রাধার যে প্রেম। স্রষ্টাকে পাওয়ার জন্য কেউ কেউ প্রেমে মগ্ন হয়। এইসব নিয়েই প্রেমতত্ত্বের গান।

সংগৃহীত প্রেমতত্ত্বের গান

১.

প্রেমের কাঁটা ঠিক রাখিও মন
কামের লোভে প্রেম করিলে
সেই প্রেম হয় ভূতের কীর্তন – ঐ

নেছাকে দেখিয়া যদি তোর প্রেমের কাটা ঠেলে
খোদার কসম গড়বি ধরা ছুকরাতের কালে
ও তোর যোগ-বিয়োগ ঠিক না থাকিলে
অনলে হবি দাহন – ঐ

কুমারে মাটি চিনে বানাইতে হাড়ি
মনের মত ভক্ত পাইলে গুরু হয় কাণ্ডারী
পাইলে সুজন বেপারি আদর করে মহাজন – ঐ
চণ্ডীদাস রজকিনী শিরি ফরহাদ ইউসুফ জুলেখা
লাইলী প্রেম করেছিল মজনু হয় তার শাখা
লাইলীর কুকুরকে ধরিয়া মজনু করেছে কত রোদন – ঐ

সূক্ষ্ম, শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর এই তো প্রেমের ধারা
পঞ্চ রসের রসিক পাইলে প্রেম করিও তোমরা
ভাবনা জেনে প্রেম করিলে হয় না প্রেমের আলিঙ্গন – ঐ

যার ভিতরে প্রেম নাই সেই মানুষটা মরা
প্রেম বিহীন হৃদয় আমার ভুল করিস না তোরা
প্রেমের ভাব ধরিয়া পাগল তারা করে গেল কত ঢং – ঐ

২.

ভাবুক জনায় প্রেম করিলে রে
সেই প্রেমের কলংক রটে না
প্রেমের ভাব ধরিয়া

www.pathagar.com

কামুকে করে কাম সাধনা – ঐ

প্রেমিকের প্রেম অমূল্য রতন
প্রেমের কারণে সৃষ্টি হয়েছে ভুবন
ও প্রেম জানে যে জন
রশিক সুজনরে
সেই প্রেমে মিলে সাঁই রাব্বানা – ঐ

কি বলব ভাই প্রেমের ইতিহাস
গর্ভবতী হয় প্রেমিকা
না যাইতে কয়েক মাস
করলি কত শিশুর প্রাণ সর্বনাশ রে
তোদের জাহান্নাম ঠিকানা – ঐ

তোদের চেয়ে ভাল জানোয়ার
সন্তান জন্ম দিয়ে তারা
সেবা করে তারা
ঐ বনের পশু ধর্ম মানে রে
তোরা মানুষ হয়ে মানলি না – ঐ
পাগল তারা কয় বিনয় করে
আছ যত পুরুষ নারী এই সংসারে
তোমরা অবৈধ প্রেম আর কইর নারে
আমার রইল এই প্রার্থনা – ঐ

১১. বয়াতি গান

লোক-কাহিনিভিত্তিক গানই হলো মূলত বয়াতি গান। যেমন–বানেছাপরি, হুরমোজ বাদশা, কালু গাজি, হাসান-হোসাইনের ইতিহাস, কারবালা কাহিনি, সয়ফুল বাদশা, ইউসুফ-জুলেখা, লাইলি-মজনি, শিরি-ফরহাদ, চণ্ডিদাস-রজকিনি ইত্যাদির কিস্‌সা বা কাহিনি বয়াতিরা সুরে, তালে ও নেচে পরিবেশন করে। শেরপুর অঞ্চলে মকবুল বয়াতি, জিয়ার আলি বয়াতি, হাশমত আলি বয়াতি প্রমুখ বয়াতি সমকালীন সময়ে গান করে বয়াতি গানকে বিখ্যাত করেছেন।

সংগৃহীত বয়াতি গান

১.
কি যাদু করিলে আমায় সোনা বন্ধুরে
জাতি-কুল ছাড়িয়া কলঙ্কিনী হইয়া
থাকি চাহিয়া তোমার আশায় ॥

www.pathagar.com

মধুর বুলি বলে নিল কোলে তুলে
এখন তুমি কেন ফেলে গিয়াছ আমায়
আমার বুকে আসন করে
ভাণ্ডের মধুর নিলে হরে
জীবনে মারিলে আমায়॥

আগে তো না জানি করিবে বদনামী
তবে কী আর আমি যৌবন দিই তোমায়
যদি লয় তোমার মনে দেখা দাও দুই নয়নে
অভিমানে আছে শ্যামরায় ॥

হৃদয় করে চুরি সাজালে ভিখারী
কেমনে পাইরে ভোলা নাহি যায়
তোমার প্রেমে মজিয়া বাউল তারা মিয়া
কুলের বাহির হলো এ ধরায় ॥

২.

সখীরে আর কী বন্ধু আসবে ব্রজপুরে.. রে-
ব্রজ ধাম করে গিয়াছে মথুরা
বৃন্দের নিকুঞ্জে আছে আমার মন চোরারে
কত সখী লক্ষপতি থাকে ঘরে ঘরে
আমার কী আর লয় না মনে প দেখাতাম তারে রে।
কত জ্বালা আছেরে সখী আমার অন্তরে
আজ নিশিতে আগলে রাখতাম বুকের উপরে

বাউল তারা বলে যৌবন গেল ভাটা পড়ে
আসলে না মোর যৌবনকালে আসবে কী মরিলে—রে।

৩.

কোকিল রে কেন ডাকছ কোকিল
কদম্বের ডালে বসিয়ারে
বসন্তের জোয়ারে কোকিলা ডাকছ বিভোর হইয়া
মনের আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ তোমায় ডাক শুনিয়া রে।

বর্ষাকালে মেঘে যেমন আকাশ থাকে ছাইয়া
মুই অভাগী তেমনে থাকি
ভরা যৌবন লইয়ারে
কত দেশে যাওরে কোকিলা
পাখায় ভর করিয়া

www.pathagar.com

কোথাও কী দেখেছ আমার
প্রাণ বন্ধু কালিয়া রে
অনেক দিন হয় প্রাণ কালিয়া
গিয়াছে ছাড়িয়া
প্রেম হুতাশে কাঁদে বশে
বাউল তারা মিয়া রে।

৪.

নববর্ষের পদার্পণে কী আনন্দ জনমনে
তোমার সঙ্গে করি আলিঙ্গন করো গ্রহণ
সুখময় হোক তোমার আগমন।

হে আগন্তুক অতিথি জানাই তোমায় প্রণতি
বছর অন্তে মোদের সাথী হয়েছে যখন
জাতি ধর্ম নির্বিশেষে
হৃদ আকালে জাগে শিহরণ।

তোমা কী মায়া ভরা তে কুলবধূ গৃহহারা
বসুন্ধরা আনন্দে মগন
ষড়ঋতুর আদি অংশে
গ্রীষ্ম মাসে এলে নেমে হেসে
চৌদ্দ সাত দশ বাংলা সন।

তোমায় নিয়ে করি খেলা
বৈশাখি নামেতে মেলা
উলামেলা বিপুল আয়োজন
আয়োজনে আছেন যারা মহাপুণ্যবান তাহারা
বাউল তারা জানায় অভিনন্দন।

৫.

মানুষ হতে চেয়েছিলাম
কেন বিধি হলে বৈরী
আমার আশা তে হইল নৈরাশা
নয়ন জলে ডুবে মরি।

মনে বড় ছিল আশা সুখে থাকব সংসারে
সকল আশা বিকল হল
পড়িয়া মায়ার ফেরে
আমার সকল হলো কর্ম
এখন গলায় কলঙ্কের ডুরি।

www.pathagar.com

আশার আলো দেখেছিলাম
ছিল মোর মাতা পিতা
মেঘাছন্ন করে ছেড়ে গিয়েছে জন্মদাতা
এখন কার কাছে কই মনের ব্যথা
নাই দরদী জগত জুরি ।

তুমি কাউকে কর জজ মিনিস্টার
কাউকে ঘুরাও রাজপথে
কাউকে খাওয়াও সোনার থালায়
কেহ মরতেছে ভাতে
কেহ অন্ধ আতুর এ ধরাতে
কেহ ঝুলি কাঁধে হয় ভিখারী ।

তোমার দয়ার আশায় থেকে
হলো মোর জীবন সারা
বাদ্যযন্ত্র হাতে লয়ে ঘুরে বেড়ায় তারা
আমি জ্যান্ত থাকলে হলেম মরা
না লয় মনে ঘর বাড়ি ।

৬.

কখন যেন যায় যে উড়ে আমার
এ দেহের পাখি
আমি যারে যতনে রাখি ।

কেটে সকল মায়া বেড়ি
অচিন দেশে দিবে পাড়িরে
তবে কিসের বাহাদুরী
মন একবার ভাব দেখি ।

খেয়ে কত ভাল খানা
তুব পাখির মন উঠে নারে
করে যে কতই ছলনা
দিতে সে ফাঁকি ।

পাখির অন্তরে একি জ্বালা
তা ভেবে মোর মন উতলা রে
বাউল তারা মিয়ার বিদায় বেলা
আর কত দিন বাকি ।

৭.

নূর নবীজি বেলায়েতে রেখে গেছে তার বিধান

হযরত আলী পহেলা জারী
দ্বিতীয়তে খাজা হাসান বসরী
ওয়াজেদ বিন জায়েদ প্রকাশ করি
তৃতীয়তে যাহার স্থান।

চতুর্থে মৌলবী ফজল বিন আয়াজ
পঞ্চমে ইব্রাহীম আদহাম ছেড়ে শাহী তাজ
করেছে আল্লাহ রাছুলের কাজ
ত্যাগ করে সব শান্তি প্রাণ।
নবমে খাজা নাসিরুদ্দীন আবু মোহাম্মদ চিশতি
দশমে নাসিরুদ্দীন আবু ইউসুফ সুখ্যাতি
কর্মফলে পাবে মুক্তি ভয় কী হাশর মিজান।

একাদশে হযরত খাজা ইসহাক চিশতি
দ্বাদশে হযরত খাজা মৌদুদ চিশতি
অসংখ্য নবীর উম্মতি গোনাহ্ করেছে আছাম

ত্রয়োদশে খাজা হাজী শরীফ জিন্দালী
চতুর্দশে খাজা ওসমান হারুনী
বাউল তারা কয় ইতি টানী পরে মইনুদ্দীন হাসান।

৮.

ভক্তের অধীনে খাজা ডাক দিলেই পায় খাজারে
সে ডাক দিলেই পায় খাজারে
খাজার নামের প্রেমিক যে জন হলো সংসারে।

ভবে যত খাজার আশেকান
অলি আল্লাহ মরে না তা কোরআনে ফরমা।
করতে ভাবের আদান প্রদান স্থান
লয়েছে কবরে।
বলে গেছে খাজার জবানে
যেজন মিশে আছে তাহার রূপের গুণে
দয়াল খাজা নিজ গুণে
পার করে নিবে তারে

রাজা বাদশাহ করে আগমন
ভক্তি ভরে কতই করে খাজাকে স্মরণ
পেয়েছে খাজার প্রেমালিঙ্গন
বাউল তার সে চরণ আমায়
বুভুক্ষ হৃদয় নিয়ে আছি এ ধরায়

www.pathagar.com

কাঙাল জেনে দয়াল আমায়
দিও না ফেলে দূরে ।

৯.

পরাণ ভরে গাও হে খাজার গুণগান
ভবে আছ যত খাজার আশেকান ।

মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর
রোগগ্রস্তে হইয়া অস্থির
দরবারে খাজার হয়ে হাজির
পেলেন তিনি পরিত্রাণ

খাজার প্রেমে করে দেন যে জান কুরবান
সাইয়েদিনা মীর আবুল উলা
খাজার নামের ছিল পাগেলা
কবর ছেড়ে খাজারে মাওলা
দেখা দিয়া জুরায় প্রাণ...
বেহশতের সওগাদ তারে করলো ।
হে দয়াল খাজা মাঈনুদ্দীন
আমি হই চরণের অধীন
কয় বাউল তার ধীনহীন
চরণ তরী কর দান
তোমার চরণ আশায় আছি পেরেশান ।

১০.

গরীব নেওয়াজ খাজা আজমীরে হয়েছ রাজা
তোমার প্রজা করো আমারে
এই মিনতি তর দরবারে ।
তুমি প্রভুর নামটি করে সম্বল
হিন্দুস্থান করেছ দখল
পেয়েছে সুফল ইসলাম প্রচারে ।

খাজা গিয়া মদিনাতে সালাম দাও নবীর রওজাতে
রওজা হতে জানায়ে তোমারে
রব খুশী হয় তোমার প্রতি
চল খাজা শীঘ্র গতি
লহ স্থিতি গিয়া আজমীরে
হুকুম পেয়ে সেথায় গেলে
কত কষ্ট তাতে পাইলে
সব সহিলে পরাণ ভরে

www.pathagar.com

তোমার ভক্তগণ মঞ্চের সহচর
সামনে পেলে আনা সাগর
নাও অবসর সাগর কিনারে।
হিন্দু রাজা পৃথ্বিরায় ঘৃণার চোখে দেখে তোমায়
তাড়াতে চায় আত্ম অহংকারে
শোনে আজানের ধ্বনি থৈ থৈ করে গাঙ্গের পানি
মেদিনী কাপে থরে থরে।

১১.

মারহাবা ইয়া গাউসুল আযম আবদুল কাদির জিলানী
প্রেমের খেলা খেলেছ তুমি এ ভবে দিনরজনী
জ্ঞানের সন্ধানে বের হয়ে বাগদাদে যাওয়ার কালে
বিপদগামী হলে তুমি মরু দস্যুর কবলে
নিদান কালে রক্ষা পেলে প্রচারে সত্য বাণী।
দস্যুগণে ঈমান এনে ছেড়ে দেয় রাহাজানী।

মোবারক বিন আবুল মাহফুর এক মহাযাদুকরে
যাদু বিদ্যার পুথি একটি আনে তব হুজুরে
তুমি তাহা দেখার পরে হয়ে যায় কোরআন খানি
ছেড়ে শিরক সেই মোবারক পায় জীবনের আছানী

রাছুছুল্লার প্রিয় পত্নী ছিল আয়েশা সিদ্দিকা
প্রেম সোহাগে স্বপ্ন যুগে পেলে তুমি তার দেখা
তোমায় কোলে নিয়ে সিদ্দিকা স্তনের দুধ খাওয়ান তিনি
দৈবশক্তির বলে তুমি হলে মারফতের খনি
শয্যাশায়ী হলে তুমি রূপের বাহার করে
তোমার পবিত্র প্রশ্রাব পরীক্ষা করে ডাক্তারে
কস্তরী মেখে অম্বরে মোহিত করে সেই পানি
তার সুঘ্রাণে ঈমান আনে চার'শ লোকে তখনি

মাহে রমজানেতে তোমায় ইফতার করানোর আশায়
ভক্তি ভরে দাওয়াত করে একুনে একাত্তর জায়গায়
রক্ষা করলে কী মহিমায় জানে তা কাদেরগনি

এইভাবে আর গাহি কত তোমার অলিত্বের শান
মুর্দাদের ভিতরে তুমি এনে দিলে বহু প্রাণ
অলি কোলের তুমি প্রধান শদ বিস্তার তোমার জীবনী
বাউল তারা বলে নিদান কালে চাই তোমার স্নেহের বাণী।

www.pathagar.com

১২.

কেমনে বসাইলে খঞ্জুর সীমার হোসেনের গলে
সীমার ফোরাত নদীর কুলে।

অর্থের লোভে পাপে ডুবে যে কর্ম করিলে
এই অর্থে কী দিবে মুক্তি
সীমার কঠিন পরকালে

পানির পিপাসায় হোসেন
নামলে ফোরাত জলে
পরিজনদের বিয়োগ ব্যথা
ওহায় ভেসে উঠে দ্বীলে

কিনারায় উঠিয়া হোসেন জেরাপুষ খুলে
উড়ন্ত বিষের তীর
বিধে গ্রীবা মূলে।

বিধির লিখন হয় না খণ্ডন
যা লিখা কপালে
বাউল তারা দিশাহারা দয়াল ও
হায় ভাসে নয়ন জলে।

১৩.

নাই দরদী আমার নাই এ ধরায়
আমি মনের দুঃখ আজ বলবো কারে
নাই কেউ ধারে শেষ বেলায়।

অলিদের তীরাঘাতে হোসেন লুটায় ভূমিতে
ওরে ফোরাত ভূমি লাগলো কাঁপিতে
উঠলো ধ্বনি চারদিক হতে শুধুমাত্র হায় হায়।

হোসেন দেখলো এক নজর সীমারের হাতে খঞ্জুর
সীমার বসালো হোসেনের ছাতির উপর
দারুণ তীরাঘাতে কেঁপে অন্তর
হোসেন সীমারকে জানায়।

হোসেন কয় পরান খুলি ভবে থাকলে মোর আলী
উড়াতো সীমার তোর মাথার খুলি
তোমার এহেন বীরত্বের বুলি
লুণ্ঠিত হতো ধুলায়।

www.pathagar.com

কৃপা দিষ্টিতে তাকাও সীমার বক্ষ ছেড়ে যাও
আমায় নিঃশ্বাস ফেলতে দাও
আমার নয়ন ভরে দেখিতে দাও দ্বীনের নবী মস্তোফায়।

সীমার শোন দিয়া মন উঠাও তোমার বক্ষের বসন
দেখে শীতল করি দুই নয়ন

আমার নানা জনের মুখের বচন
দেখে লই তোমার ছিনায়।

দেখে বক্ষের লক্ষণ হোসেন বুজে দুই নয়ন
বললো তোমার হাতেই মোর মরণ
তোমার যা লয় মনে কর
এ জান তাতে নাই মোর অভিপ্রায়

কত প্রচেষ্টা তোমার বৃথায় যাচ্ছে
ভাই সীমার কেন যে বন্ধ হয়
খঞ্জরের ধার অতি সোহাগ ভরে
দ্বীনের চুম্বন দেন আমার গলায়।

হয়তো সেই জাতির তোমার খঞ্জর
যায় দিবে সীমার চালাক
খঞ্জর আমার গ্রীবার উপরে।
আমি শেষ বিচারে নিব
তোমারে সাথে করে বেহস্তখানায়।

বিধির মহিমা অপার লেখা
বড় ভার খেলা যে বুঝেছে
সে হয়েছে পর
বাউল তারা মিয়া চাহে
উদ্ধার সেই উছিলায়।

১৪.

কেন আগুন দিলে সুখের ঘরে প্রাণবিদরে
কেন আগুন দিলে সুখের ঘরে।
আজ কেন জয়নাবের মন ছটফট করে।
তালাক নামা পেয়ে জয়নাব চোখের পানি ছেড়ে
হায় পতি হায় পতি বলে বেহুস হয়ে পড়ে।

কি দোষে হয়েছে দুঃখি না জানে অন্তরে

www.pathagar.com

স্বামীহারা জ্যান্তে মরা কপালে হাত মারে।

পাড়া পড়শী প্রতিবেশী সবাই হায় হায় করে
সতী নারীর এই কী গতি বলে সমস্বরে।

এজিদের ভগ্নিপতি হবে আশা করে
নিজের পায়ে মারলো কুরাল আবদুল জব্বারে।

জ্বলন্ত বিচ্ছেদের আগুন বক্ষে ধারণ করে
বাউল তারা বলে জয়নাব চলে পিতামাতার ঘরে।

১৫.

জন্মভূমি বাংলা তুমি মহাপুণ্যবান
ধন্য তোমার দামাল ছেলেরা যারা মুক্তি নওজোয়ান

উনিশ শ'একাত্তর সনে পাকহানাদার আক্রমণে
ওরা চেয়ে তোমার মুখের পানে
সঁপেছিল তাদের প্রাণ।

কিনা করেছিল পাষাণ্ডেরা বন্দুক কামান বুলেট দ্বারা
মাগো তোমার সন্তানেরা হয়েছিল পেরেশান।

মাতৃভক্তি রেখে মনে বন্ধু রাষ্ট্রের প্রশিক্ষণে
ওরা চালায় কৌশল সঙ্গোপনে
চালায় গেরিলা তুফান।

বাংলা মায়ের দামাল ছেলে কসাইদের পরাস্থ্ করে
মহান ষোলই ডিসেম্বরে
উড়ায় বিজয় নিশান।

স্রষ্টার অপার পরিহাসে বাংলা নামে দেশটি আসে
বাউল তারা মনোল্লাসে গাহি মুক্তিসেনার গান।

১৬.

পেলাম স্বাধীনতা আমরা পেলাম স্বাধীনতা

এই স্বাধীনতার করুণ স্মৃতি
বাঙালির হৃদয়ে গাঁথা।
উনিশ শ' বায়ান্ন সনে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে
কুচক্রী শাসকগণে দেখায় তাদের ক্ষমতা
সারা পাকিস্তানে হবে উর্দুভাষার কথা

www.pathagar.com

শোনে বাঙালিদের প্রাণে বেড়ে গেল অস্থিরতা।

এ বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠায়
সালাম বরকত নিল বিদায়
রফিক কী আর আসবে ধরায়
খুলে চোখের পাতা
বাংলার বুদ্ধিজীবী যারা করে বিরোধিতা
সহসায় কী মেনে নিবে কসাই জাতির অধীনতা।

বাঙালির দুঃখের নাই শুমার
একাত্তরে পাক হানাদার
বাংলাকে করিতে সংহার চালায় বর্বরতা
জীবনকে বিপন্ন করে এ বাংলার জনতা
কেহ ভাইভগ্নি হারা কারো গেল মাতা-পিতা।

বিধাতার করুণার জোরে
রক্ষা পেলাম ন' মাস পরে

পাক হানাদার গেল হেরে
খেয়ে পলোর জাতা
ষোলই ডিসেম্বর অমর হোক কয় বাংলার জনতা
মাতৃভূমির পদতলে বাউল তারা নোয়ায় মাথা।

১৭.

ভেঙে যাবে রঙ্গের বাজার ভেবে দেখ মন এক নিমিষে

সমন নিয়ে এলে প্রিয়া মায়ার বাধন যাবে খসে।
ধন্য জনম মানব কোলে ভাগ্যের গুণে পেয়েছিলে
মিশে কুলক্ষীর দলে শোন দিন গেল বেহুশে।

মহাজনের পুঁজি নিলে লাভের আশায় ভবে এলে
গড় হিসেবে কমতি হলে হস্তপদ বাঁধবে কষে।

কেঁদে বাউল তারা বলে মুরশিদ চান্দের চরণতলে
আমার ঘোর নিদান কালে পদছায়া দিও দাশে।

১৮.

একদিন ভেঙে যাবে এই বাজার বাজারী হুশিয়ার
বাজারী তো এসে ভবে জিব্রাইল সরম ভরম নিবে তুলে
সুভাস ফুলে না রহিবে আর

www.pathagar.com

শেষবারে আসিবে যখন

উঠাইবে কোরআনের লিখন
ছিল যেমন হস্ততে সওয়ার ।

বাজারী গো বলবো আগে পরোয়ারে
ডেকে ইস্রাফিলের তরে
ধ্বনি সুরে করিতে প্রচার ।

বাজারী গো ইস্রাফিল যেমন রেফারী
ফুঁকতে যখন বাঁশরী
সোনারপুরী হইবে মিছমার ।

বাজারী গো প্রবল বাতাসের জোরে
উড়বে মাটি শূন্যের ভরে
চারিধারে বাতাসের ছোঁয়ার

বাজারী গো বাউল তারা সদায় ভাবে
দায় ঠেকিলাম এসে ভবে
ভাই লাভে দিন গেল আমার ।

১৯.

অচেনা এক তোতা পাখি বিরাজ করে পিঞ্জিরায়
কখন পাখি দিয়া ফাঁকি কোন সুদূরে উড়ে যায় ।

নাম শুনি দেখি নাই যারে আসিল সে প্রবাসে
আমার ঘরে বিরাজ করে যাবে উড়ে কোন দূরে
হৃদয় পিঞ্জরে পোষে শেষে করবো হায়-হায় ।

যাবে যদি নিষ্ঠুর পাখি এতিম করে আমারে
তবে কেন করলে বাসা এ মাটির মন্দিরে
পাখি তুই কাঁদাইশনা মোরে ধরিরে তোর রাঙা পায় ।

অনুমানে বুঝি আমি তোর হৃদয় অতি পাষাণ
অধরাকে ধরতে গেলে অতি বেড়ে যায় তার মান
যাবে উড়ে যারে বেঈমান দুঃখে তারা দিন কাটায় ।

২০.

ভুলিতে পারি না চন্দ্রমুখ তারে না হেরিলে মরিরে
আপন হবে মনে ভেবে মজিলাম তার প্রেমে

www.pathagar.com

এখন কেন হয় কলঙ্ক মধুর প্রেমের নামে
লোকে বলে গ্রামে গ্রামে আমি বন্ধের প্রেম ভিখারীরে ।

এ জগতে যে যার সাথে করছে ভালবাসা
সে বিহনে চায় না মনে লক্ষ টাকা পয়সা
অন্তরে তার রয় পিপাসা পেতে বন্ধের চরণ তরীরে ।

বাউল তারা তন্দ্রাহারা না দেখে উপায়
বন্ধের নামের মালাখানি পড়েছি গলায়
আমি উঠে ইদ্রিসের নৌকায় দিব অকুল সাগর পাড়িরে ।

২১.

দয়াল ভাণ্ডারী জ্বালো তোমার নূরের বাতি মোর অন্তরে
দ্বীলের আঁখি খুলে দাও তোমায় দেখি নয়ন ভরে ।

তুমি যে করুণার সাগর ডাকি তোমায় হয়ে কাতর
উঠাও আনন্দের ঝড় আমার হৃদয়ে আশন করে ।

তোমার নামের গুণ গাহি বেহেস্ত দোযখ না চাহি
কত পাপী তাপি পাবে মাফি তোমার নাম তছবী করে ।

তোমার নূরের রওশনীতে দ্বীলের মায়া যাবে তাতে
ফুটবে হাসি দ্বীলকাবাতে মহানন্দের সম্ভারে ।
শেষ নবীর মহান আদর্শে উদয় হলে বাংলাদেশে
মোহাম্মদের নাম রহস্যে গাউসুল আজম নাম ধরে ।

কেঁদে বাউল তারা বলে গাউস বাবার চরণ তলে
সহায় থেকো নিদান কালে দিও না ফেলে দূরে ।

তোমার দয়ার আশায় থাকি আমাকে দিওনা ফাঁকি
যাবে যখন প্রাণ পাখি তুমি থেকো শিয়রে ।

২২.

দেহ মন প্রাণ সপিলাম চরণে তোমার
যা লয় মনে করো তুমি শফিউল বাসার ।

আমার তো কিছুই দেখি না বাবা তোমার ষোল আনা
বিনামূল্যে বেচাকেনা তুমি দোকানদার ।
কি ফুল ফুটালে সংসারে তার সুগন্ধে মনোহরে
কত ভ্রমর আসে উড়ে হয়ে বেকারার ।

www.pathagar.com

পাপীদের তরাবে বলে মাইজভাণ্ডারে তুমি এলে
কেঁদে বাউল তারা বলে ভরসা তোমার ।

২৩.

মায়াজালে দিন কাটালে না গেলে তুই মাইজভাণ্ডার
সময় থাকতে হওরে মনা হুঁশিয়ার ।

ভাণ্ডারেতে দিবারাতে হইতেছে নূরের খেলা
যে দেখেছে নূরের ঝলক দূরে গেছে ভবজ্বালা
সৈয়দ আহম্মদউল্লাহ বসাইছে প্রেমের বাজার ।

সঙ্গের সাথী কেউ হবে না আসিলে তোর ঘোর নিদান
নিদানের কাণ্ডারী তোমার সৈয়দ গোলামুর রহমান
শেষ গুদারা নিয়ে খাড়া সৈয়দ শফিউল বাশর ।

সবকিছু হারাইলাম পাইতে চরণ আশা
অধম জেনে লওহে টেনে রেখে ভালবাসা
বাউল তারা বলে মরণকালে পাই যেন মাওলার দিদার ।

২৪.

আমি লাভের আশায় ভবে এসে
হারাইলাম ষোল আনা
এখন কী করিব কোথায় যাব রে
আমার ভবে নাই কেউ আপনা ।

আমি ভবের হাটে আশার কালে
কি যেন এসেছি বলে
মনে বেশি পড়ে না
আমর শুধু মাত্র মনে জাগেরে
দয়াল আমি তোমায় ভুলব না ।

আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম যারে
কে পাঠায় ভবের বাজারে
চেনা তারে হলো না
তারে চেনার পথে বাদী সাথে রে
উড়ে চলে উড়ে ষোলজনা ।
আমি এসে এ মায়ার বাজারে
পড়িয়া কামিনীর ঘোরে
পথের দিশা পেলাম না

www.pathagar.com

এখন যে দিকে চাই ঘোর অন্ধকাররে
আমার ঘরে প্রদীপ জ্বলে না ।

আমার আর কিছু ধন নাই ভরশা
শেষ পাড়ে মুর্শিদের আশা
নৈরাশা কইরো না
বাউল তারা বলে ঘাটে গেলে
আমায় দূরে ঠেলে দিও না ।

২৫.

তোমার নামে ভাঙা তরী ওরে দয়াল ভাসাইলাম সাগরে
আমার লয়ে যাও সে পাড়ে উঠেছে তুফান ভারী এ ভব সাগরে
এ তরী কী মারা যাবে দয়াল ঘূর্ণিপাকে পড়ে রে দয়াল ।

পাপে বোঝাই জীর্ণ এ তরী পরাণ কাঁপে ডরে
পালের রশি কাটে সদায় তোরে দয়াল
তরীর ছয় ইঁদুরে দয়াল ।

মাঝি মাল্লা দিচ্ছে পাল্লা ভরাডুবির তরে
বাউল তারা বলে নিদান কালে ওরে দয়াল
মুর্শিদ নাম অন্তরে রে দয়াল ।

২৬.

খুঁজিস কারে ও পাগল মন
সহজে কী পাবে তারে ভব সাগরে মানিক রতন ।
কোথায় সে করে বসত
বাগদাদ কী আজমিরে হয়তো
সিলেট কী শাহপরাণে নয়তো
মদিনাতে আছে গোপন ।

জালাল তৈয়ব চাঁন ও দূরবীন
ইদ্রিস গুরু রশিদ উদ্দীন
খুঁজে তারে হলো বিলীন
সিরাজ শাঁই ও ফকির লালন ।

সেতো নয় পাহাড় প্রান্তরে
দেহের কোণায় বিরাজ করে
বাউল তারা চিনল নারে
বৃথায় গেল মানব জীবন ।

www.pathagar.com

২৭.
নিবেদন রাখি হুদহুদ পাখি
আমি তোমার দু'টি পায়
চিঠি লয়ে যাও মদিনায়।

ও পাখিরে ওরে বনের পাখি
আমি কোরআনে জেনেছি খাঁটি
তুমি ছোলেমানের চিঠি
দিলে সেটি বিলকিছ যেথায়।

আমি বহু দূরে থেকে কাঁদি
আমার তো কেউ নাই দরদিরে
তুমি যদি হতে আমার সহায়রে পাখি
হতে আমার সহায়।

ও পাখিরে ওরে বনের পাখি
আমি চিঠির প্রারম্ভে লিখলাম
পরম করুনাময়ের নাম
পরে সালাম ভজলাম নবীজির রওজায়।

বাউল তারা ঐ চরণের পেলাম
ইহকাল কী পরধামরে
ইতি দিলাম আমার সকল অভিপ্রায়রে
পাখি আমার সকল অভিপ্রায়।

২৮.
ভবে নাই নাইরে
দুঃখিনীর দরদি ভবে নাই।
আমি ভালবেসে অবশেষে
নয়ন জলে ভেসে বেড়াই।

অভাগিনী তোমার আশে
সদায় কান্দি রাস্তায় বসেরে
আমি মনের দুঃখ কই কার কাছে
এমন বান্ধব কোথায় পাই।

শুকাইল ফুলের কলি
ফুল বাগানে নাই মোর কলিরে
খাবে মধু কোথায় অলি
কার জলে

www.pathagar.com

প্রেমাগুণে অঙ্গ পোড়া
ভাঙলে প্রেম না লয় জোড়ারে
বাউল তারা কয় চরণ ছাড়া
ঘরে না মোর প্রাণ কানাই।

২৯.

আমার প্রাণ বন্ধু কালিয়া রে
বাসর সাজাইলাম রে আমি ফুলচন্দন দিয়া
ফুল বিছালাম বাসী হইলরে এলো না কালিয়া রে।
ফাগুনিয়া ফুলের গন্ধে মন উঠে চমকিয়া
মম ফুলে নাই ভ্রমরা রে মধু যায় শুকাইয়া রে।

যৌবনের বাহার আমার গেল রে ফুরাইয়া
কার নিকুঞ্জে আছ বন্ধুরে আমায় পাশুরিয়া।
দেখে যেও মরণকালে দু'টি আঁখি দিয়া
প্রেম হুতাসে কাঁদে বসে রে–বন্ধুরে
বাউল তার মিয়া রে।

কথা, সুর ও শিল্পী বাউল তারা মিয়া (নালিতাবাড়ি)

১২. হাজং লোকগান

হাজংদের সংস্কৃতির প্রধান একটি ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছে গান। এসব গানে খুঁজে পাওয়া যায় হাজংদের লোক-জীবনকে। তাদের গানগুলো হলো রসি গান, বিরহের গান, প্রেমের গান, আধুনিক গান, টেংলা গান, নিকনি গান, ভাঙা নৌকা গান, বানাগাড়া গান, চোর চোর মাগা গান, বোঘা লাগানো গান, জাখা মারা গান, নয়া খাওয়া গান, গীতালু গীত, ঘুতুর ঘুতুর গীত, নামকীর্তন, পদকীর্তন, চাপমাত্রা, পদাবলী ইত্যাদি। কোন কোন গান একক, কোন কোন গান দ্বৈত, কোন কোন গান দলগতভাবে গায় তারা। নিচে কয়েকটি গান উপস্থাপন করা হল, যে গানগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে হাজং অরবিন্দ রায়ের পুত্র হাজং পীযুষ রায়ের কাছ থেকে। এই গানগুলো অরবিন্দ তার বাবা হাজং রহেন্দ্র রায়ের কাছ থেকে পেয়েছেন। আর গানগুলো হাজং ভাষায় উপস্থাপনা করা হলো–দেখা যাবে কোন কোন গানে হাজং ভাষার শব্দ একেবারে বাংলার ভাষার শব্দ হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি গানের কিছু হাজং শব্দের বাংলা অর্থ গানের শেষে দেওয়া হলো।

হাজং রসি গান

এটি একটি বারমাসী গীত। এই বারমাসী গীতে একজন হাজং বিরহী নারীর মনের আকুতি ও প্রেমের ব্যাকুলতা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

১.

সাধুরে. অগ্রান মাসনি সাধুরে ক্ষেত্র ভরা ধান,
কাইয়ু কাটে, কাইয়ু মাড়ায়, কাইয়ু করেক নবান ॥

www.pathagar.com

নবান করিয়া সাধুরে মহানন্দে খায়,
ও-বেলাই মলা সাধু বাণিজ্যি রায় যায় ॥
সাধুরে, বাণিজ্যি রায় যারা সাধুরে মগে রলে ভুলে,
ধরিছে ডালিম ফল খাবাগে না দিলে ॥
কাঁসা ডালিম খালে সাধুরে দাত্‌নি ধরে কষ,
পাক্‌কিয়া মুসুন খালে হে তান্‌হে লাগে রস ॥
সাধুরে সিয়ু মাস ফল সাধুরে মলা ইয়ুমাস ফলে,
কান্দে গাবুর কইন্যা হাত দে কপালে ॥

২.

সাধুরে, পৌষ মাসনি সাধুরে ময় পূজি অধিকারী ।
ভাতার ভুকতি করে যারা ভাগ্যবতি নারী ॥
ভাতার ধন, ভাতার মন, ভাতার সকল সার ।
ভাতার বিনে নাইরে গতি এ ভব সংসারে ॥
সাধুরে সিয়ুমাস ফলে সাধুরে মোলা ইয়ুমাস ফলে ।
কান্দে গাবুর কুইন্য হাত দে কপালে ॥

৩.

সাধুরে মাঘ মাসনি সাধুরে লাগে ঢাঙর জার ।
খেথাঁ-বালুশ নিয়া ময় কান্দে বারে বার ॥
সাধু মলা জারলা খেথা সাধু মলা প্রাণ ।
মরণি থাকিলে সাধুগে নিয়া আকল্কায়া ঘুমাইতাম ॥
সাধু ফলে মগে থুইয়া দূরে পরবাসে ।
এতো বাখার জারনি কিংকা প্রাণডা বাঁচে ॥
সাধুরে সিয়ুমাস ফলে সাধুরে, ইয়ুমাস ফলে ।
কান্দে গাবুর কইন্য হাত দে কপালে ॥

৪.

সাধুরে, ফাল্গুন মাসতে সাধুরে ফাল্গুয়া খেলায় রাজা ।
হাতির কপালে দেখং সিন্দুরের ফোটা ॥
সিন্দুরের ফোটা আরো চন্দনের ফোটা ।
যে নারীর ভাতার নাইরে মনে কতো ব্যথা ॥
সাধুরে সিয়ুমাস যারে সাধুরে, ইয়ুমাস ফলে ।
কান্দে গাবুর কুইন্যা হাত দে কপালে ॥

৫.

সাধুরে চৈত্র মাসতে সাধুরে চৈত্রিক ঢাঙর টান ।
পানিতিয়া লাগ্‌গিয়া সাধু না বাঁচে মলা প্রাণ ॥
রান্দিয়া-বাড়িয়া ভাতরে ঢাল্‌লিয়া দিলাম পাতে ।
কোমায় আছে মলা সাধু জিগাব কার কাছে ॥

www.pathagar.com

সাধু যদি থাক্‌তো ঘরে খাইতো গাইলো দুধ ।
রাতিদিনে সাধু লগন করিতাম কুতুক ॥
সাধুরে, সিয়ুমাস ফলে সাধুরে, ইয়ুমাস ফলে ।
কান্দে গাবুর কইন্য হাত দে কপালে ॥

৬.

বৈশাখ মাসতে সাধুরে, পুখি তুলে ছাও ।
গাছের আগ্‌নি থাক্‌কিয়া ছাওয়াল করে কতে রাও ॥
পুখির মত কাইন্দ্যা থাকি ময় ঘরনি বহিয়া ।
মলা সাধু ভুল্‌লিয়া রলে কোন টিমাতগে পাইয়া ॥
সাধুরে, সিয়ুমাস ফলে সাধুরে, ইয়ুমাস ফলে ।
কান্দে গাবুর কইন্যা হাত দে কপালে ॥

৭.

জৈষ্ঠ্য মাসতে সাধুরে ক্ষেতে খেলায় ধান ।
ডাউক ডাকে, কুরা ডাকে কাঁপে মলা প্রাণ ॥
ডাউক ডাকে, কুরা ডাকে, ডাকে কত পুখি ।
যে নারীলা সোয়ামী নাইরে বহিয়া গোঙায় রাতি ॥
সিয়ুমাস ফলে সাধুরে, ইয়ুমাস ফলে ।
কান্দে গাবুর কইন্যা হাত দে কপালে ॥

৮.

আষাঢ় মাসতে সাধুরে হুবাই করে আশা ।
বনের ভারুই পুখি সেইও করে বাসা ॥
বনের ভারুয়াল পুখি মিল্‌লিয়া থাকে জুড়ে ।
ময় নারী অভাগিনী একলাই থাকি ঘরে ॥
সিয়ুমাস ফলে সাধুরে, ইয়ুমাস ফলে ।
কান্দে গাবুর কইন্যা হাত দে কপালে ॥

৯.

সাধুরে শ্রাবণ মাসতে সাধু ব্রত করে ।
দৈ চিড়া খায় গুবাই গুস্তি ঘরে ঘরে ॥
মলা ঘরে নাইরে সাধু ভাব্‌বিয়া দিন যায় ।
দৈ চিড়া লইয়া কান্দি কর্‌রিয়া হায় হায় ॥
সিয়ুমাস ফলে সাধুরে, ইয়ুমাস ফলে ।
কান্দে গাবুর কইন্যা হাত দে কপালে ॥

১০.

ভাদ্র মাসতে সাধুরে পাক্‌কিয়া পড়ে তাল ।
তাল্‌লা পিঠা বান্‌নিয়া ময় রাখ্‌ব কত কাল ॥
কাইয়ু চায়রে আরে, আরে কাইয়ু চায়রে রইয়া ।

www.pathagar.com

আর কতকাল শ্বাখং যয়বন লুকের বৈরি ॥
সিয়ুমাস ফলে সাধুরে, ইয়ুমাস ফলে ।
কান্দে গাবুর কইন্যা হাত দে কপালে ॥

১১.

আশ্বিন মাসতে সাধুরে মণ্ডপেতে গিয়া ।
কত নারী কুরে পূজা গন্ধধূপ দিয়া ॥
করুক করুক পূজারে মাগ্‌গিয়া চাবো বর ।
কোমায় আছে মলা সাধুরে ফির্‌রিয়া আহুক ঘর ॥
সিয়ুমাস ফলে সাধুরে, ইয়ুমাস ফলে ।
কান্দে গাবুর কইন্যা হাত দে কপালে ॥

১২.

কার্ত্তিক মাসতে সাধু তুলসি ঘরে দেয় বাতি ।
ময় নারী কাইন্দা থাকে ধর্‌রিয়া সাধুলা ছাতি ॥
দিন ফলে, মাস ফলে ফলে হারা বছর ।
কিংকা রলে মলা সাধু, মগে বাননিয়া পর ॥
সিয়ুমাস ফলে সাধুরে, ইয়ুমাস ফলে ।
কান্দে গাবুর কইন্যা হাত দে কপালে ॥

[কাইয়ু-কেউ কেউ, পাক্‌কিয়া মুসুন-পেকে উঠলে, সিয়ু- সেই, গাবুর কইন্যা- যুবতী কন্যা, ভাতার- স্বামী, কিংকা-কেমনে, গায়লা-গাইএর বা গাভির, টিমাতগে-নারীকে ।]

(কথা : হাজং শ্রী রহেন্দ্র রায়; সংগ্রহ : হাজং পীযুষ কান্তি রায়) ।

হাজং মাও ভূমিলা গান

সবুজ ধাকা ছায়া ধাকা
ইদি আমলা মাও জাগা
ভুলিবা না পাব আমরা
ধানে ভরা গানে ভরা
মায়া লাগা বাংলাদেচ
ও আমলা বাংলাদেচ ।

কত খাল বিল গাং নালা
বাহিয়া থাকা হাপলা মেলা
মাইদা মাইদায় ভরিয়া
থাকা পানার কমলি লেওয়া
সুন্দর দেখে আমলা বাংলা পরিবেশ ।

বন্দে বন্দে রাখাল ভরা
রংয়ে রংয়ে গুরু চড়ায় ওরা

www.pathagar.com

মুখে মুখে মিঠা আহি
বাজায় মধুর সুরলা বাহি
উই সুরতে মন ভরিয়া উঠি
সখলা নাইরে শেষ ।

[ইদি-এটা, হাপলা-শাপলা, মাইদায়-মধ্যে, সুখলা-সুখের ।]
(কথা ও সুর : হাজং পীযুষ রায়)

হাজং জাখা মারা গান

চিনাকুড়ি বিল বায়
বাওয়া মারা হবো
আয় বুইনি হোবায় আমরা
জাখা নিয়া যাব ॥

দিনদাও ভালা আজি
পানি তুতা হুব আজি
পুঠি টেংলা মরিয়া মুজুন
কানা হইয়া যাব
ভাওয়া মাবা হব ॥

[তুতা হুব-গরম হবে মুজুন, শেষ হয়ে ।]
(কথা ও সুর : হাজং অরবিন্দ রায়) ।

হাজং নিকনি গান

হেমা বালিহাতা তলা চরণে
হোবাই পুজিব আজি এক মনে ।
মন প্রাণ দিয়া তগে ডাকি ঘোড় হাতে
ফুল ফুল উপহারে আমরা তগে পুজিতে
দয়া কর্‌রিয়া নেও তলা নিজ গুনে ।
তলা নামে হয় যাতো হাজংকুল নিকনি
নংতাং হয়ে পুজি তগে অভাগা অয়পিনি
ফুলধুব দিয়েতলা শ্রীচরণে ।
হয় যুদি কারলা বিষম ঘাওয়া
দয়ালিনী মা তয় করিলে দয়া
ভালা হয় তলা নামের গুণে-
কাটা মাদের ফুল দেখিতে সুন্দর
সেই ফুল দেইমা চরণের উপর
আশীর্বাদ করেক তয়
তলা সন্তানে ।

[হেমাবালিহাতা-হাজংদের গ্রাম দেবী (তাকে 'নিকনি' দেবীও বলা হয়), নংতাং-পূজারী, কারলা-কারো ।]

www.pathagar.com

হাজং ভাঙা নৌকা গান

দুইও দুধ ঘৃত ঘোল এ সাজায়ে পশরা।
মথুরা বাজারে যায়রে যত ব্রজবালা।
যমুনার ঘাটে গিয়া রইছে খার হইয়া।
পার কর পার কর বলেরে ঘন ডাক দিয়া।
চুর লম্পট কানাই ভাঙা নাউটি লইয়া।
আয় পার করি বলে লইল নায়েতে তুলিয়া।
মাইদ্যা গাঙনি লইয়া নাউ দিল যে ডুবাইয়া।
রাধা কৃষ্ণ মিলন হইলরে পানি তলবায় যাইয়া।

[চুর-চতুর, তলায়-তলে।]
(কথা : হাজং শ্রী রহেন্দ্র রায়, সংগ্রহ : হাজং পীযুষ কান্তি রায়)।

হাজং ঘুতুর ঘুতুর গান

কালা
সময় না জানে
অসময় বাজায় বাহি মন্দা না মানে।
ও... কালারে...
তয় কালা ময়কালা কালা নদের পানি
কুলহা ভরিয়া দেখং কালার মুখ খানি।
ও কালা রে...
নারন না জান বারন না জানং রে
না জানং হিলদিলা বাটা
নারিয়া বারিয়া ভাত কাগে খাওয়াবো রে
কালগন কুব দুঃখের কথা।
ও কালারে...
মুলা বন্ধু খাব ভাত পাট কাটিয়া যাইলাম।
ধাগুরা ধুইরা মারলাম টান
থিকনিয়া আদরান খাইরাম রে।

[হিলদিয়া-হলদি (হলুদ), নারিয়া-বাঁধিয়া,ধাগুয়া-ডগা, আদরান-আছাড়।]
(সংগ্রহ : হাজং পীযুষ রায়)।

www.pathagar.com

লোকবাদ্যযন্ত্র

লোকসংগীতের রয়েছে বিভিন্ন ধারা। তাই লোকসংগীতের সুর, মেজাজ ও তাল লয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ধরনের লোকবাদ্যযন্ত্র। যেমন—বাউল গান পরিবেশনের জন্যে যে একতারার ব্যবহার রয়েছে, তার নির্মাণ কৌশল ও উপাদান এক এক অঞ্চলে একেক রকম। শেরপুর অঞ্চলে একতারা, দোতারা, স্বরাজ, ঢোল প্রভৃতি লোকবাদ্যযন্ত্রের পাশাপাশি রয়েছে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকবাদ্যযন্ত্র।

কোচদের লোকবাদ্যযন্ত্র

কোচদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বেনা, জাহাজ ও চেংচরং উল্লেখযোগ্য। জাহাজ হলো বড়ো করতাল বা রাম করতাল। চেংচরং বা তালি হলো ছোটো করতাল। এছাড়া আছে কালো, হারমনিয়াম, ঢোল, খোল ইত্যাদি। যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে ঢাল ও তলোয়ার অন্যতম। ঢাল গণ্ডারের চামড়া দিয়ে বানানো হত। দেখতে অনেকটা গারোদের ঢালের মত। তলোয়ারকে কোচ ভাষায় ঢাই বলে।

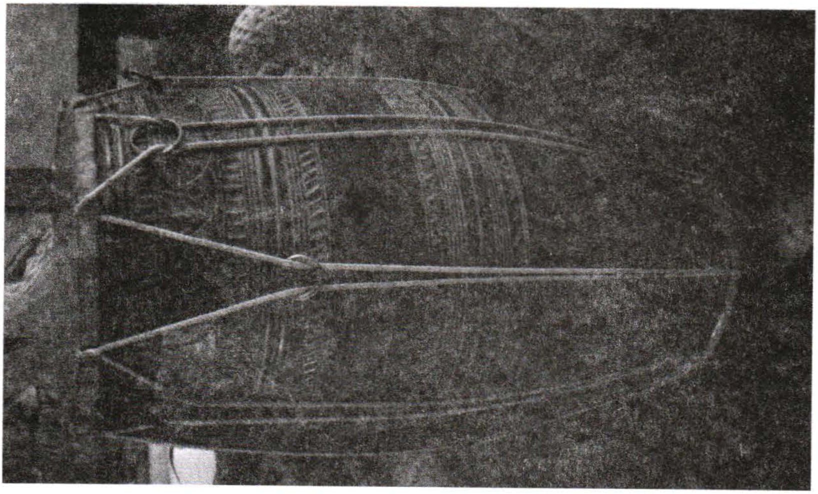

মৃদঙ্গ

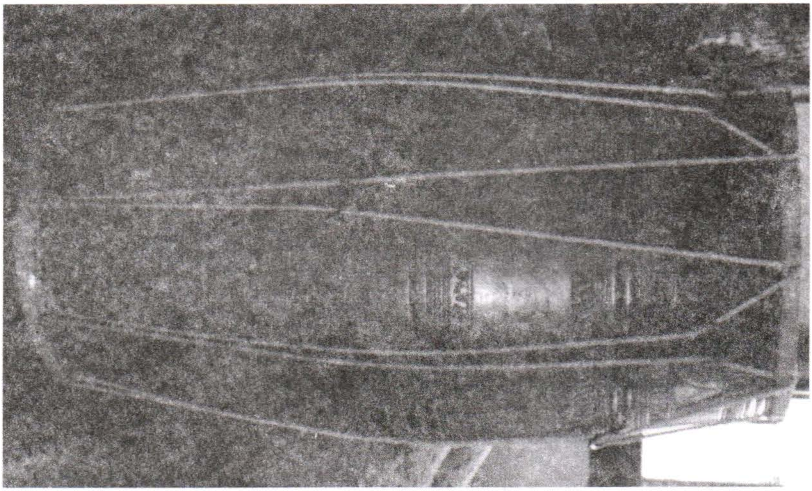

ঢোল

গারোদের লোকবাদ্যযন্ত্র

পাহাড়ি এলাকায় সাধারণ গারো পরিবারে সম্পদ থাকে খুব কম। যেমন : কাপড়-চোপড় বাসন-কোসন। দা, কুড়াল, বাঁশের ঝুড়ি। নিজেদের তৈরি বাঁশের ঝুড়ির নাম কক। এছাড়া আছে মেয়েদের গহনা। রূপার তৈরি গলার হার। তামা বা রূপার মুদ্রার মালা। গ্রাম প্রধান বা নকমার বাড়িতে থাকে জয়ঢাক ও নাকড়া। জয়ঢাক হলো এক রকম বাদ্য যন্ত্র। এটা কাঁসার তৈরি। গারো ভাষায় এর নাম রাং। যার যত বেশি রাং তিনি তত ধনী। আগে এরকম মনে করা হত। পাহাড় এলাকায় হাঁস মুরগি ও শুকর পালন করা হয়। থাকে শিকারী কুকুর ও বিড়াল। গারোরা শুকরকে বলে ওয়াক মান্দি বা ডোমনী ওয়াক।

ডালুদের লোকবাদ্যযন্ত্র

ডালুদের আদি বাদ্যযন্ত্রের নাম ডঙ্কা। ডঙ্কা দেখতে বাঁয়া তবলার মত। আগে ডঙ্কা বাজিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সভার আহ্বান করা হত। ডালুদের অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র হলো খোল, করতাল, কর্ণেট বা কেরিনেট, আড়বাঁশি, ফ্লুট ইত্যাদি।

www.pathagar.com

লোকউৎসব

লোকউৎসবের মধ্যদিয়ে বাঙালির ভাবনা-চিন্তন, কর্ম ও চেতনার বিকশিত রূপটি ফুটে ওঠে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী আড়ম্বরবহুল কর্মকাণ্ডের ঐতিহ্যের সূচনা করেছে সুপ্রাচীনকাল থেকেই। আজও তা অব্যাহত আছে। কেননা লোকউৎসব বললেই বোঝায় 'গ্রামীণ জনগণের উৎসব'। শেরপুর অঞ্চলেও লোকউৎসব মিলনানন্দ নিয়ে হাজির হয়। অধিকাংশ লোকউৎসবে যেসব লোকমেলার আয়োজন করা হয় সেসব লোকমেলায় গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশামান ধারায় উল্লোখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

১. নববর্ষ বা বৈশাখি উৎসব

হালখাতা, চৈত্রসংক্রান্তি, পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ এসব বাঙালির নিজস্ব ও ঐতিহ্যিক দিন ও উৎসব। এসব উৎসব পালনে বাঙালিরা এই অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যকেই ফুটিয়ে তোলে। যেমন–হালখাতা। সম্রাট আকবরের সময় থেকে বাংলা সনের প্রবর্তন হলে, প্রথমে জমিদাররা তাদের খাজনা আদায় অর্থাৎ পূর্বের বছরের পাওনা-দাওনা আদায়ের উদ্দেশ্যে নতুন বছরের প্রথম দিন হালখাতা করতেন এবং এজন্য প্রজাদের আমন্ত্রণ করতেন। তাদেরকে মিষ্টিমুখ ও খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করতেন। পরবর্তীকালে জমিদারি প্রথা উঠে গেলে বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও দোকানিরা হালখাতার প্রথা চালু রাখেন। অর্থাৎ পুরনো বছরের খাতায় ক্রেতা-সাধারণের যে বাকি-বকেয়া থাকে, তা পরিশোধ করে নতুন বছর থেকে নতুন খাতায় নাম উঠান। ব্যবসায়ী বা দোকানিরাও লাল বা সবুজ মলাটের নতুন খাতা খোলেন এবং ক্রেতাদের জন্য নানা রকম খাবার-দাবারের আয়োজন করেন। এ উপলক্ষে গান-বাজনারও আয়োজন করা হয়। সবাই মিলে আনন্দ-ফুর্তি করে যার যার বাড়ি ফিরে যান। এটি মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজের সাংস্কৃতিক চর্চা বলা যেতে পারে, যা জাতিগত বৈশিষ্ট্যেরই অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, অর্থাৎ যাকে বলা যায়–বাঙালির হাজার বছরের নিজস্ব ঐতিহ্যিক উৎসবেরই অংশ।

বিশিষ্ট লোকবিদ অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান তাঁর একটি লেখায় বলেছেন, 'বাংলা সনের প্রথম মাসের নাম বৈশাখ। পহেলা বৈশাখে বাঙালির নববর্ষ উৎসব। নববর্ষ সকল দেশের, সকল জাতিরই আনন্দ উৎসবের দিন। শুধু আনন্দ-উচ্ছ্বাসই নয়, সকল মানুষের কল্যাণ কামনারও দিন। আমরা সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়েই মহা-ধুমধামের সঙ্গে আমাদের নববর্ষ উৎসব উদযাপন করি। একে অন্যকে বলি : 'শুভ নববর্ষ'।

কবে থেকে বাংলা নববর্ষ উদযাপন শুরু হয়েছে, এটি সঠিক করে বলা মুশকিল। তবে গবেষক জাহারাবী রিপন বলেছেন, 'প্রাথমিকভাবে ৫৯৩-৯৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বাংলা

www.pathagar.com

অব্দ বা বঙ্গাব্দের সূচনাকে স্বীকার করা হয়ে থাকে। পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি ৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বাঙ্গালা অব্দের শুরুর সঙ্গে 'সন' কথাটির ব্যুৎপত্তি তিব্বতি নৃপতি রি-স্রঙ-সন অথবা তদীয় পুত্র সঙসনগাম—পোর নামের আধারে অনুমান করেন। পিতার রাজ্যাভিষেক কিংবা পুত্রের জন্ম উপলক্ষে এই অব্দের আরম্ভকাল বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তবে উভয়ের নামের একাংশের সঙ্গে বঙ্গাব্দের সঙ্গে ব্যবহৃত 'সন' এর সাযুজ্য বিদ্যমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আরবী 'সন' অর্থাৎ বৎসরের সঙ্গে বঙ্গাব্দে ব্যবহৃত 'সন' এর ঐক্যসূত্র আছে বলেও ধারণা করা হয়ে থাকে। তবে পণ্ডিতদের অনুসন্ধানে জানা যায়, গৌড় বঙ্গের রাজা শশাঙ্কের আমলেই বঙ্গাব্দের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু এতে মতান্তর লক্ষ্য করা যায়। কারণ মহামতী আকবরের রাজত্বের পূর্বে বাংলা সন বা বঙ্গাব্দের প্রচলন সম্পর্কিত নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নেই। আকবর রাজ্যবর্ষকে সৌরবর্ষ হিসেবে গণনা খুব সম্ভব রাজ্যশাসন রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে। সে কারণে এই বাংলা সনের শুরু এবং বৈশাখের সঙ্গে বাংলার কৃষ্যভূমির সম্পর্ককেও অনিবার্য জ্ঞান করি'। এখন বাংলা নববর্ষের যে গৌরবময় ও জাকজমক উৎসব আয়োজন আমরা রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে দেখছি, এটি মূলত বাংলা অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক সমাজের ফসল। এই সমাজের মানুষেরা আদিকাল থেকেই নববর্ষের অনুষ্ঠান করে আসছেন। তাদের মাঠের ফসল উঠা, নতুন ধানের পিঠা-পুলি তৈরি ও আহার, যাকে নবান্নের উৎসব হিসেবে এখনও দেখা যায়। সারা বছরই বিভিন্ন পালা-পার্বণ কৃষক পরিবারগুলো করে থাকেন। তেমনি বৈশাখি মেলারও কালের প্রবাহে প্রচলন ঘটেছে। বর্তমানে পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ উদযাপন বাঙালির জীবনে সবচেয়ে বড়ো ঘটনা হয়ে দেখা দিয়েছে।

বাঙালির এই মহাউৎসবের দিনটিকে তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকরা পালন করতে দেয়নি। তাদের মতে, এটি হিন্দুয়ানী বা ইসলাম পরিপন্থি উৎসব। সেকারণে পহেলা বৈশাখ পালনে তারা নানা সময় বাঁধা দিয়েছে। কিন্তু তাতে তারা সফল হয়নি। আসলে এই ভৌগলিক অঞ্চল বা নদী-বিধৌত এই বাংলা অঞ্চলের সহজ-সরল বাঙালিরা সব সময়ই নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে লালন করেছে যুগে যুগে, যে কারণে পাকিস্তানি স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িক শক্তি পহেলা বৈশাখসহ বাঙালির নানা উৎসবকে বন্ধ করে দিতে পারেনি বরং তারা এ বিষয়ে পরাজিতই হয়েছে। পাশাপাশি বাঙালি বীরের জাতি, প্রতিবাদী, লড়াকু এবং গৌরবময় ইতিহাসের অংশীদার, তাই তারা আত্ম-পরিচয়কে তুলে ধরতে কখনো প্রতিবাদী, কখনো লড়াকু, কখনো রক্তদানেও পিছুপা হয়নি। একারণে পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে পহেলা বৈশাখসহ বাঙালির অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতির উপর যখনই আঘাত এসেছে, তখনই তারা প্রতিবাদ করেছে।

রমনার বটমূলে যখন পহেলা বৈশাখ অর্থাৎ নববর্ষ উদযাপনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়, তখন থেকে নানা পায়তারা চলেছে এটিকে বন্ধ করে দিতে, কিন্তু একই চেতনায় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে বাঙালি উদীপ্ত হয়ে উঠে এবং রুখে দিয়ে ধীরে ধীরে চারাগাছ থেকে মহীরুহ করে তুলেছে নববর্ষের অনুষ্ঠানকে। আজ পহেলা বৈশাখ সরকারি ছুটির দিন। নববর্ষ উদযাপনে ঐ দিন লক্ষ লক্ষ মানুষ বেরিয়ে আসে। রমনার বটমূলসহ সারাদেশ আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তাই নববর্ষের প্রথম দিন আজ বাঙালির মহা-উৎসবের দিন, মহামিলনের দিন।

www.pathagar.com

বৈশাখী উৎসবে বাউল আসর

নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে লোকনৃত্য

www.pathagar.com

সারা পৃথিবীতেই প্রত্যেক ভাষা ও জাতিগোষ্ঠী তাদের নিজস্বতায় পালন করে নতুন বছরের প্রথম দিনটিকে। বাঙালিরাও তাদের জাতীয় জীবনে যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন করে পহেলা বৈশাখ অর্থাৎ বাংলা নববর্ষ অন্যতম একটি।

এই দিন নতুন পোশাকে, নতুন সাজে, বর্ণাঢ্য মঙ্গলযাত্রায়, সকল অশুভকে তাড়িয়ে কল্যাণ কামনায়, অসাম্প্রদায়িক চেতনায়, পুরাতনের জরা-জীর্ণ মুছে ফেলে, আগামী নতুনকে সুন্দর করে গ্রহণ করার মহা আয়োজন চলে সবার মাঝে। ছোটো-বড়ো সকলেরই কণ্ঠে তাই উচ্চারিত হয় বিশ্বকবির সেই চির ভাস্বর পঙক্তিমালা : 'এসো হে বৈশাখ এসো এসো/ তাপস নিঃশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে...'।

বাংলা নববর্ষের পহেলা বৈশাখ উৎসব সত্যিকার অর্থেই বাঙালিদের প্রাণের উৎসব। কারণ এই উৎসবে কোন বিদেশিপনা নেই। শুধু আছে বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্য, আত্ম-পরিচয় ও আপন উপাদান। প্রতি বছর পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র করে পান্তাভাত-ইলিশ-আলুভর্তা-কাঁচা পিয়াজ আর শুকনা মরিচ ভাজা দিয়ে খাবার খায় বাঙালিরা। আরো খায় কদমা, বাতাশা, খোরমা, তিলের নাড়ু, নারিকেলের নাড়ু, মুড়ির নাড়ু, খৈয়ের নাড়ু, চিড়ার নাড়ু, পাপর ভাজা, ঘুঘনি ও নানান ধরনের পিঠা-পুলি, দই, মাঠা, ঘোল ইত্যাদি। এছাড়া বর্তমান সময়ে আইসক্রীম, কোমল পানীয় এই দিনের খাদ্য তালিকায় যুক্ত হয়েছে বিশেষ করে এই প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা খেয়ে থাকে। এ ছাড়া প্রায় সকল ঘরে বিশেষ ধরনের খাবার তৈরিও খেতে দেখা যায়। এই সময়ে দেখা যাচ্ছে, ছেলে-মেয়েসহ বাবা-মা'রা বিশেষ করে ঢাকায় শহরে ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত পহেলা বৈশাখের নানান সংগীতানুষ্ঠান দেখে ও শোনে বড়ো বড়ো হোটেলে বা রেস্টুরেন্টে গিয়ে বিশেষ ধরনের খাবার খেয়ে আনন্দ করেন।

পোশাক পরার ক্ষেত্রে পহেলা বৈশাখে বাঙালিদের মধ্যে দেখা যায় এক নতুন আমেজ। গ্রামে পুরুষেরা নতুন লুঙ্গি ও গামছা এবং মেয়েরা নতুন শাড়ি পরার চেষ্টা করে। শহরে ছেলেরা নতুন ফতোয়া, পাঞ্জাবি, পায়জামা, স্যান্ডেল আর মেয়েরা নতুন শাড়ি, নতুন সেলোয়ার-কামিজ পরে। ইদানীং ঢাকায় নববর্ষ বা পহেলা বৈশাখকে কেন্দ্র উভয় শ্রেণির মানুষের জন্য নানান রঙের ও বর্ণের পোশাক তৈরি ও বিক্রি হচ্ছে। বিশেষ করে পহেলা বৈশাখ উদযাপনকারী মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা পোশাক কেনা ও পরা এবং পরে পুরো পরিবার রমনার বটমূল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এসে সারা দিন গান-বাজনা শোনা, ঘোরাফেরা করা, টমটম চড়া, নানা ধরনের খাবার কিনে খাওয়া প্রভৃতি করে থাকেন। কাকভোর থেকে রমনার বটমূলে যাওয়া তো আছেই, পাশাপাশি চারুকলা অনুষদের ছাত্র-শিক্ষদের উদ্যোগে বৈশাখের বিশাল শোভাযাত্রায় বিভিন্ন এলাকা বা জায়গা থেকে এসে অংশগ্রহণ করেন। আনন্দ করেন। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাজুড়ে নানা ধরনের পসরা সাজিয়ে বসে বিভিন্ন পেশার চারু ও কারুশিল্পীরা। বাংলা একাডেমী সাত অথবা পনের দিনব্যাপী আয়োজন করে কারুশিল্প মেলা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিল্পীরা তাদের নান্দনিক পসরা নিয়ে মেলায় আসে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর বাউল গানের পাশাপাশি পিঠা উৎসবের আয়োজন করে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা বাদে রাজধানীর বিভিন্ন খোলা মাঠে বা জায়গায় বৈশাখি মেলা হচ্ছে প্রতি বছর। এসব আয়োজনে সারাদিনই উপচেপরা ভীড় থাকে মানুষের।

www.pathagar.com

রমনার বটমূলে ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ছায়ানটের গান শোনতে বাঙালি সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষদের ভীড় লক্ষণীয়। বাঙালি সংস্কৃতিবিরোধী ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠী বোমা হামলা করেও সে স্রোত থামাতে পারেনি। রবীন্দ্র-নজরুল-অতুলসহ নানা প্রকারের গান ছায়ানটের শিল্পীদের পরিবেশনায় শোনার পাশাপাশি লালন অর্থাৎ বাউল গানের পরিবেশনায় আগত দর্শক-শ্রোতারা মুগ্ধ থাকে।

পহেলা বৈশাখ বা বর্ষবরণের যে শোভাযাত্রাটি বর্তমানে দেশ ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে বাঙালিদের প্রাণের উৎসবের কথা ছড়িয়ে পড়েছে–সেটির জন্য চারুকলা অনুষদের শিক্ষক-ছাত্রদের প্রস্তুতি চলে প্রায় এক মাস ধরে। নানান ধরনের মুখোশ আঁকা বা তৈরি থেকে আলপনা করা এবং প্রতি বছর একটি থিম আইটেম নির্মাণ করা যেন এক মহাকর্মযজ্ঞ। রাতদিন পুরো অনুষদে বিশেষ করে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে প্রণোদনা তা দেখার মত। নিবিষ্টচিত্তে কাজ করেই যাচ্ছে। এই যে নিবিষ্টচিত্তের কথা বললাম–এটিই হচ্ছে নিজের সংস্কৃতির প্রতি ভালবাসা।

ইদানীং কমে গেলেও শেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় নববর্ষের প্রথমদিন অর্থাৎ পহেলা বৈশাখের মেলা বা উৎসব হতো আগে। সেসময় খোলামেলা বিশাল বিশাল মাঠ ছিল। একটু কাব্য করেই বলা যায়, মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে দূর থেকে সুদূরে হারিয়ে যাওয়া যেত। যা হোক এসব মাঠেই অনুষ্ঠিত হতো বৈশাখি মেলা। প্রতি বছর চৈত্রের শেষদিন মেলা বসত চলত এক সপ্তাহ। মেলা মানেই উৎসব উৎসব আমেজ।

বৈশাখি মেলায় আসত আশে–পাশের গ্রাম ও দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ। এই মানুষগুলোর মধ্যে ছোটো-বড়ো, নারী-পুরুষ সবাই থাকত। মেলার ভীড় এমন হতো যে, অনেক সময় ছোটো ছেলে-মেয়েরা হারিয়েও যেত। হারিয়ে গেলে বিপদও ছিল, কারণ তখন মাইক দিয়ে ঘোষণা দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তবে সবাই সবাইকে চিনত বলে, কারুর কোনো বাচ্চা মেলায় হারিয়ে কান্না করলে, তাকে জিজ্ঞেস করে তার বাবার পরিচয় বের করে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হতো।

মেলা উপলক্ষে কাছে ও দূর-দূরান্ত আসতো নানান ধরনের পসরা নিয়ে। মেলার মাঠ জুড়ে থরে থরে বসতো দোকানিরা। বেদেনিরা শরীরের বিষ-বাতের ব্যথার ওষুধ গাছ-গাছড়ার ডাল-শিকড়, চুড়ি-ফিতার দোকান বসত এক পাশে তারপর সারি ধরে বসত বাতাশা, খুরমা, মোয়া–মুড়ি, চিড়া-খই, মুড়কি-পিঠা, দই-দধির দোকান। অন্যদিকে বাঁশের বাঁশি, একতারা, দু'তারা, ঢোল ও অন্যান্য হাতে বাজান বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসত দোকানিরা। বসত কুলা, চালুন, ঝাড়ু, মাছ ধরার নানা সরঞ্জামের দোকান। মেলা বসার সময় ছিল দুপুরের পর। চলত রাত্রি পর্যন্ত। সন্ধ্যা হওয়ার সাথে বড়ো বড়ো কুপি বাতি, হ্যাজাক বাতি জ্বালাত দোকানিরা। আর মেলায় আগত ক্রেতা ও উৎসুক দর্শকদের অনেকের হাতে থাকত টর্চলাইট। কেউ কেউ হ্যারিকেন বাতিও সঙ্গে রাখত।

মেলা ঘিরে চলত নানা-ধরনের খেলা ও প্রতিযোগিতা সন্ধ্যার পর পরই মেলার এক কোনায় গাছের তলায় বসত জুয়ার আসর। জুয়ারিরা আসত বিভিন্ন জায়গা থেকে। মেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় খেলা বা প্রতিযোগিতা ছিল–মই দৌড়, ষাঁড়ের লড়াই, ঘোড়া দৌড়, লাঠি খেলা, বায়োস্কপ, পুতুলনাচ ও নাগরদোলা। এছাড়াও

www.pathagar.com

বসতো গানের আসর। এই অঞ্চলের লোকগানগুলোই গাইত বয়াতি-বাউলরা। গাছের গোড়ায় বসে একতারা, দু'তারা ও বাঁশের বাঁশি বাজিয়ে শ্রোতাদের মাতিয়ে ফেলত তারা। এই বয়াতি-বাউলরা আসতো বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। পরে দেখেছি এরা শীতের মৌসুমে গ্রামে গ্রামে পালা গান গাইত সারারাত ধরে।

সুতরাং নববর্ষের উৎসব বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত শেরপুর জেলার সব শ্রেণির মানুষদেরও প্রাণের উৎসব, আবেগের উৎসব ও ভালবাসার উৎসব।

২. গারোদের ওয়ানগালা উৎসব

হেমন্ত ঋতুর হাল্কা শীতের মেজাজে বদলে যায় প্রকৃতির রং। মানুষের মনেও তখন শান্তির বাতাবরণ। এমন উষ্ণ সকালে ওয়ানগালার দামা, রাঙ, আদুরীর বাজে গারো পাহাড়ে।

ওয়ানগালা মানেই প্রাণের উৎসব। একটি মিলন-মেলা। এখানে মহামিলন হয় ঈশ্বর আর মানুষের। একে অন্যের, স্বজন-প্রিয়জনের। তাই প্রাণের টানেই আসে ওয়ানগালায়। ওয়ানগালা উৎসবটি হয় ফসল তোলার পরে। এটি একাধারে গারোদের জুম কৃষিভিত্তিক বৃহত্তম ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসব। এটি তাদের নিজস্ব প্রাচীনতম উৎসব। যা স্বতন্ত্র ও স্বকীয়তায় আধুনিক কালেও সমান জনপ্রিয়তা নিয়ে পালিত হচ্ছে। এ উৎসবেই গারোদের নিজস্ব জীবনবোধের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের সামাজিক বন্ধন, কৃষি ফসল উৎপাদন পদ্ধতি, ধর্মবিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান এবং জীবন সংস্কৃতির উৎপত্তি জুমচাষ থেকেই।

শস্যদানকারী দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকর্তার আদেশের প্রতি আনুগত্য থাকার বিষয়টি প্রকাশ পায়। দানকারী দেবতাকে উৎপাদিত কৃষি ফসল উৎসর্গ না করা পর্যন্ত তা ভোগ না করার নিদর্শন দুনিয়াতে বিরল। পৃথিবী থেকে অনেক জাতির প্রাচীন উৎসব অনেক আগেই হারিয়ে গেছে কিন্তু ওয়ানগালা বেঁচে আছে গারোদের মনে, মননে, আত্মায় ও আধ্যাত্মিকতায়।

গারোদের পৌরাণিক কাহিনি থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে তখনও খাদ্য শস্যের জন্ম হয়নি। এক সময়দা শস্য দেবতা (মিসি আপিলপা সালজং গালাপ্পা) তার প্রিয়ভাজন (আনি আপিলপা চিনি গালাপ্পা) কে তার কষ্টের জীবন ধারণ দেখে প্রথম শস্য বীজের ডানা দিয়ে বলেছিলেন, এই নাও এটা খাদ্য শস্যের বীজ। তুমি এই বীজ মাটিতে বপন কর, পরিচর্যা করে ফসল তোলে তা খেয়ে জীবন ধারণ কর। আর ফসল ঘরে তোলা হলে আমাকে স্মরণ কর। তা হলে আমি তোমাকে আরোও মাটির উর্বরতা দিব, আলো-বাতাস রোদ দিব, আকাশ থেকে বৃষ্টি দিব এবং রোগ-বালাই মুক্ত করে আরও প্রচুর শস্য দিব। দেবতার নির্দেশমত আনি আপিলপা চিনি গালাপ্পা বনের ঝোপ-ঝার কেটে বীজ বুনল, ফসল হল। ফসল সংগ্রহের পর তা ভোগ করার আগে শস্য দেবতা মিসি আপিলপা সালজং গালাপ্পার জন্যে নৈবেদ্য সহযোগে তা উৎসর্গ করল। আর দেবতাকে কৃতজ্ঞতার নির্দশন রূপে যে আবাদের প্রথম ফসল ভোগ করার আগে উৎসর্গ করা হলো তারই নাম রাখ হলো ওয়ানগালা। ওয়ানগালা মূলত একটি শস্য উৎসর্গ উৎসব অনুষ্ঠান। গারো ভাষায় "অন্না" মানে দেওয়া আর "গাল্লা" মানে উৎসর্গ করাকে বুঝায়। মন প্রাণ উজার করে প্রফুল্ল চিত্তে

www.pathagar.com

কোন কিছু উজার উৎসর্গকে অনগাল্লা বলে গারোরা। দেওয়া অর্থাৎ অন্না ও গাল্লা বা অনগালা থেকে ওয়ানগালা শব্দটি এসেছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

গারোদের ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব কৃষি পদ্ধতির নাম "জুম চাষ"। বছরের ইংরেজি মাস ফেব্রুয়ারি ও মার্চ থেকে চাষের জন্যে জায়গা নির্বাচন এবং জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করার কাজ শুরু হয়। ফেব্রুয়ারি মার্চে সেই শুকনো ঝুপঝাড় আগুনে পুড়ানো হয় এবং তা পরিষ্কার করে মার্চ এপ্রিল মাসে বপন করা হয় শস্য বীজ। নানা প্রজাতির ধান, ভূট্টা, কাউন, অরহর, শাক-সব্জি, আদা, কচুসহ একই ক্ষেতে ফলানো হয় প্রায় শত প্রজাতির কৃষি পণ্য। হাজার বছর ধরে বংশানুক্রমে এভাবেই আবর্তিত হয়েছে তাদের জীবন। ওয়ানগালাও হয়েছে একইভাবে।

ওয়ানগালা মূলত বর্ষা শেষে শুষ্ক মৌসুমে হয়। এদিক চিন্তা করে অক্টোবর মাসে ওয়ানগালার মহরত হয়ে থাকে। জুমচাষের আবর্তনে ছোটো-বড়ো নানা রকম পালনীয় পর্ব করা হলেও ওয়ানগানা বৃহত্তম একটি উৎসব। এবং একাধারে ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব বলে উৎসবের ব্যাপকতা, গুরুত্ব এবং আমেজ থাকে অন্যরকম। উৎসবের আমেজ সবারই ভাললাগে। ওয়ানগালতে আধ্যাত্মিক বিষয়টি থাকে গুরুত্বে প্রধান। সাধারণত তিন দিন ধরে চলে ওয়ানগালা উৎসব। প্রথম এবং দ্বিতীয় দিনটিতে ধর্মীয় পর্ব হয়। উৎপাদিত কৃষিপণ্য মিসি সালজং দেবতাকে উৎসর্গ করা হয় ধূপ ও নৈবেদ্য সহযোগে। আধ্যাত্মিক নেতা (কামাল) দেবতার উপস্থিতি এবং সন্তোষ মনে গ্রহণের জন্যে মন্ত্র জবতে থাকেন এবং উৎসর্গ করেন। গারোরা উৎপাদিত কৃষিজ পণ্য দেবতাকে উৎসর্গ না করে নিজেরা ব্যবহার করেন না এবং একে অন্যের কোন বস্তুকে লোভ বসত নেয় না।

তাদের বিশ্বাস তাতে গ্রহণকারীর অমঙ্গল হয়। চিরায়ত এ বিশ্বাসের ধারা থেকে তাদের নীতি মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে এবং জাতিগত জীবনে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় দিনের শেষ সময়ের পর্বটি হয় সামাজিক। বিশেষ নৃত্য (গরিরওয়া, চাম্বিল মেসা-আ)। ভোজ ও পানাহারে সময় কাটে তখন। গরিরয়া হয় নানা ঢঙের নানা তাল লয়ের ছন্দ নৃত্যে মোহিত করে মন। ওয়ানগালায় দামা, আদুরী, ঢ়াং, খ্রাম, বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। মিল্লাম এবং স্পি ব্যবহার করা হয় নাচের সময়। এমন একটি দিনের সময় কীভাবে ফুরিয়ে যায় তা টেরই পায় না মানুষ। গারোরা যেন এমন নির্ভেজাল দিনের জন্যে প্রতীক্ষা অনুষ্ঠান শেষের দি‌ের সমাবেশে সবাই মিলে যায় নক্‌মার বাড়ি। নকমা যিনি গ্রাম প্রধান। তার বাড়ি থেকেই ওয়ানগালার যাত্রা শুরু হয় এবং শেষও হয় তার উঠানেই। তখন উৎসবে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র, নানা উপকরণ সামগ্রী নকমার বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেও চলে এক প্রকার নাচ গানের অনুষ্ঠান, পানাহার, খোশ গল্প। সব শেষে নকমা সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে ওয়ানগালা উৎসবের সমাপ্ত ঘোষণা করেন। এভাবে গারোদের অহম করার মতো সবই ছিল একদিন। নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস, সংস্কৃতি, ভাষা, জীবনবোধ সব। তার জন্যে বিন্দুমাত্র অন্যের কাছ থেকে ধার করে আনা ছিল না। এবং তখনই গারোরা নিজস্বতার সম্মান এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু আস্তে আস্তে বদল হতে থাকল নিজস্বতার রং।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে ইউরোপের খ্রিষ্টান মিশনারীরা খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার শুরু করতে লাগল। ১৮৬৩ সালে ভারতের আসাম রাজ্যে অমেদ এবং রামখে মোমিন দুই মামা ভাগ্নে প্রথম খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। তার পর খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও প্রসার লাভ বাড়তে থাকলে নিজস্ব ধর্ম বিশ্বাস ম্লান হতে থাকে। বড়োদিন হয় ধর্মীয় উৎসব। এবং তা পালনে প্রাধান্য বেড়ে গেলে তাদের ইতিহাস ঐহিহ্যের ওয়ানগালা উৎসবটি সংকটে পরতে থাকে। একদিকে ধর্মীয় উৎসব বড়োদিন অন্য দিকে রক্তে মাংসে ও চেতনায় ওয়ানগালা।

এক্ষেত্রে সেই সময়ের বিদেশি মিশনারী এবং নব্য খ্রিষ্টীয়বাদের গারো ধর্মীয় নেতারা জাতির চেতনাকে অবহেলা করে। একদিকে জাতীয় সংস্কৃতি অন্যদিকে ধর্মীয় রীতিনীতি। আগের জামানার সব রীতিনীতি বিশ্বাস ভঙ্গিকে বিসর্জন না দিলে খ্রিষ্টান হওয়া যায় না আর খ্রিষ্টান হলে আগের সময়ের কোন আচার, রীতি রেওয়াজকে মানা যাবে না বলে প্রচার করেন তারা। সে থেকে গারোদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে ভাটা পরতে দেখা যায়। বাংলাদেশে ওয়ানগালা হয়নি প্রায় শতবর্ষকাল ধরে। সময়ের পট-পরিবর্তনের সাথে গারোরাও আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হতে থাকে। তবুও তাদের প্রাণের গভীরে উৎসারিত চেতনায় নিজস্বতাবোধ তাড়া করতে থাকে। তাই দীর্ঘকাল অবহেলার পর উনিশ শতকের আশির দশকে গারো বুদ্ধিজীবী, গবেষকগণ আবারও ওয়ানগালা পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস চালায়। তাদের মতে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বড়ো দিন খ্রিষ্টানদের বড়ো উৎসব—যা বিশ্বজনীন, এটা ধর্মীয় সংস্কৃতি। কিন্তু ওয়ানগালাতে নিজস্ব ঐতিহ্য এবং অহমবোধ (Ego) বহন করে, এটা জাতিগত সংস্কৃতি। তাই নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশে ওয়ানগালা উৎসব জেগে উঠছে আবার। আর ওয়ানগালায় এসে গারোরা যে নিরেট আনন্দ পায় অন্য কোন উৎসবে তা পায় না বলে মনে করেন অনেকে। তাই ওয়ানগালা গারোদের-গারোরাও ওয়ানগালার। ওয়ানগালায় নৈবেদ্য সহযোগে উৎপাদিত শস্য দেবতার কাছে উৎসর্গের সময়ে কামালের (পুরোহিতের) মন্ত্রজপ :

গারো ভাষায় মন্ত্র

ইয়া হায়
দা-আ সালদে নে
দা-আ জাদে নে
আফা সালজং না
মিসি সালজং না
মিমা মিসিখো, হাআনি বিথিকো
ফাত্তিগিব্বানা অনচেংগিব্বানা
অনচেংআনিখো চিনচেংআনিখো অননেংআ
আ হা-হা-হাই।

হা চাবোনে হা রাবোনে
মিমা মিসিখো আনি বিথিখো

www.pathagar.com

আ হা-হা-হাই।

বাংলায় অর্থানুবাদ

আজকের এই দিনে
আজকের এই মাসে
পিতা সালজংকে
সালজং দেবতাকে
মাটির ফসলকে ধানের ডানাকে
দয়াকারীকে দানকারীকে
দেওয়ার বিশেষ দিনে নেওয়ার বিশেষ দিনে
এই দিচ্ছি নাও...।

এই ধরো নাও এই গ্রহণ কর
মাটির ফসলকে ধানের ডানাকে
এই নাও...।

এই বলে কামাল (আধ্যাত্মিক পুরোহিত) মন্ত্রজপতে থাকেন এবং এক এক করে ধুপ জ্বালিয়ে ধুয়াতোলে আনিত ফসলের অংশ বেদীর কাছে উৎসর্গ করতে থাকেন। তার পাশে দামা বাজতে থাকে। এই হচ্ছে ওয়াগালার সার সংক্ষেপ।

গারোদের অন্যতম উৎসবের নাম ওয়ানগালা। তিন দিন ধরে চলে এই উৎসব। ওয়ানগালা উৎসবের প্রধান বিষয় বা আকর্ষণ হলো রে.রে.আ। শেষের দিনে নাচ-গানসহ চলে আনন্দ বিনোদনের আয়োজন। সে সময়ে বিশেষ করে রে.রে.আ গাওয়া হয়। এটি একক বা দলবদ্ধভাবে গাওয়া হয়। রে.রে.আ'তে লেখ্যরূপ খুঁজে পাওয়া কঠিন। এটি মূলত বিবরণমূলক সংগীত বিশেষ। তবে কথার মধ্যে বিষয়ের ধারাবাহিকতা রয়েছে। কথাগুলোকে ছন্দবদ্ধ সাজিয়ে কাব্যময় করে তাতে সুর তুলে গাওয়া হয়। প্রধানত প্রেমের রে.রে.আ, শোকের রে.রে.আ, আনন্দ সময়ের রে. রে. আ এবং জাগরণিমূলক বা দেশাত্মবোধমূলক রে.রে.আ এই চার শ্রেণীর কথা বলে থাকেন অনেকেই। এটি একক এবং দ্বৈতভাবে গাওয়া হয়ে থাকে। অনেকের মতে দুইজনের রে.রে.আ বেশি আকর্ষণীয় এবং মজার হয়। যেমন :

প্রেমঘটিত রে. রে. আ (দুইজনে)

১.

ছেলে : সালধরা বিলও
বেঙ সিয়া জাগাং গাং (২)
ইয়া রে,রে খালগিবা মিছিকদে
ওয়াবা নামজা ওয়াকাংকাং (২)
হা রে রে হা রে রে।

মেয়ে : নাট্টক রিমনা রিয়াংও
মাংসা মান্‌না কৎচিয়া (২)
আংমিং রে,রে খালগিবাদে

www.pathagar.com

জাথেং সামসা চৎচিয়া (২)
হা রেরে হা রেরে

২

ছেলে : রিপ্পা না দাগোবা
উয়া পানি কাউরি (২)
নাম্মা নামজা ইন্নোবা
সিংবো আংখো চাওয়ারি (২)
হা রে রে হা রে রে।

মেয়ে : সালারামনি বন্দছি
মি্ গিরো গাঁথিয়া (২)
নাংখো আংআ নামনিকজা
দিদা গাদা বাত্তিয়া (২)
হা রে রে হা রে রে।

রে রে আ (একক) বাংলা মিশ্রণ

১.

ও...ও...ও
ধান কাটতে গেছিলাম
কাঁচি আমার ধরে না (২)
রাঙামায়া দেখিয়া
মনটা আমার মানে না (২)
হা রে রে হা রে রে।

২.

ও...ও...ও
ঢেউফানি আনচেং চর
রামা রিয়ে জানেংআ (২)
আংনি রে রে খাল্লানা
মান্দেরাংবা মিকনেংআ
হা রে রে হা রে রে।

৩.

ও...ও...ও
চ্যু মিশেং দাগোদে
রুয়ে দনবো কামালনা (২)
মাৎচা মাক্বিল ইন্নোবা
খেনজা আংআ রামানা
হা রে রে হা রে রে।

www.pathagar.com

৪.
ও...ও...ও
বিজাক চাও স্মিলা
আরংগানি গানারি (২)
রামাও বোবিল দংওবা
রামা গেল্লি রে.আরি
হা রে রে হা রে রে ।

৫.
ও...ও...ও
জাজং নাম্মা থাপ্লাংপাং
হায় খালনা গিলাখো (২)
নাম্মা নামজা ইন্নোবা
রাবো মা.আনি খাথাখো
হা রে রে হা রে রে ।

ও...ও...ও
চেংও আৎচু আম্বিদে
সালজং মিদ্দে ক্রিৎদা (২)
হায় খুরাং রাকখিনা
মানা ন্যানো মিক্‌চেদা

৬.
ও...ও...ও
আংনি নাথক রিম্মাখো
লালিয়ামিং কাজি সং (২)
নাম্মা নামজা ইন্নোবা
হারিয়াদে চিংনি সং
হা রে রে হা রে রে ।

৩. হাজংদের উৎসব

বাংলাদেশের পার্বত্য ও সমতল অঞ্চলের অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মতো হাজংরাও উৎসব প্রিয় । তারা বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের উৎসব পালন করে । এইসব উৎসব তাদের জীবনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে । উৎসবের সময় তার ভুলে যায় তাদের দুঃখ-কষ্টগুলো । উৎসবের তারা আনন্দ করে, পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করে এবং উৎসব পরিণত হয় এক মিলনমেলায় । যদিও অর্থনৈতিক কারণে অনেক উৎসব তারা এখন আগের মতো পালন করতে পারে না ।

www.pathagar.com

হাজংদের উৎসব দুই ধরনের : ক. সামাজিক উৎসব খ. ধর্মীয় উৎসব। এখানে উল্লেখ্য যে, এই দু' ধরনের উৎসবেই তারা পালন করে বাংলা প্রত্যেক মাসের বিভিন্ন সময়ে। নিচে এদের উৎসব সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হল।

হাজংদের অনেক সামাজিক উৎসব রয়েছে। এরমধ্যে পয়লা রোয়া, শেষ রোয়া, কাঁচি ধোয়া ও ধান দুকা, মসমাও খেদা, নবান্ন, চৈত্র-সংক্রান্ত, পৌষ-সংক্রান্ত, সাতা এবং কাতিগাসা উল্লেখযোগ্য। এরা কখনও শস্যের বীজ বপণ, কখনও হাল-চাষ, কখনও নতুন ফসল উঠানো, কখনও বা নতুন ঘর তৈরির সময় এসব উৎসব পালন করে। উৎসবের সময় তারা দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা, পানাহার, আমোদ, নৃত্য ও নানা রকমের গানের আয়োজন করে। গানগুলোর অধিকাংশই নারী-পুরুষ উভয়ে মিলে গায়। কিছু গান একা পুরুষরা গায়, কিছু গান দলবেঁধে গাওয়া হয় এবং কিছু গান শুধু মেয়েরা গেয়ে থাকে।

হাজংরা ধর্মীয় উৎসবও করে। তারা যেহেতু হিন্দু ধর্মাবলম্বী তাই বাঙালি হিন্দুদের ন্যায় বছরের বিভিন্ন সময়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পালন করে। এরমধ্যে রয়েছে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মী পূজা, কার্তিক পূজা, মনসা পূজা, কালি পূজা, শনি পূজা, বাসন্তি পূজা, কামাক্ষা পূজা ইত্যাদি। তবে তাদের ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে প্রধান উৎসব 'দেওয়ালী' বা 'দীপান্বিত' উৎসব। এটি আয়োজন করে শ্যামপূজার সময় বাংলা আশ্বিন-কার্তিক মাসে। এ সময় হাজং যুবরা গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মাগন মাগে এবং নানা ধরনের গান ও নৃত্যানুষ্ঠান করে। তাদেরই এই অনুষ্ঠান চলে এক সপ্তাহ ধরে। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয়। 'চোরামাগা'। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে দোল উৎসবের সময় 'হোলিগীত' পরিবেশনের মাধ্যমে আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। তখন তারা বাড়িতে বাড়িতে নেচে গেয়ে আনন্দ করে। কেউ কেউ পানাহার করে। অনেক উৎসবে আবার গারোরাও হাজংদের সাথে আনন্দ করে।

৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিয়ে উৎসব

কোচদের বিয়ে উৎসব

কোচ সমাজে মা-বাবা ছেলে মেয়ের জন্য পাত্রী ঠিক করেন। বিয়ে ঠিক করার অনুষ্ঠানকে বলে 'যাতি পিদান সানি'। বিয়ের মূল কাজ হিন্দু ব্রাহ্মণ দিয়ে করানো হয়। শুভ দিন দেখে বিয়ের তিন ঠিক করা হয়। বিয়ের দিন প্রথমেই হয় গয়াপানসানি বা চিনিপান অনুষ্ঠান। বিয়ের সময় কুঞ্জ বানানো হয়। কুঞ্জে চারটি কলাগাছ ষোলটি ঘট ও ষোলটি বাতি থাকে। বর কুঞ্জে বসেন। কনে সাত পাক দেন। বিয়ের কাজ সম্পন্ন হতে তিন দিন সময় লাগে। তিন দিনের কাজ হল। অধিবাস, বিবাহ দিবস ও জ্ঞাতি ভোজন দিবস।

গারোদের বিয়ে উৎসব

গারো সমাজে বিয়ের প্রস্তাব আসে মেয়ের পক্ষ থেকে। গারোদের একই গোত্রের ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বিয়ের রীতি নেই। রীতি অনুযায়ী বিয়ের কয়েকটি প্রথা আছে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত হলো দো-দক্কা বা মুরগি ভোজ। কোন পরিবারে মেয়ে বিয়ের যোগ্য হলে বাবা মা ও মামারা প্রথমে ছেলে খুঁজতে থাকেন। মেয়ে নিজেও ছেলে পছন্দ

www.pathagar.com

করতে পারে। একজন পুরোহিত বা খামাল বিয়ের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। খামাল প্রথমে হাতে একটি মোরগ নিয়ে কনে ও বরের পিঠে চাপড় মারেন। তারপর আবার একটি মুরগি নিয়ে বর ও কনের পিঠে চাপড় মারেন। পরে মোরগ মুরগি রান্না করে খাওয়া হয়। সঙ্গে গরু, খাসি, শূকর ইত্যাদি মেরে ভোজন দেয়া হয়। গারো সমাজে বিয়ের আরেকটি রীতি আছে। এতে মেয়ের মামার ছেলেকে জামাই হিসাবে ঠিক করা হয়। মেয়ের বাবা মেয়েকে নিয়ে মামার বাড়িতে যান। সাথে নেন মোরগ, শূকর গরু ইত্যাদি। এগুলো মেরে গ্রামবাসীকে খাওয়ানো হয়। পরে রাতে ছেলে মেয়েকে এক ঘরে থাকতে দেয়া হয়। ছেলে লজ্জাবশত পালিয়ে যেতে পারে। তাই পাহারার ব্যবস্থা রাখা হয়। গারো সাংসারেক রীতিতে আরেকটি বিয়ে হলো টুনাপা বা বাসর বিয়ে। এ রীতিতে ছেলে ও মেয়ে নিজেদের পছন্দে বিয়ে করে। অভিভাকের অনুমতি ছাড়া ছেলে মেয়ে একসাথে থাকতে শুরু করে। অবশেষে পরিবারের লোকেরা তা মেনে নেয়। এরকম আরেকটি বিয়ের রীতি হলো 'শেক্কা' বিয়ে। এক্ষেত্রেও ছেলে মেয়ে মাহারির অনুমতি ছাড়া নিজেরা বিয়ে করে।

হাজংদের বিয়ে উৎসব

হাজং সমাজে বিয়ে চার ধরনের। এগুলো হলো—স্বাভাবিক বিয়ে, হাঙা, দাইমারা ও দাইপড়া। তবে সবচেয়ে প্রচলিত হলো স্বাভাবিক বিয়ে। পরিবারের প্রধান সাধারণত এ বিয়ে ঠিক করে থাকেন। বিয়ে ঠিক করার সময় মায়ের গোত্র জানা দরকার হয়। মায়ের এই গোত্র ধারাকে হাজংগণ নিকনী বলেন। একই নিকনীতে হাজং সমাজে বিয়ে হতে পারে না। স্বাভাবিক বিয়ের অনুষ্ঠান চারটি পর্বে বিভক্ত। যেমন—গোয়া খাওয়া, অধিবাস, বিয়া, পাক পরশ বা জ্ঞাতি ভোজন। গোয়া খাওয়া : বিয়ে ঠিক করার অনুষ্ঠান। এতে বর পক্ষ বাতাসা, পান সুপারি, শাড়ি, শঙ্খের চুড়ি, সিঁদুর নিয়ে কনের বাড়িতে আসেন। এতে আত্মীয় স্বজন উপস্থিত থাকেন। সবাই মিলে কলা পাতায় বাতাসা, পান সুপারি খান।

ডালুদের বিয়ে উৎসব

বিয়ের মূল অনুষ্ঠান হয় মণ্ডপ বা কুঞ্জে। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে মণ্ডপ বানানো হয়। মণ্ডপের চার কোনায় চারটি কলাগাছ থাকে। বিয়ের অনুষ্ঠানে কন্যা দান করা হয়। কন্যার বড়ো ভাই, মামা, কাকা, জ্যেঠা কন্যা দান করেন। প্রথম দিনের বিয়েকে বলে ভরা বিয়ে। পরদিন হয় বাসি বিয়ে। এ দিনে অতিথিদের আপ্যায়ন করানো হয়। আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশীরা সামর্থ অনুযায়ী উপহার দেন। বাসি বিয়ের দিন বর বউ নিয়ে নিজ বাড়িতে যান। বিয়েতে ধর্মের মা বাপ থাকেন। আত্মীয়দের মধধ্য থেকে ধর্মের বাপ মা হন। বাসি বিয়ে শেষ হওয়ার পর ধর্মের মা বর কনেকে মিষ্টি খাওয়ান। পরে পানি খাওয়ান। এরপর পান সুপারি খাওয়ান। দুই জনকে দুই হাতে একই সাথে খাওয়ানো হয়। প্রথমবার বর-কনে তা মুখে নিয়ে ফেলে দেন। পরের বার খান। বিয়েতে ঢুলীরা বাদ্যযন্ত্র বাজান। গোস্বামী উপস্থিত থাকেন। এছাড়াও আরো একটি বিয়ের প্রচলন আছে। তার নাম হলো ডেকরা বিয়া। বর ও কনে পক্ষ একসাথে বসে এ বিয়ে ঠিক

www.pathagar.com

করেন। ডেকরা বিয়া হয় এক দিনে। এ বিয়েতে খরচ খুব কম হয়। এ বিয়ের বাসি বিয়ে। নেই। পণরোপা বা মঙ্গলাচরণও নেই।

৫. অন্যান্য উৎসব

ঈদ উৎসব

সারা বিশ্বে মুসলমানদের সবচেয়ে বড়ো ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদ উৎসব। বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য ঈদ উৎসব একদিকে তাৎপর্যময় ও অন্যদিকে আনন্দময়। মহা ধুমধাম করে এই ঈদ-উৎসব পালন করে বাঙালি মুসলমানরা। সব ভেদাভেদ, উঁচু-নিচু পার্থক্য ভুলে যাওয়ার দিন।

ঈদুল ফিতর

এক মাস সিয়াম সাধনা অর্থাৎ রমজান মাসের এক মাস রোজা পালন শেষে সন্ধ্যায় নতুন চাঁদ উঠার মধ্য দিয়ে সারা মুসলিম বিশ্বে শুরু হয় ঈদুল ফিতরের উৎসব। বর্তমান মিডিয়ার যুগে রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছে যায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সেই বিখ্যাত গানটি : 'রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ..'। এই গানটির মাধ্যমে ঘরে ঘরে শুরু হয় ঈদের মূল আমেজ। নানা রকম মিষ্টি জাতীয় খাবার তৈরির ধুম পড়ে যায় ঘরে ঘরে। রাতভর রান্না আয়োজন চলে। সকাল হলেই নতুন জামা পরে ছেলেরা ঈদগাহের মাঠে বা মসজিদে নামাজ পরতে যান। একই সারি বা কাতারে ছোটো-বড়ো, ধনী-দরিদ্র সকলেই দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে কোলাকুলি তারপর বাড়ি ফিরে ভালো ভালো খাবার একসঙ্গে বসে খান সবাই। আত্মীয়-স্বজন আসেন, খাওয়া-দাওয়া হয়। কেউ কেউ বেড়াতে বের হন। এভাবেই একদিনের আনন্দ-উৎসবটি পালন করেন প্রতিটি মুসলমান।

ঈদুল আযহা

ঈদুল ফিতরের প্রায় আড়াই মাস পর মুসলমান আরো বড়ো একটি উৎসব উদযাপন করেন—এটির নাম ঈদুল আযহা বা কুরবাণীর ঈদ। এই ঈদের বড়ো বৈশিষ্ট্য হলো পশু কুরবাণী করা। যাদের সামর্থ্য আছে তারা ঈদের নামাজ আদায় করে পশু কুরবাণী দেন অর্থাৎ গরু, ছাগল বা দুম্বা, উট ইত্যাদি কুরবাণী করেন। মাংস নিজেরা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশি ও মিসকিন বা দরিদ্র-অসহায় মানুষদের মাঝে বিতরণ করেন সকলেই। এই দিনেও আত্মীয়-স্বজন বেড়াতে আসেন—ভাল ভাল খাবার-দাবার হয় এবং আনন্দ হয়।

কোচদের পূজা-উৎসব

কোচরা সনাতন ধর্মের অনুসারী। হিন্দু সমাজের মত তাদেরও দেব-দেবী হলেন দুর্গা, কালি, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা। তাদের সবচেয়ে বড়ো পূজা হলো দুর্গাপূজা। বিশ্বকর্মা বা বসুমতি হলেন বাস্তুদেবতা। বাস্তুদেবতা দুঃখ দুর্দশা দূর করার

www.pathagar.com

দেবতা। বৈশাখ মাসে বাস্তুদেবতার পূজা করা হয়। কোচরা পূজারী বা পুরোহিতকে বলেন দেউসী। দেউসী কোচ সম্প্রদায়ের লোক। ইদানিং হিন্দু ব্রাহ্মণ দিয়েও পূজা করানো হয়। তবে হিন্দু ব্রাহ্মণের সাথে একজন দেউসী থাকেন।

তুলসী গাছ তাদের কাছে পরম পবিত্র। প্রতি বাড়িতে একটি তুলসী ঘর থাকে। বিজয়া দশমীর দিনে তুলসী ঘরে পূজা দেওয়া হয়। পাটের তৈরি নানা রকম ফুল দিয়ে ঘর সাজিয়ে আনন্দ করা হয়। কোচ সমাজে আদি দেবদেবীর পূজার প্রচলন দেখা যায়। কোচ ভাষায় দেবতাকে ওয়ায় বলে। কোচদের নানা রকম আদি দেবতা আছেন। দেবতারা হলেন, রাস্তার দেবতা লামনিওয়ার। গর্ভকালীন ব্যথা দূর করার দেবতা হুদুম ওয়ায়। সন্তান জীবিত রাখার দেবতা যুইলা ওয়ায়। এছাড়াও আছেন কানিওয়ায় বা মনসা, ওয়ায় মাগায়নি বা শীতালি ইত্যাদি।

ডালুদের বিভিন্ন পূজা-উৎসব

ডালুরা হিন্দু সমাজের মত নানা দেব দেবীর পূজা করে থাকেন। যেমন—শিব, বিষ্ণু, গোপাল, নারায়ণ পূজা ইত্যাদি। তাদের প্রাচীন দেব-দেবীরা হলেন, কেরেংকুড়ি, হয়দৈব, পথ খাওড়ি ইত্যাদি।

ডালুদের একটি পূজা হলো গোপাল-পূজা। গোপালের স্মৃতি-স্বরূপ নালিতাবাড়ির কেড়াবোঁচা গ্রামে সানুগোপাল বা সানুপাগলের আখড়া আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম সবাই সানুগোপালের নামে হাজত বা অনুদান দেন। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে দোলা পূর্ণিমার দিন হয় গোপাল পূজা। সাধ্যানুযায়ী নামকীর্তণ হয়।

ডালুদের একটি ঐতিহ্যবাহী পূজা হলো বাস্তুপূজা। এখনও এই পূজার প্রচলন আছে। বাস্তুপূজা হয় অগ্রহায়ণ মাসে। এতে দেবতার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য, মিষ্টান্ন ও খিচড়ি উৎসর্গ করা হয়। আগে পুরোহিত হিসেবে থাকতেন গ্রামের বিজ্ঞ ও দীক্ষাপ্রাপ্ত মাতব্বর। তাকে বলা হত লপটান বা পূজারী। বর্তমানে ব্রাক্ষণরা এই পূজা করেন।

নারীরা বৃহস্পতিবারে লক্ষীব্রত ও গুরুব্রত পালন করেন। শনিবারে শনিব্রত পালন করেন। আগে বিপদনাশিনী পূজা, শ্যামা পূজা বা দীপান্বিতা করা হত। দীপান্বিতা পূজায় ধানক্ষেতে বাতি দেয়া হত। গোলাঘর, রান্নাঘর, গোয়ালঘর ও বাড়িতে বাতি দেয়া হত। মুখে মুখে পাঁচালি পড়া হত। একে বলা হত মুখপুরাণ। এখন মুখপুরাণ হারিয়ে গেছে।

চরমাগা অনুষ্ঠান হত তিনদিন তিনরাত। এতে গীতালু, দেববংশী গান গাওয়া হত। গীতালু গান পরিবেশন করতেন পুরুষরা। প্রধান গায়ককে বলা হত গীতালু। খোলা, মন্দিরা, রামতাল বা বড়ো করতাল বাজানো হত। একজন পুরুষ, একজন নারী আলাদা গান পরিবেশন করতেন। দুর্গা পূজায় পালাগান হত। হরিশচন্দ্র, মনসামঙ্গ, নিমাইসন্ন্যাস, মাথুর (কৃষ্ণ লীলা), নৌকাবিলাস এসব পালাগান অনুষ্ঠিত হত।

আগে শিশু জন্মের পর একমাস অশৌচ থাকতে হত। এখন এগার দিনে বা নয় দিনে এ অনুষ্ঠান করা হয়। জন্মের ৩/৬ দিন পর নাম রাখা হয়। এতে চুল ও নখ কাটা হয়। অতিথিদের আপ্যায়ন করা হয়। মুখে ভাত দেয়ার সময় নারায়ণ পূজা করা হয়।

www.pathagar.com

বৈশাখি মেলা

বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে বৈশাখি মেলা। সম্রাট আকবরের আমল থেকেই শুরু হয়েছিল বাংলা নববর্ষ উদযাপন। সময়ের বিবর্তনে এই উদযাপন রাজ দরবার থেকে বেরিয়ে এসে পরিণত হয়েছে বাঙালির সবচেয়ে বড়ো প্রাণের উৎসবে। শেরপুরে বাংলা নববর্ষকে উদযাপন করা হয় আড়ম্বরপূর্ণভাবে। শেরপুরের নালিতাবাড়িতে উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় তিনব্যাপী বর্ণিল বৈশাখি মেলার। আর তিনদিনব্যাপী এই উদযাপনের শুরু হয় বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে। এ ছাড়া মেলা মঞ্চে লোক সঙ্গীত-বাউল সঙ্গীত, যাত্রা-নাটক, নৃত্য সহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেলা মাঠে অনুষ্ঠিত হয় লাঠিখেলা-ঘৌড়দৌড়সহ বিভিন্ন লোকজ খেলা। নালিতাবাড়ি সদর ছাড়াও পহেলা বৈশাখে শেরপুরের বিভিন্ন ইউনিয়নে বৈশাখি মেলা বসে।

বৈশাখি মেলায় নানারকম স্টল দেয়া হয়। এসব স্টলে সূচিকর্মের জিনিসপত্র, তাঁতের বিভিন্ন পোশাক, লোহার মাটির তৈজসপত্র ইত্যাদি পাওয়া যায়। এ ছাড়া পান্তাভাত, ইলিশ ভাজা, বিভিন্ন রকমপিঠাসহ, দেশীয় ঐতিহ্যবাহী খাবারের স্টলও থাকে। মেলার প্রথম দিন সবচেয়ে বেশি ভিড় দেখা যায় পান্তাভাত আর ইলিশ ভাজার স্টলে। সবাই একদিন একসাথে পান্তা-ইলিশ খাওয়ার মজাই যে আলাদা!

এসব স্টল ছাড়াও রাস্তার দু'পাশে মিষ্টি, সাজ, খই, নাড়ু বাতাশাসহ বিভিন্ন খাবার ও মাটির পুতুল, বেলুনসহ, ছোটো ছোটো জিনিসপত্রের দোকান বসে। মহিলারা লাল পেড়ে সাদা শাড়ি আর পুরুষেরা সাদা পাঞ্জাবী পরে শিশুদের নিয়ে মেলায় আসেন। মেলায় সারা দিনই কম-বেশি ভিড় দেখা যায়। মেলার এক কোণায় থাকে নাগরদোলা। নাগর দোলাকে ঘিরে বাচ্চাদের উচ্ছাস যেন মেলাকে ভিন্ন মাত্রা দেয়। খাবার ও খেলনার দোকানেও বাচ্চাদের ভিড় দেখা যায়। নালিতাবাড়িতে এভাবেই বৈশাখি মেলা ঈদ বা পূজোর মতো উৎসবের আমেজ ও আনন্দ বার্তা নিয়ে আসে!

মেলায় মানুষের আনাগোনা, কেনাবেচা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধূলা, শিশুদের আনন্দ উচ্ছাস, সব মিলিয়ে এ মেলা যেন এক মিলন মেলা বহতা নদীর মতো তুলে ধরে আমাদের সংস্কৃতি-ঐতিহ্যকে এবং এই অসাম্প্রদায়িক উৎসবই মনে করিয়ে দেয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশকে গড়ে তোলার কথা, মনে করিয়ে দেয় আমরা বাঙালি!

www.pathagar.com

আচার-অনুষ্ঠান

বাঙালির গ্রামীণ জীবনে লোকউৎসব ছাড়াও এমন কিছু আচার-অনুষ্ঠান আছে যা ঐতিহ্যগত এবং গোষ্ঠীগতভাবে পালিত হয়ে আসছে। যেমন, মুসলমান সমাজে কারো মৃত্যু হলে পালন করা হয় চল্লিশা আবার হিন্দু সমাজে কারো মৃত্যু হলে পালন করা হয় শ্রাদ্ধ। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে পালন করা হয় বিভিন্ন আচার। শেরপুর অঞ্চলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বেশ কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে।

কোচদের সূর্যার্ঘ্য অনুষ্ঠান

পরিবারে নতুন শিশুর জন্ম হলে কিছু নিয়ম মানতে হয়। জন্মের পর বাচ্চা ও মা আলাদা ঘরে থাকেন। জন্মের ১৩ দিন পর নাপিত দিয়ে বাচ্চার চুল ও নখ ফেলা হয়। মায়ের নখও ফেলা হয়। তখন বাচ্চার নাম রাখা হয়। অশৌচ দূর করার অনুষ্ঠান হলো সূর্যার্ঘ্য। মেয়েদের জন্মের ২৯ দিন পর ও ছেলেদের ২১ দিন পর করা হয় সূর্যার্ঘ্য অনুষ্ঠান। ব্রাহ্মণ দিয়ে এ অনুষ্ঠান করানো হয়।

কোচদের শ্রাদ্ধ

কোচ সমাজে মৃত্যুর পর নানা রকম কাজ করতে হয়। শ্রাদ্ধকে বলা হয় মারাকাম। সাধারণত ছেলেরাই শ্রাদ্ধ বা মারাকাম অনুষ্ঠান করে থাকেন। মৃত্যুর ১৩ দিন পর মারাকাম অনুষ্ঠান হয়। হিন্দু ব্রাহ্মণ মারাকাম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। মৃতের আত্মার মুক্তির জন্য এই অনুষ্ঠান করা হয়। শ্রাদ্ধের আগের দিন ছেলেরা মাথার চুল ফেলে। মেয়েরা নখ কাটে।

গারোদের আচার-অনুষ্ঠান-১

শিশুর জন্মের পরই গারো পিতামাতা 'দারিচিক্' নামে এক দেবীর পূজা করেন। নতুন শিশুর মংগল কামনায় এ পূজা করা হয়। মুরগি বা মুরগির ডিমের সাহায্যে এ পূজা করা হয়। দারিচিক্ পূজার মাস খানেক পরে ধাত্রীকে বিদায় দেয়া হয়। এ সময় শিশুর পিতা মাতা একটি ছোটো খাটো ভোজের আয়োজন করেন। এতে প্রচুর মদের ব্যবস্থা করা হয়। গারোরা এই মদ্যপানকে 'চুজাঙ্গী রিংঅ' বলে। এই অনুষ্ঠানে দাই ও তার সহযোগীদের প্রচুর পরিমাণে খাওয়ানো হয়। উপহার হিসাবে কাপড় চোপড়ও দেওয়া হয়। এ অনুষ্ঠানে পাড়া প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজনকে ও খাবার দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে শিশুর নাম ও রাখা হয়।

গারোদের আচার-অনুষ্ঠান-২

গারোরা সাধারণত মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে। তবে কালাজ্বর, বসন্ত, কলেরা, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ—প্রভৃতি রোগে মারা গেলে মৃত দেহ কবর দেওয়া হয়। মৃত্যুর সাথে সাথে গম্ভীর সুরে

www.pathagar.com

ধীরলয়ে 'এশম' নামক ঢোল বাজানো হয়। তার সাথে থেমে থেমে শিংগা ফুঁকা হয়। এর আওয়াজ অনেক দূর থেকে শোনা যায়। এর আওয়াজ শুনে আত্মীয় স্বজনেরা চলে আসে। তারা সাথে করে মদ, মুরগী, শুকর চাল-যে যা পারেন নিয়ে আসেন। এছাড়াও আত্মীয় স্বজন ও পাড়া পড়শীকে সংবাদ দেওয়া হয়। আত্মীয় স্বজন না আসা পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির সৎকার হয় না। এমনকি কখনো কখনো ২/৩ দিন মৃত-দেহ রেখে দিতে হয়। তবে মৃতদেহ ৩ দিনের বেশি রাখা যায় না। মৃত্যুর পর মৃতদেহের গোসল করানো হয়। মৃত ব্যক্তি ধনী হলে খাঁটি দেশি মদ দিয়ে শরীর মোছানো হয়। গরিব হলে পানি দিয়ে শরীর মোছানো হয়। বিত্তশালী মৃত ব্যক্তির দু'পাশে তার সারা জীবনের সঞ্চিত রাং সাজিয়ে রাখা হয়। গারোদের কোন কোন সম্প্রদায়ে মৃত ব্যক্তি নিয়ে শোভা যাত্রা করার রীতিও আছে। মৃত ব্যক্তির পিতা মাতা জীবিত থাকলে ছেলের সৎকারের সময় বলদ উৎসর্গ করে। মৃত ব্যক্তির জন্য বাঁশ ও কাঠ দিয়ে একটি চিতা বানানো হয়। আত্মীয় স্বজন সবাই এসে গেলে মৃত ব্যক্তিকে চিতায় তোলা হয়। পরে তাতে আগুন লাগানো হয়। পোড়ানোর পর হাড়গো একটি মাটির পাত্রে রাখা হয়। হাড়গোড় ও চিতার ছাই সহ মাটির পাত্রটি সেখানে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। পরে মূলী বাঁশের চাটাই দিয়ে জায়গাটি ঘিরে রাখা হয়। এ ছোটো ঘরকে গারোরা দেলাং বলে। মৃত ব্যক্তির কাপড় চোপড় এনে এ দেলাং—এ রাখা হয়। এছাড়াও কিছু ধান, মৃত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিস, হাড়ি-পাতিল দেলাং এ রাখা হয়। দেলাং-এ এক মাস পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ভাত, তরকারী, মদসহ নৈবেদ্য দেয়া হয়। ওয়ানগালা উৎসবের সময় 'দেলাং' পোড়ানোর সময় ওয়ানগালা উৎসবে অংশগ্রহণকারীরা 'দেলাং'—এর চারপাশে নৃত্য পরিবেশন করে। তবে খ্রিষ্টান গারোরা খ্রিষ্টান রীতিতে মৃতদেহ সৎকার করেন।

হাজংদের আচার-অনুষ্ঠান-১

হাজং সমাজে পিতাই পরিবারের প্রধান। পিতারা পরিচয়েই সন্তানরা পরিচিত হয়। পিতার সম্পত্তি পায় পুত্র সন্তানেরা। হাজং পরিবারে বয়সে সবচেয়ে বড়ো পুরুষই পরিবারের কর্তা হিসেবে বিবেচিত। তিনি পরিবারের কর্তা হিসেবে বিবেচিত। তিনি পরিবার পরিচালনা, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন। নির্দেশ দানের মাধ্যমে পরিবারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ভার তার উপরেই থাকে। হাজং পুরুষ বিয়ে করে বউ পিতার বাড়িতে নিয়ে আসেন। বিয়ের পর স্ত্রী তার গোত্র বদল করে স্বামীর গোত্র পরিচয়ে পরিচিত হন।

হাজং সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। পিতার মৃত্যুর পর সব সম্পত্তির মালিক হন ছেলেরা। ছেলে থাকলে মেয়েরা সম্পত্তি দাবি করতে পারেন না। পিতার কোন ছেলে না থাকলে সম্পত্তির মালিক হন মেয়েরা। পরে তা মেয়ে ধারায় প্রবাহিত হতে পারে। তবে উক্ত মেয়ের ছেলেরা সম্পত্তির মালিকানা পায় না। অন্যান্য ক্ষেত্রে সম্পত্তির মালিকানা হিন্দু সমাজের নিয়ম মতই। হাজং সমাজে দত্তক গ্রহণের রীতি আছে।

হাজংদের আচার-অনুষ্ঠান-২

হাজং সমাজে বাস্তুপূজা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তু হলো মঙ্গলকারী দেবদেবীর মধ্যে প্রথম। এই পূজায় কামাখ্যা দেবীর অর্চনা করা হয়। কামাখ্যা দেবী হাজং সমাজে কালী ও দুর্গার চেয়েও বড়ো। প্রতি বছর মাঘ মাসে একবার এদের পূজা দেয়া হয়। বসত ভিটা

www.pathagar.com

রক্ষা ও গ্রামের মঙ্গলের জন্য বাস্তু দেবতার পূজা করা হয়। বাস্তু দেবতাকে পূজা দেয়া ছাড়া কোন হাজং তার বাড়ি নির্মাণ করতে পারেন না।

এছাড়া হাজং সমাজে আরও নানা রকম পূজা ও উৎসব আছে। কার্তিক সংক্রান্তিতে হয় মসামাও খেদা উৎসব। গাছের ফল বা ফসল নষ্ট না হওয়ার জন্য এই উৎসব পালিত হয়। এছাড়া আছে পয়লা রোয়া। প্রথম ধান রোপণকে কন্দ্র করে এ অনুষ্ঠান হয়। এ দিন পুরুষগণ চারা সরবরাহ করেন আর নারীরা রোপণ কাজ করেন। একে অপরের গায়ে কাদা মাখামাখি করেন। মেয়েরা রোয়ালাগা গীত ও বন্দনাগীত করেন। এরপর আছে কাঁচি ধোয়া ও ধান দুকা। ফসল কাটার শেষ পর্যায়ে এ অনুষ্ঠান হয়। এছাড়া হাজংদের নানা রকম অনুষ্ঠান আছে। এগুলো আজকাল খুব বেশি দেখা যায় না।

হাজংদের আচার-অনুষ্ঠান-৩

হাজংদের কাছে তুলসী গাছ খুব পবিত্র। তাই প্রতি ঘরে তুলসী মণ্ডপ ও হরিমন্দির থাকে। প্রত্যেক হাজং পাড়ায় বাস্তু দেবতার মূর্তি স্থাপিত হয়। লক্ষ্মী, কালী, সরস্বতী, দুর্গা, মনসা, কার্তিক প্রভৃতি দেব–দেবীর বারোয়ারি পূজা হয়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে দোল উৎসবে খুব ধুমধাম হয়। কালী ও দুর্গা দেবীর চেয়েও এদের প্রিয় দেবী কামাখ্যা। কামাখ্যা দেবীর পূজায় ছাগ-মেষ বলি দেয়া হয়। হাজংরা গীতা, বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে থাকেন। প্রাচীনকালে হাজংরা নিজেরাই তালপাতায় পদ্মপুরাণ লিখতেন বলে জানা যায়।

হাজংদের আচার-অনুষ্ঠান-৪

আধিবাস : এদিন ধর্মের মা–বাপ, গীতালু, অধিকারী, আইর ও পাচক বিয়ে বাড়িতে আসেন। বাড়ির কর্তা তাদের পান সুপারি ও ধূপ ধুনার মাধ্যমে কাজের দায়িত্ব গ্রহণের আবেদন জানান। অধিকারী পূজা করেন। এদিন ঘরে আল্‌পনা এঁকে ঘর সাজানো হয়।

হাজংদের আচার-অনুষ্ঠান-৫

সন্তান জন্মের সময় মা আঁতুড় ঘরে থাকেন। জন্মর পর মা ১৩ দিন কখনও ১ সপ্তাহ আঁতুড় ঘরে থাকেন। তারপর হাত পায়ের নখ ও সন্তানের মাথার চুল নাপিত দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। ঐ দিন নাপিত ও ধাত্রীকে চাল, কাপড়, টাকা-পয়সা ইত্যাদি দিয়ে বিদায় করা হয়। অশৌচের শেষ দিন আঁতুড় ঘরে ধূপধুনা দেয়া হয়। লেপে মুছে ঘর পরিষ্কার করা হয়। পুরোহিত দিয়ে মন্ত্র পাঠ করিয়ে তুলসী জল, মা ও বাচ্চাকে খাওয়ানো হয়। একে শান্তিজল বলে। শান্তি পর্বের পরই মা বাচ্চাসহ অন্য ঘরে উঠতে পারেন।

হাজংদের আচার-অনুষ্ঠান-৬

মা বাবার মৃত্যু হলে পুত্রকে ধড় ধারণ করতে হয়। দশ থেকে তের দিনের মধ্যে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে শ্রাদ্ধের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। ঐসময় পুত্রকে হিন্দুদের প্রচলিত নিয়ম মেনে চলতে হয়। শ্রাদ্ধে আত্মীয় স্বজনদের ভোজনের মাধ্যমে সেবা করানো হয়। অনেকে ভিক্ষুকদের দান দক্ষিণা দিয়ে থাকেন। কারও অপমৃত্যু হলে কুশ পুত্তলিকা পোড়ানোর মাধ্যমে শ্রাদ্ধ করা হয়। শ্রাদ্ধের সময় পালিকীর্তন গীত হতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

এই শ্রাদ্ধ প্রথমবারের মত বিবেচিত হয়। এক বছর পর বার্ষিক শ্রাদ্ধ পালন করার নিয়ম আছে। যারা গরিব তাদের অনেকে এটি পালন করতে পারেন না। তবে ধনীরা এটি উৎসবের মত পালন করে।

ডালুদের বিয়ের আচার

ডালু সমাজে একই গোত্র বা দাফ্রার মধ্যে বিয়ে হয় না। বর ও কনের অবশ্যই আলাদা আলাদা গোত্র বা দাফ্রা হতে হবে। এদের বিয়ের পদ্ধতি অনেকটা হাজংদের মত। ষোল ঘট ষোল মুচি ও নয় জন বিবাহিত নারীরা দ্বারা বিয়ের কাজ পরিচালিত হয়। নয় জন বিবাহিত নারীকে বলে আইর। আগে সমাজের অধিকারী বিয়ের পুরোহিত হিসেবে থাকতেন। এখন ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিয়ে বিয়ের কাজ পরিচালনা করা হয়। ডালুদের মধ্যে ঘর জামাই যাবার প্রথা নেই। তাদের সবচেয়ে প্রচলিত বিয়ের পদ্ধতি হলো দেববংশী বিয়ে।

পণরোপা বা মঙ্গলাচরণ : পণরোপা অনুষ্ঠানটি হয় কনের বাড়িতে। এ অনুষ্ঠানে বিয়ের তারিখ ঠিক করা হয়। শুভ দিন ও লগ্ন দেখে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বরের বাবা ও আত্মীয় স্বজন করেন বাড়ি যান। কনের আত্মীয় স্বজনেরাও এতে উপস্থিত থাকেন। এতে সবাইকে মিষ্টি মুখ করানো হয়।

ডালুদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান

আগে ডালু সমাজে মৃত্যুর ত্রিশ দিন পর শ্রাদ্ধ করা হত। এখন ১১ বা ১৩বা ১৫ দিন পর শ্রাদ্ধ হয়। আগে ডালু সম্প্রদায়ের অধিকারী দিয়ে শ্রাদ্ধ করানো হত। এখন হিন্দু ব্রাহ্মণ দিয়ে করানো হয়। শ্রাদ্ধের আগের দিন ছেলেরা নাপিত দিয়ে মাথার চুল ফেলেন। ছেলে মেয়ে উভয়ই নখ কাটেন। শ্রাদ্ধের আগের দিন পর্যন্ত অশৌচ থাকে। এসময় ছেলে মেয়েসহ বাড়ির সবাইকে নিরামিষ খেতে হয়। দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের কম করে হলেও তিন দিন নিরামিষ খেতে হয়। ছেলেরা তেল, সাবান ব্যবহার করতে পারেন না। শ্রাদ্ধের আগে পর্যন্ত একই কাপড় পরে থাকতে হয়। শ্রাদ্ধের দিন অতিথিদের আপ্যায়ণ করা হয়। আগে মৃতের লাশ পোড়ানো হত। এখন মুখে আগুন দিয়ে কবর দেয়া হয়।

www.pathagar.com

লোকখাদ্য

গ্রামীণ লোকসমাজে চিরাচরিত প্রথায় এমন কিছু খাদ্যাভাস ও খাদ্যরুচি গড়ে ওঠে যা গোষ্ঠীগত সমাজে ঐতিহ্য হিসেবে পরিচিত, সেসব খাদ্যগুলোকে আমরা লোকখাদ্য হিসেবে অভিহিত করতে পারি।

মাছ, ভাত, ডাল প্রভৃতি বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকখাদ্য। এগুলো ছাড়াও বিশেষ বৈশিষ্ট্য গুণে ও রন্ধন শিল্পের কুশলতায় বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক লোকখাদ্য রয়েছে। যেমন, গাজর হালুয়া, আলুপুরি, দইয়ের বড়া প্রভৃতি। শেরপুর অঞ্চলেও হিন্দু, মুসলিম এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর গণসাধারণের ঐতিহ্য ও রুচির সঙ্গে খাপ খাইয়ে কিছু লোকখাদ্য রয়েছে।

বাঙালির লোকখাদ্য

'মাছে ভাতে বাঙালি'—এটিই বাঙালির প্রধান খাবার। ধান থেকে চাল, চাল থেকে ভাত। কাউনের চাল দিয়েও ভাত হয়। আর মাছ–বাংলাদেশের শত শত নদ-নদীতে বহু প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। সেই মাছ ধরে বাঙালিরা উচ্চারণ করে–'ধরিবো মাছ, খাইবো ভাত, থাকিবো সুখে'।

মাছ, মাংস, শাক-সবজি, ডাল এগুলোই বাঙালির নিয়মিত প্রধান খাবার। ভোজন রসিক বাঙালিরা নির্দিষ্ট খাবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সময়, পর্ব, উৎসব, স্থান ও অভ্যাসবশত নানা রকম, ভিন্ন স্বাদের এবং বৈচিত্র্যময় খাবার তৈরি, পরিবেশন ও খেয়ে থাকে। বর্তমান আধুনিক যুগের বিভিন্ন দেশের খাবার এদেশে প্রচলন হলেও, বাঙালিরা তাদের নিজস্ব খাবার থেকে দূরে সরে যায়নি।

বিশেষ করে বছরের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঋতুতে নানা রকম উৎসব ও পালা-পার্বণে বাঙালির ঘরে তৈরি হয় অনেক প্রকার সুস্বাদু খাবার। আবার অঞ্চলভেদে খাবারের রয়েছে পার্থক্য।

এসব খাবারের মধ্যে রয়েছে–পিঠা-পুলি, চিড়া-মুড়ি, খই-নাড়ু, পোলাও-বিরিয়ানি, খির-পায়েশ ইত্যাদি। উৎসবগুলোর মধ্যে রয়েছে–বাংলা নববর্ষের বৈশাখি উৎসব, নবান্ন উৎসব, পৌষ উৎসব, চৈত্র-সংক্রান্তি উৎসব। এসব উৎসবে উপলক্ষে নানা রকম খাবার তৈরি ও আয়োজন করা হয়।

শেরপুর জেলার প্রত্যেক অঞ্চলে উল্লিখিত খাবারের পাশাপাশি নিজস্ব কিছু খাবার তৈরি ও খাওয়া হয়। যেমন–ভাতের পাশাপাশি বগুনি, চাউলা বিরান, ভুনা খিচুরি, কাউনের ভাত, খুদি প্রভৃতি। খুদি নিয়ে একটি প্রচলিত ছড়া এখানে রয়েছে—

www.pathagar.com

'রাজা মশায়
রাজা মশায়
যান তো যান,
না যান তো
না যান
ক্ষুদিরাম বাবু
জোড়ালোপুর
নগর হইতে
পানসি হইয়া যান'।

ভাতের সাথে সাধারণ তরকারি রয়েছেই, আরো আছে–নারিকেল চিড়া, চিংড়ি মাছের বড়া, কাঁঠাল চিংড়ি তরকারি, টাকি মাছ ও মূলা ভর্তা, টাকি মাছ ও কালি জিরা ভর্তা, মাছ আলু ও মাংস তরকারিকের। ডালের মধ্যে মাশ, মশুরি, মুগ, খেশারি ইত্যাদি। শাকের মধ্যে রয়েছে–পাট শাক, লাউ শাক, মূলা শাক, দণ্ড শাক, বত্তে শাক, বুরবুরি শাক, এলেঞ্চা শাক, সরিষা শাক, পালং শাক, কচু শাক, সজনে শাক ও কলমি শাক। কলমি শাক নিয়ে একটি প্রচলিত ছড়া—

কলমি লতা কলমি লতা
জল শুকালে থাকবে কোথা?
থাকবো থাকবো কাদার তলে
লাফ দিয়ে উঠবো বর্ষা কালে'।

পিঠা। পিঠা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতই বিভিন্ন উৎসব-পার্বণে শেরপুর অঞ্চলেও হয়ে থাকে। এ অঞ্চলের পিঠার মধ্যে রয়েছে–পুলি পিঠা, চিতই পিঠা, পানা পিঠা, তালের পিঠা, তিলের গোটা পিঠা, চুই পিঠা বা দুধ সেমাই, দুধ পুলি, শিল পিঠা, তেলের পিঠা, পোয়া পিঠা, চাপড়া পিঠা প্রভৃতি। মধুমাসে বা জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল-ফলাদির সময় এ অঞ্চলে নানা রকম খাবার তৈরি হয়। যেমন একটি খাবার পাকা কাঁঠাল, দই ও খই মিশিয়ে মজা করে খাওয়া হয়। এ নিয়ে একটি প্রচলিত ছড়া–

'খই আর দই
পাকা কাঁঠাল কই
গাছে আছে পাকা কাঁঠাল
পাইরা আনি মই পাই কই'।

কোচদের লোকখাদ্য

কোচরা সাধারণত ভাত, ডাল, শুঁটকি মাছ, আলু ও অন্যান্য শাক সবজি খান। তাছাড়া পাঁঠা, খাসি ও ভেড়ার মাংস খান। ফাঁদ দিয়ে হরিণ ও বন্য শূকর শিকার করে মাংস খেয়ে থাকেন।

কোচরা শূকরের মাংস খান তবে শূকর পালন করেন না। এ ছাড়া তারা কচ্ছপ ও কুচিয়া খান। শুঁটকি মাছ কোচদের প্রিয় খাবারের একটি। তারা শুটকি মাছকে বলেন

www.pathagar.com

নাসাউ। বিন্নি ধানকে বলেন আঠামাই। পূজা ও সামাজিক অনুষ্ঠানে মদ পানের প্রচলন আছে। মদকে তারা বলেন মেরা। যে পাত্রে মদ রাখা হয় তার নাম মারাং। নিজেদের তৈরি মদ হল–জান্তি মেরা, নামখন মেরা, চিটা মেরা।

গারোদের লোকখাদ্য

গারোদের প্রধান খাদ্য ভাত। এর সাথে মাছ মাংস ডাল শাক সবজি। নাখাম্ অর্থাৎ শুঁটকি মাছ গারোদের প্রিয় খাদ্য। পুঁটি মাছের নাখাম্ই সবচেয়ে প্রিয়। মাংসের মধ্যে শুকরের মাংস সব চেয়ে প্রিয়। তাছাড়া তারা গরু ও মুরগীর মাংস খান। তবে এখন গরুর মাংস খাওয়ার চল কমে গেছে।

ভাত রান্না হয় মাটি বা এলুমিনিয়ামের হাঁড়িতে। কচি বাঁশের চুঙ্গাতেও ভাত সিদ্ধ করা হয়। পাহাড়ি গারোরা আগে কলা পাতায় খাওয়া-দাওয়া করতেন। পানি খাওয়ার জন্য ছিল পাকা লাউয়ের খোল। বর্তমানে মাটির কলসি ও ধাতুর বাসন ব্যবহার করা হয়। শহরের বাসিন্দারা আধুনিক জিনিসপত্র ব্যবহার করেন।

পাহাড় এলাকায় বিভিন্ন স্বাদের আলু পাওয়া যায়। যেমন–থামান্দি, থাবাংগুল, থাবলুচ, থামলা, থাগিচছাক্, থাজা প্রভৃতি। পাহাড়ে কলা, কাঁঠাল, আনারস, তরমুজ, ফুটি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। যা তাদের সাধারণ খাদ্য হিসেবে পরিচিত।

গারো সমাজে দেশি পঁচুই মদের খুব প্রচলন আছে। সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে পঁচুই মদ খাওয়া হয়। যে কোন ধরনের আতপ চালে মদ তৈরি করা যায়। মিমিত্তিম্ বা বিন্নি ধানের চাল হতে ভাল মদ হয়। চাল ছাড়া মিসীমি বা কাউনও গারোরা মদ তৈরি করেন। মদকে গারো ভাষায় "চুবিচ্ছি" বলে।

হাজংদের লোকখাদ্য

ভাত, ডাল, ছাড়াও হিদল বা পুঁটি মাছের শুটকি হাজংদের খাবার। বিন্নি ধানের ভাত তাদের বেশি প্রিয়। হাজংরা চালের গুঁড়া, হিদল ও খাবার সোডা দিয়ে তৈরি করেন লেবাহাক। লেবাহাক দেখতে হালুয়ারা মত।

এছাড়াও আছে বগ্নি ভাত। বগ্নি ভাত পানিতে ভেজানো আউশ ধান থেকে তৈরি করা হয়। একে পচা চালের ভাতও বলে। এই ভাত খেতে মিষ্টি লাগে ও বেশি খেলে একটু নেশা হয়। নারীরা বাড়িতে নানা রকম পিঠা তৈরি করেন। হাজং সমাজে মদের প্রচলন আছে। তারা নিজেরা পচা ভাত দিয়ে পঁচুই মদ তৈরি করেন। এছাড়া গুড় দিয়ে তৈরি করেন পোড়া মদ।

ডালুদের লোকখাদ্য

ডালুদের প্রধান খবার ভাত, মাছ, ডাল ইত্যাদি। ঐতিহ্যবাহী খাবারের মধ্যে আছে খারপানি। এছাড়া আছে চালের গুঁড়ির সাথে খাবার সোডা মিশিয়ে তৈরি করা লেবাহাক। আছে গাঁজাহাঁক, বাঁশের কেড়ইল, চইনশিয়া বা কলাগাছের মাজা, শুঁটকি, হিদল ইত্যাদি। ডালু সমাজে কুচিয়া, কচ্ছপ ও শূকরের মাংস খাওয়ার ও প্রচলন আছে। ডালু সমাজে অনেকে নিরামিষ খাবার খান।

www.pathagar.com

গারো পরিবারে মিমিদ্দম রিদ্দা (বিন্নি ভাত রান্না)

www.pathagar.com

লোকনাট্য

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে শেরপুর অঞ্চলে মঞ্চগান বা লোকযাত্রার ব্যাপক প্রচলন ছিল। যাকে আমরা লোকনাট্য হিসেবে অভিহিত করে থাকি। এ অঞ্চলের লোকনাট্যকে আমরা রংপুর অঞ্চলের ঝুমুর গানের সাথে তুলনা করতে পারি। তখনকার দিনে মানুষকে প্রতিযোগিতা করে বেঁচে থাকতে হয়নি। মানুষের অবসর ছিল প্রচুর। তাই গানই ছিল মানুষের বিনোদনের একমাত্র অবলম্বন। লোকনাট্যে নারীদের ভূমিকা সবসময় পুরুষ দিয়ে করানো হত। লোকনাট্য বা মঞ্চগানে নায়ক নায়িকাকে ছুকরা-ছোকরি বলা হতো। মঞ্চগানে হারমোনিয়াম, ঢোল, খোল, পরতাল বা জরি, বাঁশি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হতো। মঞ্চগানে সকল পাত্র-পাত্রীকে সংশ্লিষ্ট পোশাক পরিধান করত। মঞ্চগানে নায়ক নায়িকা গানের মাধ্যমে এবং অন্যান্য পাত্র-পাত্রী কথপোকথনের মাধ্যমে তাদের আবেদন প্রকাশ করত। তবে কখনো কখনো বিবেকের ভূমিকায় একজনকে গান পরিবেশন করতে দেখা যেত। এ অঞ্চলের মঞ্চগানগুলোর পালার নাম : কৃষ্ণলীলা, নৌকা বিলাস, মানভঞ্জন কংসবধ, নিমাই সন্ন্যাস, সাগর ভাসা, পুষ্প মালা, মেহের নিগার, আলোমতি, আলোমতি প্রেম কুমার, শাহ্-এমরান চন্দ্রাভান, গফুর বাদশা-বানেছা পরী, লাল ভানু, জরিনা সুন্দরী, আনোয়ারা, ফুল কুমারী, সুখি সোনা, ফুল মালা, অবং দুলাল, কাঞ্চন মালা ইত্যাদি।

মঞ্চগান বা লোকযাত্রা পালাগুলোর বেশিরভাগই পুথিনির্ভর। এখানে যে মঞ্চগানটি পরিবেশন করা হলো সেটার নাম মেহের নিগার। গানটি সংগ্রহ করা হয়েছে—গানের মাস্টার মো. জহুর হকের কাছ থেকে। তিনি প্রাক্তন মেম্বর, তার পিতার নাম : মৃত আব্দুল মণ্ডল, গ্রাম : খাটিয়া ডাঙ্গা, ডাকঘর : কাকিলাকুড়া বাজার, থানা : শ্রীবরদী, জেলা : শেরপুর। তার বর্তমান বয়স ৬৫ বছর। তার বাড়িতে দশ বার দিন যাতায়াতের পর মেহের নিগার ও আলোমতি গান দু'টির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা গেছে।

১. মেহের নিগার

বন্দনা : আমরা প্রথমে বন্দনা করি আল্লা নবীর নাম
তার শেষে বন্দনা করি রসুলের চরণ।
আমরা পূবেতে বন্দনা করি ভানুবার শহর
একদিকে উদয় ভানু চৌদিকে উষনাই। ঐ
আমরা দক্ষিণে বন্দনা করি দরিয়ার সাগর
সেই সাগরে চালায় ডিঙ্গা সাধু সওদাগর। ঐ
আমরা পশ্চিমে বন্দনা করি কাবার শহর

www.pathagar.com

সেই কাবাতে পড়ত নামাজ রসুল পয়গম্বর । ঐ
আমরা উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত
সেই পর্বতে লইল জনম মালঞ্চের পাথর । ঐ
আমরা চার কোনা বন্ধনা করি আসর করলাম স্থির
পাতালে বান্দিয়া আরো আশি হাজার পীর । ঐ
এই আসরে আছেন যারা সুধী মহাজনে
চিত্ত দিয়ে শোনেন সবে মেহের নিগার গান । ঐ

(বিবেকের প্রবেশ)

গান : আরব দেশেতে ছিল ইরান শহর
তথায় বসত করে নামে খোরশেদ রাজা–হায়গো
মালমাত্তা হস্তী ঘোড়া ছিল বেশুমার
বারেক আল্লাহ হইল দয়া তাহার ই উপর–হায়গো
এক বেটা এক বেটি ছিল তাহার ঘরে (২ বার)
রাখিল বেটির নাম মেহের ই নিগার–হায়গো
কী বলব তার রূপের কথা যেন হুর পরী (২ বার)
রূপ দেখিয়া লজ্জা পায় পরিস্থানের পরী–হায়গো
পরীস্থানের পরী গো (২ বার)
রূপ দেখিয়া লজ্জা পায় পরীস্থানের পরী গো ।(প্রস্থান)

(খোরশেদ রাজা ও উজিরের প্রবেশ)

রাজা : উজির সাহেব রাজ্যের সংবাদ কী?

উজির : রাজ্যের সংবাদ অতি শুভ জাঁহাপনা । প্রজারা সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করছে । এতে কোন বিকল্প নেই জাঁহাপনা ।

রাজা : আছে, আছে উজির সাহেব । আমি ভেবে দেখলাম যে জাতি যত শিক্ষিত সে দেশ ততো উন্নত । তাই আমি স্থির করেছি আমার বাড়ির সম্মুখে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করবো । আপনি কাল বিলম্ব না করে আজই কারিগর ডেকে স্কুল নির্মাণের কাজ আরম্ভ করে দিন ।

উজির : সেজন্য আপনি কোন চিন্তা করবেন না জাঁহাপনা । আমি আজই কারিগর ডেকে স্কুলের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করব ।

রাজা : আমি এখন আসি উজির সাহেব । (প্রস্থান)

উজির : এই কে আছিস ।

(দারোয়ানের প্রবেশ)

দারোয়ান : আদেশ করুন জাঁহাপনা ।

উজির : যাও দারোয়ান তুমি এই মুহূর্তে ভাল দেখে দুইজন কারিগর ডেকে নিয়ে এসো ।

দারোয়ান : আমি তাই যাচ্ছি জাঁহাপনা ।

www.pathagar.com

(গাইতে গাইতে দ'জন কারিগরের প্রবেশ)

আমার নামটি মনোহর মিস্ত্রী মনিপুরে বাড়ি
ও মিস্ত্রীর কাজ করি গো দেশ বিদেশে ঘুরি
নাও গড়াই জাহাজ গড়াই রেলের গাড়ি
খোরশেদ রাজার খবর পেয়ে গো
চলছি ধীরে ধীরে গো মনিপুরে বাড়ি।

মনোহর : সালাম জাঁহাপনা। আমাদের কী জন্যে স্মরণ করেছেন?

উজির : শুন মিস্ত্রী, রাজ বাড়ির সম্মুখে একটা নতুন স্কুল গঠন করা হবে। তোমরা পারবে স্কুলের নির্মাণ কাজটি করিয়া দিবে?

মনোহর : পারব না কেন জাহাপনা? ঘর, বাড়ি, স্কুল, কলেজ, নৌকা, সেতু এগুলি তৈরি করাইতো আমাদের কাজ। আপনি টাকা দিবেন আমরা কাজ করে দিবো।

উজির : তাহলে বলো কত টাকা চাই তোমাদের?

মনোহর : জাঁহাপনা, আপনি দশ হাজার টাকা দিবেন, আমরা কাজ করে দিব।

উজির : ঠিক আছে, তোমাদের দশ হাজার টাকাই দিব, তোমরা কাজটি ভাল করে করে দিবে। এই নাও সাত হাজার টাকা, অগ্রিম দিয়া দিলাম। আমি এখন আসি। (প্রস্থান)

মনোহর : আমি তাহলে আসি। (প্রস্থান)

মনোহর : আরে ও মালতি মালতি, না, ডাকলেও শোনে না।

গান আমার মালতি এতি একটু আসো গো (২ বার)
এতি একটু আসো গো ও ও ও (২ বার)

(মালতির প্রবেশ পথে গান)

ও উঠো নাথ পড়ে কেনো ডেকেছ আমায় (২ বার)
ডাক শুনিয়া প্রাণ কান্দে গৃহে থাকা দায়
ও উঠো নাথ। ঐ

মালতি বলি অমন করে ষাঁড়ের মতো চেচাচ্ছো কেন? তাই কই।

২. মনোহরের গান

দে দে দে মালতি ধার দিয়া দে (২ বার)
যন্ত্রপাতি ধার দিয়া দে
দে দে দে মালতি ধার দিয়া দে – ঐ
রাজ বাড়িতে কাজ করতে যাবো দে, দে, দে ... ঐ

মালতির গান

আমি পারবো নাহে (২ বার)

www.pathagar.com

যন্ত্রপাতি ধার দিতে আমি পারবো না হে।
পারবো না হে।

মনোহর : আরে মালতি পারবি না কেন? তাই ক'

মালতি : কেন পারবো? তোমার কি মনে নাই? গত বছর আমাকে নাকের নথ কানের দুল, কোমরের বিছা, হার বানাইয়া দিতে চাইছিলে, কিন্তু কই একটাও তো দাও নাই।

মনোহর : শালার মাগী, কস কী, গত বছর আকালের চুটে তামাকের বীচি ঢুকে নাই। আর মাগী বরই এর বীচি ঠেইল্ল্যে দিবের চাস। তোর কথা শুনে আমার মনে কয় এই বাইস্যের জ্যোতি দিয়ে আগা পাছা ঝাইড়া দেই।

মালতি : আহারে আমার মরদ রে। আমারে কয় আগা পাছা ঝাইড়া দিমু। এইতো আমিও আমার বাপের বাড়ি চল্লাম। দেখি আমারে কে ফিরায়। (প্রস্থান উদ্যত, মনোহর টেনে ধরে)

মনোহর : আহারে আমার পরানের বউরে। তুই আমারে ছাইড়ে যাসনে। তুই চইলা গেলে আমি যে পরানে মইরাযামু। জানিস এবার না কাজ পেয়েছি। একবারে রাজ বাড়ির কাজ। দশ হাজার টাকা দিবো।

মালতি : তাই নাকি?

মনোহর : আরে হে, দেখবি এবার কাজ করে তোর না সব গহনা তৈয়ার করে দিমু। দে এবার যন্ত্রগুলো।

মালতি : ধার দিয়া দিমু। তার আগে না আমার একটা কথা আছে।

মনোহর : আরে মালতি, তোর একটা কেনো ১০টা কথাও আমি রাখবো। বল তোর কী কথা।

মালতি : (জড়িয়ে ধরে) আমাকে না রসগোল্লা খাওয়াতে হবে।

মনোহর : গান...

আমার মালতি রসগোল্লা খাবে
আমার মালতি রসগোল্লা খাবে
ছাগলেরই নাদার মতো মিস্ত্রীদানা খাবে গো
মিস্ত্রীদানা খাবে এ...এ...
আমার মালতি ... ঐ,

মনোহর : মালতী তোরে না রসগোল্লাও খাওয়াবো। যন্ত্রগুলো ধার দিয়া দেয়।

মালতি : (যন্ত্রগুলো নিবে দিবে) এই নাও ধার করে দিলাম। এখন কাজে যাও আবার মনে থাকে যেন। (প্রস্থান)

মনোহর : কইরে সোনাহার। শালা বাড়ি গেলে আর আসতে চায়না। আগে আসুক। (সোনাহারের প্রবেশ)

www.pathagar.com

সোনাহার : এইতো ভাই । আমি আইয়া পড়ছি ।

মনোহর : নে কাজ ধর । কোন সময় বাদশা এসে পড়ে । এখনি কাজ শেষ করতে হবে ।

গান
ওগো ঘর তুলিলাম সারি সারি
স্কুল করলাম রাজ বাড়ি (২ বার)
ঘর তুলিলাম... ঐ
ওগো বাহিরেতে নকশা করি (২ বার)
বাঘ ভালুক আর রাজার ছবি (২ বার)
বাহিরেতে নকশা করি... ঐ
(খোরশেদ রাজা ও উজিরের প্রবেশ)
(মেহের নিগার বন্দনা :)
কী । এখনো তোমাদের কাজ শেষ হয়নি?

সোনাহার : এই, এইতো জাঁহাপনা । আর মাত্র একটা লোহা মেরে দিলেই শেষ । (লোহা মারবে) এইতো জাঁহাপনা কাজ শেষ এখন । আপনি দেখুন কেমন কাজ হয়েছে ।

খোরশেদ : বেশতো চমৎকার কাজ হয়েছে ।

মনোহর : জাঁহাপনা । বাহিরে চতুর্দিক ঘুরে দেখুন ।

খোরশেদ : উজির সাহেব চলুন চতুর্দিক ঘুরে দেখা যাক ।

উজির : তাই চলুন ।

খোরশেদ : (ঘুরে) দেওয়ালে এই সব জানোয়ারের ছবি কেন?

মনোহর : বয়াদবি মাফ করবেন জাঁহাপনা । ডাইনে সিংহ, বামে বাঘ, পিছনে ভালুক আর সম্মুখে দেখুন আপনার ছবি একে দিয়েছি । এই সব জানোয়ার সর্বদাই আপনার ছবি পাহারা দিবে । আপনি মারা গেলেও জিন্দা থাকবেন ।

খোরশেদ : উজির সাহেব, ওদের কাজ দেখে আমি যে একেবারেই অবাক হয়ে গেলাম । এই নাও মিস্ত্রি, আমি তোমাদের কাজে খুশি হয়ে ৫০ হাজার টাকা বকশীষ দিলাম ।

মনোহর : জাঁহাপনার জয় হোক । (প্রস্থান)

খোরশেদ : উজির সাহেব–উত্তম স্কুল গঠন করা হয়েছে । এখন আপনি আর বিলম্ব না করে ভাল দেখে মাস্টার এনে লেখাপড়ার কাজ আরম্ভ করুন ।

উজির সে জন্য আপনি কোন চিন্তা করবেন না জাঁহাপনা । আমি আগামীকাল মাস্টার ডেকে স্কুলে লেখাপড়া শুরু করে দিবো । চলুন জাঁহাপনা আমরা এখন বিশ্রাম করি গে ।

খোরশেদ : তাই চলুন উজির সাহেব । উভয়ে প্রস্থান ।

(খুশু মেহের নিগারের ছাত্র বেশে প্রবেশ ।)

www.pathagar.com

মেহের স্কুলের যে সময় বয়ে যায়। এখনো যে স্যার আসছে না।

খুশু আজ মনে হয় আসবে না। চল মেহেরী আজ আমরা বাড়ি চলে যাই।

(ভুলু পাগলের প্রবেশ)

ভুলু আরে কই যাইবা? আমিতো আইয়া পড়ছি।

মেহের এই পাগল তুই এসে কী করবি? তুই কি পড়াতে পারবি?

ভুলু আবার কয়। পারমু না তো এমনি এসেছি। জানিস মেহেরী আমি না আসার সময় স্যার আমাকে ডেকে বল্লেন। আজ আমার বাড়িতে কাজ। স্কুলে যেতে দেরী হবে। তুই খুশু ও মেহেরীকে পড়াবি। দে তোর খাতা দে আমি লেখে দেই। (নিবে+দিবে) দে খুশু (নিবে+দিবে) এখন লেখা দেখে দেখে পড় আমি একটু ঘুমায়। (চেয়ারে বসবে)।

(মাস্টারের প্রবেশ)

মাস্টার : এই পাগল তুই ওখানে কেন রে? মাস্টার হয়েছিস?

খুশু : স্যার দেখেন ভুলো আমার খাতায় কী লিখে দিয়েছে। (দিবে)।

মাস্টার : এই পাগল খুশুর খাতায় এই সমস্ত কী লিখে দিয়েছিস? বেয়াদপ (মারবে)।

ভুলো স্যার, মারবেন না মারবেন না স্যার আমি ভাল পড়া দিয়েছি।

মাস্টার ভাল পড়া দিয়েছিস তা কচু দিয়েছিস বল। দেখি কী দিয়েছিস?

ভুলো স্যার, খাতায় লেখা আছে চুলেবালে ঢাকা উদাম করলে মাঝে ফাটা। ভিতরে দিলে আঠা আঠা ভিতরে দিলে লাঘে মিঠা।

মাস্টার : এই বেয়াদব এটা কী পড়া হল?

ভুলো : স্যার আমি বলি আপনে শুনেন কৃষক যখন গমের ফসল করে সেই গমের মাথায় চুলের মতই থাকে, গমের ওপর ছাল থাকে ছাল ফেলাইয়া দিলে মাঝখানে ফাটা দেখা যায়। ঠিক না স্যার?

মাস্টার : হ্যাঁ, ঠিক।

ভুলো : আবার গম কলের ভিতরে দিলে গুড়া হয়ে আটা হয় আটা দিয়া পিঠা করে মুখে দিলে মিঠা লাগে। ঠিক না স্যার?

মাস্টার হ্যাঁ ঠিক, দেখি মেহেরী তোমার খাতায় ভুলো কী লিখে দিয়েছে। (নিয়ে)। এই পাগল মেহেরীর খাতায় এসব কী খারাপ কথা লিখে দিয়েছিস।

ভুলো স্যার, একটাও খারাপ না স্যার মেহেরীকে পড়া দিয়েছি–চিৎ করে শোয়াইয়া জাইত্যা ধড়ে ওবোধ হইয়া এমনি করা করে তার সমস্ত শরিরটাই নড়ে।

মাস্টার বের হ বের হ পাগল তুই আর এক মুহূর্ত থাকতে পারবি না, যা বলছি।

ভুলো আপনি না বুঝে আমাকে শুধু শুধু বাইর করে দিবেন?

মাস্টার তাহলে তুই বুঝিয়ে বল দেখি।

www.pathagar.com

ভুলো স্যার মেহেরীর খাতায় লেখে দিছি–আমি বুঝিয়ে বলি আপনি কান পেতে শুনেন। মেয়েলোক যে সময় মসলা বাটে তখন পাটাখানা চিৎকরেই শোয়ায় আর পোতাটা ওবুধ হইয়া জাইত্যা ধরে। ঠিক না স্যার?

মাস্টার হ্যাঁ ঠিক।

ভুলো তারপরে দুই হাতে এমন এমন করে ঘষাঘষি করে তখন মেয়েটার সমস্ত শরীর কিন্তু নড়ে। কী মেহেরী ঠিক না।

মাস্টার হ্যাঁ হ্যাঁ পাগল তোর মাথায় খুব বুদ্ধি আছেরে। থাক আজ তোমাদের স্কুল ছুটি দেওয়া গেল আগামীকাল সময় মত স্কুলে এসো। (ছাত্র/ছাত্রীর প্রস্থান)।

মাস্টার : এ আমি কী দেখলাম মেহের নেগারীর রূপ যৌবন দেখে আমার শরীরের শিরা উপশিরা আগুন ধরে গেছে। যেমন করেই হোক ছলে বলে কৌশলে ঐ রাজকুমারী মেহের নিগারীকে আমার পেতেই হবে। তা না হলে আমার জীবন বৃথা। বৃথাই আমার বেঁচে থাকা আমাকে এমন চাল চলতে হবে যেন রাজকুমারী মেহের নেগার অনায়াসে আমার হাতের মুঠোয় এসে পরে। হাঃ হাঃ হাঃ (প্রস্থান)।

(খোরশেদ রাজা ও উজিরের প্রবেশ)

খোরশেদ : উজির সাহেব বলতে পারেন আমার খুশু ও সাহাজাদীর মেহেরনেগারী লেখাপড়ায় কত দূর অগ্রসর হয়েছে?

উজির জাঁহাপনা আমি জানতে পেরেছি আপনার ছেলে-মেয়ে উভয়ই লেখাপড়াই খুবই পারদর্শী ঐ তো জাঁহাপনা মাস্টার সাহেব এ দিকেই আসছে। তার কাছেই সব জনতে পারবেন।

(মাস্টারের প্রবেশ)

মাস্টার : সালাম জাঁহাপনা।

খোরশেদ : আলাইকুম। বসুন মাস্টার সাহেব। এতক্ষণ আপনার কথাই ভাবছিলাম। বলুন মাস্টার সাহেব আমার ছেলে-মেয়েকে কেমন শিক্ষা দিয়েছেন?

মাস্টার জাঁহাপানা। আমি আপনার ছেলেমেয়েকে আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছি। জাঁহাপানা আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই। আপনি অভয় দিলে আমি বলতে পারি।

খোরশেদ : মাস্টার সহেব, আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন।

মাস্টার : জাঁহাপানা। রাজকুমার খুশু যে বিদ্যা অর্জন করেছে, তার আর কোন পুঁথিগত বিদ্যার দরকার নাই। তাই আমি বলতে চাই খুশুকে সঙ্গে নিয়ে আপনি কিছুদিনের জন্য বাণিজ্যে যান। কারণ রাজকার্য পরিচালনা করতে হলে বাণিজ্য শিক্ষারও প্রয়োজন মনে করি জাঁহাপানা।

খোরশেদ : মাস্টার সাহেব। আপনি উত্তম কথাই বলেছেন, তবে খুশুকে সঙ্গে করে বাণিজ্যে গেলে, আমার মেয়ে মেহের নিগারীকে কে দেখাশুনা করবে? আর একা একা কীভাবে থাকবে?

www.pathagar.com

মাস্টার : কেন জাঁহাপানা। আপনার মেয়ে মেহের নেগারী সেতো আমার মেয়ের মতো। আমি রাজকুমারীকে দেখে শুনে রাখবো। আপনি আমার উপর বিশ্বাস রেখে বাণিজ্যে যেতে পারেন।

খোরশেদ : হ্যাঁ, মাস্টার সাহেব। আমি তাই করবো। উজির সাহেব আপনি খুশুকে ডেকে আজই বাণিজ্যে যাবার ব্যবস্থা করুন।

উজির এই কে আছিস। শাহাজাদা খুশুকে পাঠিয়ে দে।

(খুশু ও মেহেরীর প্রবেশ)

খুশু : আব্বা। আমায় কী জন্য স্মরণ করেছেন?

খোরশেদ : বাবা খুশু আমি স্থির করেছি, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে কিছু দিনের জন্য বাণিজ্যে যাবো।

খুশু না, আব্বা তা হয় না। মেহেরীকে একা বাড়িতে রেখে বাণিজ্যে যাওয়া কিছুতেই ঠিক হবে না, বলে আমি মনে করি।

মাস্টার : বাবা খুশু তুমি ছেলে মানুষ। অতো সব বুঝবে না। কারণ তোমরা যদি বাণিজ্যে না যাও, তাহলে অচিরেই রাজকোষ শূন্য হয়ে যবে। ফলে রাজ্যে দেখা দিবে দুর্ভিক্ষ। তখন রাজ্য পরিচালনা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তাই আমি তোমাকে অনুরোধ করে বলছি, জাঁহাপানার কথায় তুমি অমত করো না।

খোরশেদ : বাবা খুশু, মেহের নিগারীর দেখা শুনার ভার যখন মাস্টার সাহেব নিয়েছে, তখন আর চিন্তার কিছু নেই।

মেহের আব্বা আমিও আপনাদের সঙ্গে বাণিজ্যে যাব।

মাস্টার না, মা না। তুমি জাঁহাপানার সঙ্গে বাণিজ্যে গেলে লোক সমাজে জাঁহাপানার উঁচু মাথা নিচু হয়ে যাবে। জাঁহাপানা বাণিজ্যে থেকে ফিরা পর্যন্ত আমি তোমাকে দেখাশুনা করবো। কোন অসুবিধা হতে দিব না।

খোরশেদ : মা মেহের নেগার। তুমি আজ থেকে মাস্টার সাহেবের কথা মত চলবে। আর ভালভাবে লেখাপড়া করবে। চলুন উজির সাহেব আমরা এখন বাণিজ্যের জন্য তৈরি হয়ে রওনা হয়ে যাই।

মাস্টার চলুন জাঁহাপানা আমি আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

উজির তাই চলুন। (সকলের প্রস্থান)।

(মেহেরীর পিছে ভুলোর প্রবেশ)

ভুলো মেহেরী তুই এসেছিস? তাহলে তুই এখানে বস। আমি তোর পড়া নেই।

মেহের এই ভুলো। তোর পড়া আমার কোন দরকার নেই। আমি স্যার এলেই পড়বো।

ভুলো এ বল্লেই হল, স্যার এলে পড়বি। তোর স্যার এলে তো পড়বি। জানিস স্যার আমাকে কী বলে দিয়েছে?

মেহের স্যার তোরে কী বলে দিয়েছে?

www.pathagar.com

ভুলো স্যার আমাকে আসার সময় বলে দিয়েছে, ভুলোরে তুই মেহেরীকে পড়া দিস্। তোর পড়া খুব ভালো।

মেহের সত্যি বলেছিস?

ভুলো সত্যি বলছি নাকি মিথ্যে বলছি। দে তোর খাতা আমাকে দে। আমি পড়া লেখে দেই। তুই দেখে দেখে পড়। (নিবে)।

(মাস্টারের প্রবেশ)

মাস্টার : এই ভুলো, মেহেরীর খাতা তোর হাতে কেন?

ভুলো : স্যার, আমি মেহেরীর খাতায় পড়া লেখে দিলাম। এই দেখুন স্যার।

মাস্টার : এই পাগল এসব কী লেখেছিস? 'ভকর' 'ভকর' এইটা কি পড়া হয়েছে?

ভুলো : এটাতো স্যার বুঝেন নাই। এই পড়া সংক্ষেপে লেখে দিয়েছি।

মাস্টার : কেমন সংক্ষেপে লেখে দিয়েছিস?

ভুলো : স্যার, 'ভ' এতে ভগবান, ক' এতে কৃষ্ণদা, 'র' এতে রামচন্দ্র। এই তিন অক্ষরে মিলইয়া 'ভকর' তাই না স্যার?

মাস্টার হে হে, ভুলো তোর মাথায় বুদ্ধি আছে। যাক, মেহেরী, তুমি বলতো এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর কি হতে পারে?

মেহের : স্যার, এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর চাঁদ।

ভুলো : আরো আছে স্যার–ফুল।

মাস্টার : কেমন করে হলো?

ভুলো : স্যার, ফুল ফুটলে সুবাস লওয়া যায়। দুই হাতে ধরা যায়। ফুল থেকে ফল হয়। ফল পাকলে খাওয়া যায়। খেলে পেট ভরে। আর চাঁদ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

মাস্টার আচ্ছা বলোতো, আর কি সুন্দর হতে পারে?

ভুলো আছে স্যার আছে। যখন মেয়ে লোকের যৌবন ফুটে ওঠে, যেমন ধরুন মেহেরীর যৌবন ফুটে উঠেছে। তাই তো আমার মন চায়...।

মাস্টার আর বলিস নারে ভুলো, ভুলো তুই এখন চইলা যা।

ভুলো হ' যামুই তো। কাজের কথা বইলা দিছি আর এখন বলেন, ভুলো, তুই যা। ঠিক আছে, আমি চলেই যাই। (প্রস্থান)।

মেহেরী : স্যার, আমি এখন যাই।

মাস্টার : না, মেহেরী তুমি দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

মেহেরী : আমার সঙ্গে কি কথা আছে স্যার?

মাস্টার : শুন, মেহেরী, তোমার দেহের মাঝে যে যৌবন ফুটে উঠেছে আর বুকের মাঝে যে কোমল কলি দুটি টগবগ করিতেছে, তাই দেখে আমার মন ব্যকুল হয়ে উঠেছে। বল, বল, মেহেরী–তোমার কোমল কলি যৌবন সুধা আমার পান করতে দিবে কিনা।

www.pathagar.com

মেহেরী : একি বলছেন স্যার আপনি?

মাস্টার : কোন কথা নয়। আমি যা বলছি–তাতে তুমি রাজি কিনা তাই বলো?

৩. মেহেরীর গান

ওকি মাস্টার
কি কথা শুনাইলেন মোর কানে গো
ওস্তাদ বলিয়া মানি
পিতার মতো জানি
ওস্তাদ হইয়া মাস্টার এমন কথা বলেন গো
ও কী মাস্টার ...
এমন কথা না বলিবেন মুখে গো।

মাস্টার : না-না মেহেরী, আমার আর সহ্য হচ্ছে না। তোমার ঐ ফাটা ফাটা যৌবন দেখে আমার প্রাণে আর কিছুতেই বাঁধ মানছে না। তুমি শুধু একবার বলো- আমি রাজি।

মেহেরীর গান :

হায় গো...ওস্তাদ গুরু মহাগুরু কিতাবের খবর
ওস্তাদ হইয়া মাস্টার এমন কথা বলেন গো
ও কী মাস্টার এমন কথা আর না বলবেন মুখে গো।

মাস্টার : শুন মেহেরী। তোমার ঐ সব নেকামী কথায় আমাকে ভুলাতে পারবে না। কারণ আমি তোমাকে পাবার জন্য তোমার পিতাকে কৌশলে বাণিজ্যে পাঠিয়েছি। এখন তুমি আমার হাতের মুঠোয়। বল, বল তুমি আমায় প্রেম-সুধা পান করতে দিবে কিনা?

মেহেরী : (অন্যদিকে চেয়ে) হায় খোদা। এখন আমি কী করি। আমাকে মাস্টারের হাত থেকে বাঁচাতে হলে ছলনার আশ্রয় নিতে হবে।

মাস্টার মেহেরী তুমি ঐ দিকে চেয়ে কী ভাবছো?

মেহের কই, নাতো। স্যার আমি আপনার কথায় রাজি।

মাস্টর ওহ মেহেরী তোমার কথা শুনে আমার প্রাণটা শীতল হয়ে গেল। এসো মেহেরী আমার কাছে এসো। আর দূরে থেকো না। এসো কাছে (ধরবে)।

মেহের আজ ছাড়ুন কেউ দেখে ফেলবে।

মাস্টার এখানে কেউ নেই। এখানে শুধু তুমি আর আমি।...

মেহেরীর গান :

একে তো দিনের বেলা ঘরে লোকের মেলা
কেমন হইবে মিলন এইনা দিনের বেলায় গো

www.pathagar.com

ও কী মাস্টার ... আসবেন আপনি রাত্রি কালে
১০টা কালে গো
আসবেন আপনি রাত্রি ১০টা কালে বেজে গেলে
তখনি হইবো মিলন মনেরই আনন্দ গো
ও কী মাস্টার ... আসাবেন আপনি রাত্রি
১০ টার কালে গো ।

মাস্টার : ঠিক আছে মেহেরী আমি তোমার কথায় রাজি ।

মেহেরী : স্যার আমিও আপনার কথায় রাজি ।

মাস্টার : শুন মেহেরী, এখন তুমি বাড়ি যাও । আমি রাত্রি ১০টার সময় চুপি চুপি তোরার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করবো । কথাটা মনে থাকে যেন । (হেন্ডসেক) গুডবাই । (প্রস্থান) ।

মেহেরী : হায় খোদা । এখন আমি কী করবো! তুমি আমায় উপায় করে দাও খোদা ।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী : রাজকুমারী! আপনার কী হয়েছে? আপনাকে চিন্তাযুক্ত মনে হচ্ছে ।

মেহেরীর গান :

শোন গো দাসী দুখের কাহিনি
দাসী লো পিতা গেল সফরেতে
সপিয়া মাস্টারের হাতে
জাতি যাবে কূল যাবে আর যাবে মান সম্মান
শুন গো দাসী...
দারোয়ানকে ডেকে আন
মান সম্মানকে রক্ষা কর—
শুন গো দাসি...

দাসী রাজকুমারী আমি বুঝতে পেরেছি । আপনি থাকেন, আমি এই মুহূর্তে দোরোয়ানকে ডেকে আনি ।

(প্রস্থান ও ২ জন দারোয়ানসহ প্রবেশ)

দারোয়ান : আদাব আদাব রাজকুমারী । আমাদের কী জন্য স্মরণ করেছেন?

মেহেরীর গান :

ও কী দারোয়ান ভাই...
শরমেতে না পারি কহিতে গো (২ বার)
আসবেন মাস্টার রাত্রি কালে ১০ বেজে গেলে
কি করি কী করি এখন বলনা আমারে গো
ও কী দারোয়ান...

www.pathagar.com

আসবেন মাস্টার ১০টার কালে ইজ্জত মারিবারে
কেমনে বাঁচাইব আমি আমার সম্মান গো
ও কী দারোয়ান ...
জাতি যাবে মান যাবে... হইবো কলঙ্কিনী
তোমরা আমার সহায় হইয়া বাঁচাও না সম্মান গো।
ও কী দারোয়ান...

দারোয়ান : রাজকুমারী! আপনি আমাদের ভাই ডেকেছেন। আমরা দুই ভাই থাকতে কারো সাধ্য নাই আপনার মন্দিরে প্রবেশ করে। আমরা ঠিক সময় এসে হাজির হবো। এখন আমরা আসি রাজকুমারী। (সকলের প্রস্থান)।

৪. বিবেকের গান :

এদিকে মাস্টার সাহেব কোন কর্ম করিল
পাকা চুলে কলেব দিয়া দাড়িটি কামাইল
বেতের ছুড়া হাতে নিয়ে যায় ধীরে ধীরে
কান্যার মন্দিরে যাবে হাসিয়ে হাসিয়ে
হাসিয়ে হাসিয়ে গো (২ বার)
কান্যার মন্দিরে ... (প্রস্থান)।

মেহের দেখতে দেখতে রাত্রি ১০টা বেজে গেল। এখনো যে দারোয়ান এলো না। তাহলে কী আমার...

১ম দারোয়ান : আমরা এসেছি রাজকুমারী। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমান। আমরা দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দেই। আরে মদন আমার গাঁজার কল্‌কীটা করে দে সুদন।

২য় দারোয়ান : আরে ভাই গাঁজা খেলে যে নিশায় বিভোর হবে। তখন মাস্টার সাবকে চিনবে কেমন করে?

১ম দারোয়ান : আরে শালা গাঁজা না খেলে যে আমার শক্তি হবে নারে। দে গাঁজা দে।

২য় দারোয়ান : এই নাও তোমার গাঁজা। (দিবে)

১ম দারোয়ান : দেখি। (নিয়ে টান দিবে) গানের সুরে। নদীর ওপারে ছুয়ার মারিছে লেম্‌বু দিয়া বাজুওয়া-হো। কে রে এলো বুঝি রে?

২য় দারোয়ান : হ ভাই আইয়া পড়ছে।

১ম দারোয়ান : আইয়া পড়ছে? তাহলে তো একটা গান গাওনের দরকার।

২য় দারোয়ান : কি গান গাইবে?
(১ম দারোয়ান গান গাবে)
এইটা বুঝি সেইটা হবে (২ বার)
রাজবাড়িই মাস্টার হবে। এইটাই

মাস্টার হ্যাঁ হ্যাঁ তোমরা ঠিকই চিনেছো। আমি রাজ বাড়ির মাস্টার।

www.pathagar.com

দারোয়ান — মাস্টার সাহেব–তা কী মনে করে আপনে এদিকে এসেছেন?
মাস্টার — আমি রাজকুমারীর মন্দিরে যাবো।

(দারোয়ানের গান)

পিড়ীতির বান লেগেছে বুকে- (২ বার)।
সেই কারনে মন্দিরে যাবে এইটায়... ঐ।

মাস্টার — তোমরা এসব কী বলছো? আমি রাজকুমারীকে পড়াইতে যাবো।

দারোয়ানের গান :

পিরিতির পড়া দুপুর রাত্রে (২ বার)
সেই কারণে মন্দিরে যাবে–পিরীতির ... ঐ।

মাস্টার : এই বেটা দারোয়ান। দ্বার ছেড়ে দে বলছি–
১ম দারোয়ান : আরে মদন অই সোনার চান পিতলে ঘুঘু কয় কিরে?
২য় দারোয়ান : দ্বার ছেড়ে দিতে বলে। রাজকুমারীকে পড়াইতে যাবে।

১ম দারোয়ানের গান :

দ্বার ছাড়িবার আবার বল্লে (২ বার)
এক থাপ্পরে দাঁত ফেলবো
দ্বার ছাড়িবার আবার বল্লে... ঐ

মাস্টার — এই বেটা দারোয়ান দ্বার ছেড়ে দিবি কিনা?
দারোয়ান — (একসঙ্গে) আমরা যদি দ্বার ছেড়ে না দেই।
মাস্টার — দ্বার ছেড়ে না দিলে, রাজকুমারীকে বলে আচ্ছা করে মজা দেখাবো বুঝলি?
১ম দারোয়ান : শালা কয় কিরে। আরে মদন শালারে দিয়া দে আচ্ছা করে চুদন।
২য় দারোয়ান : রাজকুমারী আপনে থাইকেন। আমরা কিন্তু দিলাম। ধর শালা।
১ম দারোয়ান : মার শালা। (মারবে)। (মাস্টারের দৌড়ে প্রস্থান)।

(মেহেরের প্রবেশ)

১ম ও ২য় দারোয়ান : এ কেমন হলো রাজকুমারী। শালারে না দিছি, আচ্ছা করে ধুলাই।
মেহের — ভাই দারোয়ান। আপনারা আমার খুব উপকার করেছেন। আপনারা না থাকলে আমার সর্বনাশ হতো। এই নিন আপনাদের পাঁচ শত টাকা দিলাম। আবার আসবেন।
১ম ও ২য় দারোয়ান : আমরা এখন আসি রাজকুমারী। ঠিক সময় মতো আমরা এসে হাজির হবো। (প্রস্থান)।

www.pathagar.com

মেহের হায় খোদা। তুমি আমার সহায় থেকো। (প্রস্থান)

(মাস্টারের প্রবেশ)

মাস্টার : রাজকুমারী মেহের নিগারী। তুমি আমার সঙ্গে চতুরী করলে। কিন্তু ভুলে যেওনা আমিও ছলিম উদ্দিন মাস্টার। আমাকে তুমি ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়েছো। আমিও তোমাকে শান্তিতে থাকতে দিবো না। কোথায় দূতবর। নিয়ে এসো আমার কলম আর দোয়াত। এই মুহূর্তে লেখবো পত্র খোরশেদ বাদশার কাছে।

(কলম ও দোয়াত নিয়ে দূতবরের প্রবেশ)

দূতবর : এইতো স্যার আমি আপনার দোয়াত ও কলম এনেছি।

মাস্টার : (নিয়ে লিখবে এবং পড়বে) আমার ছালাম নিবেন জাঁহাপনা। পত্রে কী লিখবো–আপনার মেয়ে রাজকুমারী মেহের নেগারী অসতী হয়ে গেছে। সামান্য কতোয়ালের সঙ্গে প্রেমে মজেছে। সমস্ত রাজ্যময় কলঙ্কের ঝড় বইছে। আপনি দেশে না এসে ওখান থেকে বিচার করুন। অন্যথা আপনি দেশে আসলে প্রজাদের সামনে মুখ দেখাতে পারবেন না। ইতি। ছলিম উদ্দিন মাস্টার। (দূতকে দিবে)। এই নাও দূতবর এই পত্রখানা আজই তুমি খোরশেদ রাজার নিকট পৌঁছে দিবে। যাও।

দূতবর : আমি তাই যাচ্ছি মাস্টার সাহেব। (প্রস্থান)।

মাস্টার : এইবার,' এইবার দেখবো রাজকুমারী মেহের নিগারী তোমার বাক চাতুরী কত দূর? যে পর্যন্ত আমি তোমাকে না পাবো সে পর্যন্ত আমার কোনো শান্তি নাই। হাঁ, হাঁ, হাঁ–(প্রস্থান)।

(খোরশেদ রাজার প্রবেশ)

খোরশেদ : আজ কয়েক মাস গত হয়ে গেল আমি বাণিজ্যে এসেছি। দেশে আমার একমাত্র মেয়ে মেহের নিগারীকে রেখে এসেছি। না জানি ও কেমন আছে। ওর যে কোন সংবাদ এখন পর্যন্ত পেলাম না।

(পত্র নিয়ে দূতের প্রবেশ)

দূত : ছালাম জাঁহাপনা। এই নিন আপনার পত্র, মাস্টার সাহেব আপনার নিকট পাঠিয়েছে।

খোরশেদ : (নিয়ে) এতো দেখছি মাস্টার সাহেবের লেখা পত্র। বাবা খুশু এদিকে একটু এসো বাবা।

(খুশুর প্রবেশ)

খুশু : আব্বা, আমার স্মরণ করেছেন?

www.pathagar.com

খোরশেদ : হ্যাঁ, বাবা খুশু। মাস্টার সাহেব পত্র দিয়েছে। তাই তুমি এই পত্রখানা পাঠ করে আমাকে শোনাও।

খুশু (নিয়ে) ছালাম জাঁহাপনা। পত্রে আর কী লিখবো? আপনার মেয়ে মেহের নিগারী অসতী হয়ে গেছে। সামান্য কতোয়ালের সঙ্গে প্রেমে মজে আপনার উঁচু মাথা নিচু করে দিয়েছে। আমি বহু নিষেধ করেছি কিন্তু রাজকুমারী আমার কোনো কথা রাখে নাই। তাই আপনাকে জানাতে বাধ্য হইলাম।

খোরশেদ : রাম রাম বাবা খুশু। আর শুনতে চাই না। যে কলঙ্কিনী মেয়ের মুখ দেখতে চাই না। তুমি আজই চলে যাও দেশে। অই কলঙ্কেনীকে হত্যা করে ওর তাজা রক্ত এনে আমাকে দেখাবে। ওর রক্ত দেখে আমার মনটাকে সান্ত্বনা দিব। এই নাও আমার হাতের রুমালখানা। মেহেরীর রক্তে রুমাল ভিজিয়ে আনবে।

খুশু আব্বা হুজুর। আমি এই মুহূর্তে চলে যাবো দেশে। দুষ্টু বোন মেহেরীকে হত্যা করে ওর রক্তে রুমাল ভিজিয়ে আপনাকে দেখাবো পিতা। হে খোদা মেহেরবান। তুমি আমার অন্তরে শক্তি দাও। আমি যেন আমার বোনকে হত্যা করতে পারি। চলি পিতা। (প্রস্থান)।

খোরশেদ : ওহ্ খোদা। তুমি একি গজব আমার উপর চাপিয়ে দিলে? আজ আমার নিজের মেয়েকে হত্যার আদেশ দিতে হলো। না, না আমাকে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। আমি যে বাদশা। যে পর্যন্ত মেহেরীকে হত্যা করে। খুশু ফিরে না আসে সে পর্যন্ত আমি আর দেশে ফিরে যাবো না। (প্রস্থান)।

(মাস্টারের প্রবেশ)

মাস্টার : হাঁ হাঁ হাঁ। আমিও ছলিম উদ্দিন মাস্টার, মেহেরী। তুমি হয়তো জাননা, এতোক্ষণে বোধ হয় মৃত্যুর পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে। আমার হাতের পত্র পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে খুশু ছোটে আসবে তোমাকে হত্যা করতে। তোমার ভাই তোমাকে হত্যা করার পর হয়তো আমাকেও খোঁজবে। কিন্তু আমি অতো বোকা নই। আমিও এই মুহূর্তে এদেশ ছেড়ে ছদ্মবেশে চলে যাবো অন্য দেশে। বিদায় মেহেরী, বিদায়। (প্রস্থান)।

বিবেকের প্রবেশ ও গান :

ফিরোজ শহরে বাদশা ফিরোজ নামদার (২ বার)
মাল মাত্তা হস্তি ঘোড়া ছিল বেশুমার। হায় গো
এক ছেলে বারিক আল্লা দিল তাহার ঘরে-
রাখিল ছেলের নাম গো মেঘকুমার বলিয়া হায় গো
মেঘকুমার বলিয়া গো (২ বার)
রাখিল ছেলের নাম ... ঐ

www.pathagar.com

(ফিরোজ রাজা ও উজিরের প্রবেশ)

ফিরোজ : উজির সাহেব। বলুন রাজ্যের সংবাদ কী?

উজির : জাঁহাপনা। রাজ্যের সংবাদ খুবই ভাল। প্রজারা সবাই শান্তিতে বসবাস করছে জাঁহাপনা।

(ছদ্মবেশে মাস্টার এর প্রবেশ)

মাস্টার : ছালাম জাঁহাপনা।

ফিরোজ : আলাইকুম ছালাম। কে তুমি আগন্তুক? কী মনে করে এখানে এসেছ?

মাস্টার : জাঁহাপনা। আমি বর্তমানে বেকার আছি। তাই আপনার দরবারে এসেছি একটা চাকুরীর জন্যে। দয়া করে একটা চাকুরী দিলে আমি খুবই উপকৃত হতাম।

ফিরোজ : কি চাকুরী আমি দেব তোমায়? তা তোমার লেখাপড়া কত দূর?

মাস্টার : জাঁহাপনা, লেখাপড়ায় আমি এম. এ. পাশ। অস্ত্রবিদ্যাতেও পারদর্শী আছি জাঁহাপনা।

ফিরোজ : তাই নাকি। উজির সাহেব। বর্তমানে আমার সেনাপতির পদ শূন্য। তাই আমি আজ থেকে এই আগন্তুককে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করলাম। তুমি আজ থেকে আমার রাজকুমার মেঘকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিবে। উজির সাহেব আপনি এই মুহূর্তে মেঘকুমারকে ডেকে সেনাপতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।

উজির এই কে আছিস। মেঘকুমারকে পাঠিয়ে দাও।

(মেঘ কুমারের প্রবেশ)

মেঘ : আমায় স্মরণ করছেন আব্বাহুজুর?

ফিরোজ : হ্যাঁ বাবা মেঘ। তুমি আজ থেকে এই নতুন সেনাপতির সঙ্গে থেকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করবে। সেনাপতি তোমাকে অস্ত্র চালনা শিক্ষা দিবে।

মেঘ ঠিক আছে আব্বাহুজুর। আমি আজ থেকে আপনার নির্দেশ মতো সবই করবো। চলুন সেনাপতি সাহেব।

সেনাপতি : তাই চল রাজকুমার (সকলের প্রস্থান)।

(মেহের নিগারীর প্রবেশ)

মেহের : হায় খোদা। আমার পিতা যে অনেকদিন গত হয়েছ, বাণিজ্যে গেছে কিন্তু এখন পর্যন্ত ফিরে এলোনা। এখন আমি কী করবো? ওদের জন্যে যে আমার মনটা ব্যাকুল হয়েছে।

(খুশুর প্রবেশ)

খুশু : ব্যাকুল হয়েছো বলেই তো আমি এসেছি তোমাকে নিয়ে যেতে।

মেহের : কে, ভাইজান।

খুশু হে, আমি তোমার ভাই।

মেহের ওহ ভাইজান, তুমি একা এসেছো? আব্বা আসলো না কেন?

খুশু আব্বার আসা দেরী হবে। তাই আমাকে পাঠিয়েছে তোমাকে নিয়ে যেতে।

মেহেরী : ভাইজান, সত্যিই তুমি আমাকে আব্বার কাছে নিয়ে যাবে?

খুশু : হরে পাগলী। আমি তো তোকেই নিতে এসেছি। তুই তৈরি হয়ে নে। আমি তোর জন্য একটা পালকীর ব্যবস্থা করছি। (পালকী নিয়ে প্রবেশ)।

খুশু মেহেরী। আমি তোর জন্য পালকী নিয়ে এসেছি। তুই পালকীতে উঠে বস।

বেহারা উঠে বসুন শাহজাদী। আমরা আপনাকে যথাস্থানে পৌঁছে দেব। (নিয়ে সকলের প্রস্থান)।

(সেনাপতি ও মেঘকুমার যুদ্ধ করতে করতে)

সেনাপতি : রাখো রাখো কুমার। আমি তোমাকে আবার দেখিয়ে দেই। (অস্ত্র ধরে) এইভাবে ধরে এইভাবে আঘাত করবে। এইতো হয়েছে। (সেনাপতির অস্ত্র পতন) সাব্বাস, সাব্বাস রাজকুমার এখন তোমার অস্ত্রবিদ্যা শেষ। এখন চলো জাঁহাপনাকে সংবাদটা জানাই।

মেঘকুমার : তাই চলুন সেনাপতি সাহেব। (উভয়ের প্রস্থান)

(ফিরোজ ও উজিরের প্রবেশ)

ফিরোজ : উজির সাহেব। আমার মেঘকুমারের অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা কত দূর অগ্রসর হয়েছে? তার কী কিছু বলতে পারেন?

উজির হ্যাঁ জাঁহাপনা, আমি সেনাপতির নিকট শুনেছি–মেঘকুমার অস্ত্র পরিচালনায় খুবই পারদর্শী।

(গাইতে গাইতে মেঘকুমারের প্রবেশ)

ও কী পিতা গো বিদায় করেন
যাবো শিকারেতে গো–
শিকারেতে যাবো আমি হরিণের লাগিয়া
হরিণ মারবো টিয়া মারবো মারবো তোতা পাখি গো
ওকি পিতা গো... ঐ
কোথায় আমার তীর ধনু এনে দাও মোর হাতে
শিকারেতে যাবো আমি মনেরই আনন্দে গো
ও কী পিতা গো... ঐ।

ফিরোজ : অসম্ভব। এ হতে পারে না। তুমি আমার একমাত্র পুত্র। এই কচি বয়সে আমি তোমাকে শিকারে যেতে দিতে পারি না।

www.pathagar.com

মেঘকুমার : শিকারে যাবার জন্য আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আপনি আমায় অনুমতি দেন আব্বা হুজুর।

(রাণীর প্রবেশ)

রাণী : না, না বাবা মেঘ। আমি তোমাকে শিকারে যেতে দিব না। আমি তোমাকে এক মুহূর্তে চোখের আড়াল হতে দিব না। (জড়িয়ে ধরে) বাবা মেঘ। জঙ্গলে বাঘ ভাল্লুক হাতী বাস করে। তুমি জঙ্গলে গেলে বন্যজন্তু তোমায় খেয়ে ফেলবে। তখোন আমরা কী নিয়ে বাঁচবো। তাই তুমি ও নাম ভুলে যাও বাবা।

মেঘ : না, মা, না। আমি শিকারে যেতে না পারলে আজ থেকে আমি আর অন্ন পানি গ্রহণ করবো না।

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি : জাঁহাপনা। যার যে কাজ। চাষা করে চাষ, জেলে ধরে মাছ। আর রাজা বাদশা মনের আনন্দে শিকার করতে যায়। তাই আমি বলছিলাম কি- আপনি কুমারকে বাঁধা না দিয়ে শিকারের অনুমতি দিন হুজুর।

উজির : তার আগে বলুন কুমারকে আপনি কেমন অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন?

সেনাপতি : জাঁহাপনা। আমি বলছিলাম কী কুমার যখোন শিকারে যাবার জন্য আশা করেছে তখন অনুমতি দেওয়াটাই ভালো মনে করি।

ফিরোজ : ঠিক আছে। আপনারা সবাই যখন বলছেন তখন আমি অনুমতি না দিয়ে কী পারি। তবে বাবা, মেঘ তুমি সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে যেও।

সেনাপতি : চল রাজকুমার। আমরা শিকারের ব্যবস্থা করি গে।

মেঘকুমার : তাই চলুন সেনাপতি সহেব। (প্রস্থান)।

ফিরোজ : চলুন উজির সাহেব, আমরা এখন বিশ্রাম করি গে।

উজির : তাই চলুন জাঁহাপনা। (প্রস্থান)।

(খুশু ২ জন বেহারা ও মেহেরীর প্রবেশ)

খুশু : এইতো বনের ভিতর দিয়ে সোজা পথেই যেতে হবে। (মঞ্চে উঠে) বহু পথ অতিক্রম করে এলাম। এখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, আর পথ চলা যাবে না। আজ রাত্রিটা এই গাছের নিচে বসে কাটিয়ে দিব। সকাল হলে চলে যাব। বেহারা তোমরা পালকী নামাও।

বেহারা এইতো কুমার পালকী নামাইলাম।

খুশু মেহেরী। তুমি ঐখানে শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম কর। বেহারা তোমরা এখন যাও। এদিক আমরা পায়ে হেঁটেই যেতে পারবো।

বেহারা তা কী করে হয় কুমার?

খুশু শুন, বেহারা এই নাও তোমাদের আমি আর ও পাঁচ শত টাকা দিয়া দিলাম। তোমরা এখন চলে যাও।

www.pathagar.com

মেহেরী : ভাইজান, এই গহীন অরণ্যে তুমি আমায় কেন আনলে? আব্বা কোথায়?

খুশু : আর বেশি দূরে নয় বোন। তুমি আমার নিকটে শুয়ে ঘুমাও। আমি বসে বসে তোমাকে পাহারা দেই। (মেহেরী ঘুমাবে) হায় খোদা, এখন আমি কী করি। পিতাকে কথা দিয়ে এসেছি মেহেরীকে হত্যা করে রক্ত এনে দেখাবো। আমি নিজ হাতে আপন বোনকে কেমন করে হত্যা করবো? একদিকে পিতার আদেশ অন্যদিকে বোন। আমি এখন কোনটা পালন করবো? না, না, আমি পারবো না আমার বোনকে আমি হত্যা করতে পারব না। হে পরমেশ্বর, তুমি আমায় ক্ষমা করে দিও। আমি পিতার আদেশ অমান্য করলাম। আমি রাস্তায় গিয়ে কুকুর মেরে সেই রক্ত রুমাল ভিজিয়ে পিতাকে দেখাবো। থাকো বোন তুমি ঘুমিয়ে থাকো। আমি তোমাকে ফেলে চলে গেলাম। (প্রস্থান)।

মেহের (জেগে) ভাইজান, ভাইজান, তুমি কোথায়? হায় হায় ভাইজান কোথায় গেলে? ভাইজান। না, ভাইজনকে দেখছি না। ভাইজানকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। তবে আমাকে বাঘে খেলো না কেন? আমাকে এই গহীন জঙ্গলে একা ফেলে ভাইজান পালিয়ে গেল। ও খোদা এখন আমি কী করবো কোথায় যাবো।

গান :

আমার হায় কপালে এই ছিল
ভাই হইয়া আমায় বনে পাঠাল
ও ভাই হইয়া বনে পাঠাইল গো
আমার বনে পাঠাইল। আমার... ঐ।
আমার কেনে বিরূপ হলো
নিঘোর কাননেতে নির্বাসন দিলো
ও নিঘোর কাননে আমায় গো
ও গো আমার নির্বাসন দিলো-
আমার হায় কপালে এই ছিল... ঐ।

* পাঠ : হায় খোদা। তুমি হলে নিদারুণ। ভাই হয়ে বনে দিলো মরণ কেন হইল না আমার। আমি এখন কী করবো? এই গাছের নিচে বসে একটু বিশ্রাম করি।

(শিকারী বেশে সেনাপতি ও মেঘকুমার প্রবেশ)

মেঘকুমার : সেনাপতি সাহেব। শিকার খোঁজতে খোঁজতে বহুদূর এসে পড়েছি। আপনি এই গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করুন। আমি সামনের দিকে একটু ঘুরে ফিরে দেখি।

সেনাপতি : ঠিক আছে রাজকুমার। আমি এখানে বিশ্রাম করি। তুমি আবার তাড়াতাড়ি এসো। (প্রস্থান)।

www.pathagar.com

মেঘকুমার : ঐ ঐতো দেখা যায় একটা হরিণ। (মঞ্চে) একি। এতো হরিণী নয়। তা হলে কী? নজর করলে চোখ ঝলসিয়ে যায়।

গান :

কে গো তুমি পথের মাঝে বইস্যা রইলে
নয়নে ঝলক লাগে তোমায় দেখে এ এ
কে গো তুমি পথের মাঝে বইস্যা রইলে।

* পাঠ : কে, কে তুমি? কথা বলো, উত্তর দাও। তা না হলে এই তীর ধনু দ্বারা তোমর প্রাণ বধ করবো।

মেহেরীর গান :

ইরান শহরে ঘর গো পিতা খোরশেদ রাজা (২ বার)
হাউস করে রাখছে নাম মেহের নিগার। হাই গো
কোন শহরে থাকবো কুমার কোন শহরে ঘর
কিবা নাম তোমার মাতা পিতার কিবা নাম তোমার হায় গো।

মেঘকুমারের গান :

ফিরোজ শহরে গো বাড়ি পিতা ফিরোজ রাজা
হাউস করে রাখছে নাম গো মেঘকুমার বলিয়া- হায় গো
তোমার রূপের বান গো বিধিল পরাণে
তুমি যদি থাকো রাজী আমি করবো বিয়া। হায় গো।

মেহেরীর গান :

পুরুষ তোমরা জাতি লাজ নাই কো তার
যেথায় সেথায় প্রেম করিয়ে সে যে যায় ছাড়িয়া হায় গো
কেমন তোমার বাপ মাও কেমন তোমার হিয়া
এতো বড়ো হইছো সিয়ান না করাইছে বিয়া হাগো।

মেঘ কুমারের গান :

ভালো আমার বাপ মাও ভালো আমার হিয়া
তোমার মত সুন্দর পেলে করতাম বিয়া হা গো।

মেহেরীর গান :

শুন শুন ওহে কুমার বলি যে তোমারে
গলেতে কলসি বেঁধে জলে ডুবে মর হায় গো।

মেঘ কুমারের গান :

কোথায় পাবো হিরার কলসি কোথায় পাবো দড়ি

www.pathagar.com

তুমি হও গো প্রেম যমুনা আমি ডুইবা মরি হায় গো।

মেহেরীর গান :

প্রেম যমুনা গহীন গঙ্গা নামলে উঠা দায়
প্রেম যমুনায় ডুইবা মরলে কানবো তোমার মায় হায় গো

মেঘকুমার : শোন রাজকুমারী। আমি যে তোমার রূপে মুগ্ধ হয়েছি। বল বল মেহেরী তুমি তোমারই রূপ যৌবন আমায় দান করবে কিনা।

মেহেরীর গান :

ওগো শিমূল ফুলে মধু মিলে না (২ বার)
শিমূল ফুলটা দেখতে লালগো
ভেতরে তার হয় কালো গো
ওগো রাস্তার ধারে পড়ে থাকে (২ বার)
কেউ তুলে তা শুংগে না–
শিমূল ফুলে মধু মেলে না। ঐ

মেঘ কুমারের গান :

ওগো প্রিয়ে তুমি হলে ফুল বাগান (২ বার)।
আমি ভোমর হয়ে উড়িয়ে এসে
তোমার মধু করবো পান
প্রিয়ে তুমি হলে ফুল বাগান।

মেহেরীর গান :

ওগো মধু ভরা আমারও যৌবন (২ বার)।
তুমি মধুর লোভে ডাল ভেঙ্গো না
ধরি তোমার দুই চরণ
মধু ভরা আমারও যৌবন।

মেঘকুমার : না না মেহেরী আমি তোমার কোনো কথায় শুনবো না। আমি শুধু তোমাকে চাই। বলো বলো মেহেরী তোমি আমার হবে কি না?

মেহেরীর গান :

আমিতো অবলা নারী গো না জানি পিরীতির খেলা গো
আমায় কইরা রেখ গলের মালা (২ বার)
ধরি তোমার দুই চরণ- মধুভরা আমার গো যৌবন।

মেঘ কুমারের গান :

চল, চল, চল কন্যা দেশে চলে যাই
দেশে নিয়া করবো বিয়া কলেমা পড়াইয়া হায়গো

www.pathagar.com

মন যে আমার উতাল পাতাল দেরী নাহি সহে
এই মুহূর্তে চলে যাবো আপন বাসায়- হায় গো

মেঘকুমার : চল মেহেরী আমি তোমায় দেশে নিয়ে যাবো। বাবা মায়ের আশির্বাদ নিয়ে তোমায় আমি বিয়ে করবো।

মেহেরী : কুমার। তুমিতো আমায় ভুলে যাবে না?

মেঘকুমার: আমার দেহে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আমি তোমায় কোনদিন ভুলবো না। চল মেহেরী আমরা এখন আপন দেশে চলে যাই।

মেহেরী : তাই চলো (প্রস্থান)।

(ফিরোজ রাজ ও উজিরের প্রবেশ)

ফিরোজ : উজির সাহেব। শাহাজাদা মেঘকুমার সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে গিয়েছে। আজ কয়েকদিন গত হয়ে গেল কিন্তু এখনও যে ফিরে আসছে না।

উজির : আমিও তাই ভাবছি জাঁহাপনা।

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি : ছালাম জাঁহাপনা।

ফিরোজ : আলাইকুম ছালাম। সেনাপতি সাহেব। আপনি ফিরে এসেছেন। তবে আমার মেঘকুমার কোথায়? সে কেন আসছে না।

সেনাপতি : সে সংবাদ কী আর বলবো জাঁহাপনা। কুমার জঙ্গলে এক মায়াবেনী পরীর কন্যার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে- প্রাসাদে এসেছে। জাঁহাপনা। আমি নিষেধ করার পরও কুমার আমার কথা কিছুতেই শুনলো না।

ফিরোজ : না, না, এ হতে পারে না। আমার মেঘকুমার, আমার অনুমতি ছাড়া সে কোন কাজ করতে পারে না–আমার বিশ্বাস।

সেনাপতি : জাঁহাপনা আমার কথা বিশ্বাস না হয় একটু পরেই দেখতে পাবেন তার প্রমাণ।

(মেঘ ও মেহেরীর প্রবেশ)

মেঘকুমার : সালাম আব্বা হুজুর। মেহেরী, এই তো আমার আব্বা।

মেহেরী : সালাম জাঁহাপনা। দরবারের সবার নিকট আমি সালাম পেশ করলাম। সালাম।

ফিরোজ : মা, তুমি কেমন করে আমার দরবারে এসেছ মা?

মেঘকুমার: ওর কথা আমি বলে দিচ্ছি। ওর নাম মেহের নিগার। ও এখন অসহায়, আশ্রয়হীনা, বিপদগ্রস্ত, তাই আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আপনি অনুমতি দিলে আপাতত: এখানেই থাকবে।

www.pathagar.com

সেনাপতি : না, না জাঁহাপনা। আপনি কুমারের কথায় ঐ মায়াবিনী রাক্ষসী নারীকে আপনার মহলে ঠাঁই দিবেন না। তার চেয়ে আপনি ঐ নারীকে আমার হাতে তুলে দিন। আমি জঙ্গলে নিয়ে যেখানকার মেয়ে সেখানে রেখে আসি।

উজির তা কী করে হয়! সেনাপতি সাহেব, একটা অসহায় মেয়েকে উদ্ধার করে এনে আবার সেই বিপদের মধ্যে ঠেলে দেওয়াটা কী মানুষ্যত্বের কাজ হবে। না, না তা আমি পছন্দ করি না।

সেনাপতি : ভাববার কিছুই নেই জাঁহাপনা। আপনি আদেশ করুন, আমি ঐ মায়াবীনি মেয়েকে চুলের মুঠি ধরে হিড়হিড় করে বের করে নিয়ে যাই।

(রাণীর প্রবেশ পথে)

রাণী : কাকে হিড় হিড় করে টেনে বের করে নিয়ে যেতে চান সেনাপতি সাহেব?

সেনাপতি : ঐ তো মায়াবিনী রাক্ষসিনী নারীকে। ঐ নারী কুমারের মাথা খারাপ করে দিয়েছে।

রাণী কই? না তো। আমি তো দেখছি কুমারের মাথা ঠিকই আছে। মাথা খারাপ হয়েছে আপনার।

সেনাপতি : মাথা খারাপ হয়েছে আমার!

রাণী : নয় তো কী? তা না হলে অসহায় নারীকে আশ্রয় না দিয়ে জঙ্গলে ফেলে আসতে চাইছেন কেন? ভুলে যাবেন না সেনাপতি সাহেব, আমি একজন নারী। দরকার হয় আমি ঐ নারীকে নিজের মেয়ের মত করে রাখবো। এসো মা, তুমি আমার কাছে এসো।

মেহের : মা। (জড়িয়ে ধরবে)।

ফিরোজ : উজির সাহেব। আমি আর কী করবো। সবাই যখন মায়ার জালে আবদ্ধ তখন আমার আর কী করার আছে। আপনি মেঘ কুমারকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন সে যদি রাজি থেকে থাকে তাহলে ওদের দুইজনকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে দেই।

উজির : বাবা মেঘ। তুমি কি জাঁহাপনার কথায় রাজি আছ?

মেঘকুমার: উজির সাহেব, আমি কোন দিন পিতা মাতার অবাধ্য হই নাই। আজও হবো না। আপনাদের যা ভালো হয় তাই করুন আমি তাতেই রাজি।

ফিরোজ : উজির সাহেব তাহলে আর বিলম্ব না করে এক্ষুণি মোল্লা ডেকে ওদের বিবাহের কাজ সমাধা করে ফেলুন।

উজির এই কে আছিস মোল্লা সাহেবকে পাঠিয়ে দে।

(মোল্লা সাহেব গাইতে গাইতে প্রবেশ)

রাজ বাড়িতে বিয়ের খবর যাই গো তাড়াতাড়ি
মোল্লাগিরি করতে করতে পাকাই দিলাম চুল দাড়ি
ভাত বেগরে গোষ্ঠী মারি যাই না কারো বাড়ি

www.pathagar.com

উঁচু উঁচু নারিকেলের গাছ দেখতে সারি সারি
ঐ দেখা যায় ফিরোজ রাজার বাড়ি। ঐ

(নর্তকীর নাচ ও গীত)

রাজার বাড়ি বিয়া গো
চালুন বাতি দিয়া গো
আমরা নাচিয়ে নাচিয়ে বিয়ার বরণ করি
মনো যায় যায়রে।

(মোল্লার প্রবেশ ও প্রস্থান করতে করতে)

মোল্লা : এই বাদ্য বন্ধ কর। বন্ধ কর। বাপরে বাপ, কী শয়তানের শয়তান রে বাবা। আমি হলাম গিয়ে শরা শরিয়তের কাজি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি। একবারেই পড়ি।

উজির আরে ও মোল্লা সাহেব। ছেলে মেয়েরা বিয়ে বাড়িতে একটু আমোদ প্রমোদ করেই থাকে।

মোল্লা না, না, না। আমি হলাম গিয়ে সবার কাজি শরিয়তের বাইরে আমি কিছু করতে পারি না।

উজির ঠিক আছে। আপনি বিবাহের কাজ সমাধা করে ফেলুন।

মোল্লা রাজকুমার তুমি এইখানে বস। আর মা তুমি এখানে কুমারের মুখোমুখি বস। আপনারা সবাই অনুমতি দিন। আমি আরম্ভ করি। (পকেটে হাত দিয়ে উঠবে)। এই আমি তো সর্বনাশ করে ফেলেছি।

উজির আরে মোল্লা সাহেব। অমন করছেন কেন? কী হয়েছে আপনার?

মোল্লা আরে ও পেচু। পেচুরে। ধুত্তরী। শালাকে ডাকলেও শুনে না। আরে ও পেচু।

(পেচুর প্রবেশ পথে)

পেচু : আরে ও দাদা, আমি আইয়া পড়ছি। কী হয়েছে তাই বল?

মোল্লা : আরে ও পেচু খাতা, খাতা নিয়ে আয়।

পেচু : খাচা দাদি চড়ই ধইরা রাখছে।

মোল্লা : শালা কয় কিরে? আমি কই খাতা আর শালা কয় চড়ই ধইরা রাখছে। আরে খাতা খাতা।

পেচু আরে ও দাদা, আমি স্বপ্নে মুইত্যা দিছিলাম, তাই দাদি খইচা দিছে।

মোল্লা দেখতো শালা কী কয়। আমি কই খাতা আর শালা কই খেতা। আরে খাতা, খাতা।

পেচু ও খাতা! তাই কউ। আনতাছি। (গিয়া আনবে) এই নাও খাতা। আমি এখন যাই। (প্রস্থান)।

উজির মোল্লা সাহেব। আর দেরি না করে বিবাহ পড়াইয়া দেন।

www.pathagar.com

মোল্লা : আপনারা সবাই বসুন। আমি বিয়ে পড়াই। বাবা। তোমার নাম কী?

মেঘকুমার : আমার নাম মেঘকুমার।

মোল্লা : বাহ্! কী সুন্দর নাম। যে মেঘ আকাশে ভেসে বেড়ায়। মা তোমার নাম কী?

মেহেরী : আমার নাম মেহের চাঁদ।

মোল্লা : চমৎকার, চমৎকার নাম। চাঁদ ও আকাশেই থাকে। আপনারা সবাই কান পেতে শুনোন এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মহরানা রেওয়াজে ফিরোজ বাদশার ছেলে মেঘকুমারের সাথে মেহেরীর বিয়ে দিলাম পড়িয়ে। বলো মা কবুল। বলো মা কবুল। সবাই বলেন- আমিন। জাঁহাপনা। আমার বকশিসটা দিয়া দিন।

উজির : এই নিন মোল্লা সাহেব। আপনার বকশিস।

ফিরোজ : উজির সাহেব এখন চলুন সবাই মিলে আমোদ প্রমোদ করি গে।

উজির : তাই চলুন জাঁহাপনা। (সকলের প্রস্থান)

(ছদ্মবেশে সেনাপতি রূপে মাস্টারের প্রবেশ)

সেনাপতি : আমি প্রথম দর্শনেই তোমাকে চিনে ফেলেছি। রাজকুমারী মেহের নিগার, তুমি হইতো আমাকে চিনতে পারো নাই। তবে হে ঠিক জায়গায় এসে পড়েছ। আমি তো তোমাকে পাবার জন্য দেশে দেশে ঘুরে বেড়াইতেছি। তোমাকে পাবার জন্য চেষ্টার আমি কোন ত্রুটি করিনি। কিন্তু জাঁহাপনা তো আমার কথায় কর্ণপাত করলো না। নাই বা করুক। তবে আমি তোমার পিছু ছাড়বো না। আমার নাম ছলিমদ্দিন মাস্টার। মনে রেখো আমি জীবিত থাকলে একদিন না একদিন তোমার রূপ যৌবন আমি ভোগ করবই করবো। হাঁ, হাঁ, হাঁ। (প্রস্থান)।

(ফিরোজ রাজ ও উজিরের প্রবেশ)

ফিরোজ : উজির সাহেব। আমার মেঘে কুমারকে বিবাহ দেওয়ার পর এক যুগ গত হতে চলেছে। সে এখন ২ সন্তানের পিতা। তাই আমি স্থির করেছি যে মেঘকুমারকে সিংহাসনে বসিয়ে আমি অবসর নিবো। তাতে আপনাদের মতামত কি।

উজির জাঁহাপনা। আমি বলছিলাম কী মেঘকুমারের রাজ্য পরিচালনা করার বয়স এখনো হয় নাই। তাই আরো দুই চার বছর.অপেক্ষা করা আমি ভালো মনে করি জাঁহাপনা।

ফিরোজ : উজির সাহেব। আপনি সেনাপতিকে সঙ্গে করে নিয়ে সবার সঙ্গে পরামর্শ করে দেখুন, সবাই কী বলে। আশা করি আমার আদেশ সবাই পালন করবে। আমি এখন আসি। (প্রস্থান)।

উজির এই কে আছিস! সেনাপতিকে পাঠিয়ে দে।

www.pathagar.com

(সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি : আমায় স্মরণ করেছেন উজির সাহেব?

উজির : হ্যাঁ, জাঁহাপনার নির্দেশে আমি আপনাকে স্মরণ করেছি। জাঁহাপনা মেঘকুমারকে সিংহাসনে বসিয়ে বাকি জীবন অবসর নিতে চান।

সেনাপতি : অতি উত্তম প্রস্তাব। মেঘকুমারের এখনি সিংহাসনে বসার উপযুক্ত সময়। আর বিলম্ব না করে জাঁহাপানাকে বলুন—মেঘ কুমারকে সিংহাসনে বসাতে।

উজির ঠিক আছে। আমি অচিরেই কুমারকে সিংহাসনে বসানোর ব্যবস্থা করছি। (প্রস্থান)

সেনাপতি : হাঁ, হাঁ, হাঁ,। এইতো, এইতো সুবর্ণ সুযোগ। এই সুযোগ আমি কিছুতেই হাত ছাড়া করব না। ছলে বলে কৌশলে ওই মেহের নিগারীকে আমার পেতেই হবে। আমি আজই মেহের নিগারীকে কানমন্ত্র দিয়া দিবো। দেখি কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। একবার তুমি আমার সঙ্গে চাতুরী করেছিলে, আমিও তার প্রতিশোধ নিয়েছি। কিন্তু আমিও তোমার পিছু ছাড়বো না। তুমি মনে করেছো ছলিমদ্দিন মাস্টারকে ফাঁকি দিয়া শান্তিতে ঘর সংসার করবে। না, না, কক্ষণও আমি তা হতে দিবো না হাঁ, হাঁ, হাঁ। (প্রস্থান)।

(মেহেরীর প্রবেশ)

মেহেরী : এ দিকে আমি সুখেই সংসার পেতে বসেছি। কিন্তু জানি না আমার ভাই ও পিতা কী অবস্থায় আছে?

গান :

দুঃখ যে মনের মাঝে হানিল আমায়
পিতা মাতার সনে দেখা করাও পরোয়ার
পিতা গেল বাণিজ্যে ছলনা করিয়া মাস্টার
পাঠায় বনেতে—
অসহায়ের সহায় তুমি ওগো পরোয়ার
পিতা মাতার মুখটি একবার দেখাও না আমায়। ঐ
এলাম রাজার মহলে
বার বছর কেটে গেল সুখের সাগরে
২ সন্তানের মাতা হইলাম ভবের মাঝারে
তবু না হইল দেখা পিতা মাতারে... দুঃখ যে... ঐ
নিশি প্রভাত কালে কাক ও কোকিলা ডাকে কদম্ব ডালে
নামাজ পড়িয়া আমি করি মোনাজাত- মাতার মুখটি... ঐ
দুঃখ যে... ঐ (ঘুমাবে)।

মেহেরী : ওহ খোদা! এ কী স্বপ্ন দেখলাম আমি। আমার পিতা মাতা আমার জন্যে কাঁদতে কাঁদতে পাগল হতে চলেছে। এখন আমি কী করব? এই কথা কাহারে জানাই।

www.pathagar.com

(মেঘ কুমারে প্রবেশ)

গান :

ও গো বহুদিন পরে আমি তোমার চক্ষে দেখি পানি
কি কারণে কাঁদছ তুমি, কী কারণে কাঁদছ তুমি
খুলে বল শুনি আমি ।
ও গো আমি তোমার জীবন সাথী
তুমি আমার অর্ধাঙ্গিনী
কি হয়েছে বল শুনি । আমি তোমার জীবন সাথী । ঐ

পাঠ : বল মেহেরী বল তোমার কী হয়েছে । তুমি আমায় খুলে বল ।

মেহেরীর গান :

ও গো আজ নিশীতে শুয়েছিলাম
ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখি পিতা মাতার মুখখানি
পিতা মাতার মুখখানি ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখি
আপন দেশে যাব আমি । আমায় তুমি নিয়ে চল
আমায় তুমি নিয়ে চল আপন দেশে যাব আমি ।

পাঠ : স্বামী! দেখতে দেখতে বারটি বছর কেটে গেল । আমি আমার পিতা মাতাকে দেখি না । আজ আমার প্রাণ আর বাঁধ মানছে না । পিতা মাতাকে না দেখা পর্যন্ত আমার মনে যে দুঃখের আগুন দাও দাও করে জ্বলতে থাকবে ।

মেঘকুমার : শুন প্রিয়তম । সেজন্য তুমি কোন ভাবনা কর না । আমি আজই আব্বা আম্মার কাছ থেকে তোমার দেশে যাবার ব্যবস্থা করে দেব । চল, মেহেরী আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই ।

মেহেরী : তাই চলুন স্বামী । (উভয়ের প্রস্থান) ।

(ফিরোজ ও উজিরের প্রবেশ)

ফিরোজ : উজির সাহেব । আমি যে মেঘকুমারকে সিংহাসনে বসানোর প্রস্তাব দিয়েছি, তার কী করছেন আপনারা?

উজির জাঁহাপনা, আমি প্রাসাদের সকল কর্মচারীর সঙ্গে আলোচনা করেছি । তারা সবাই আপনার প্রস্তাবে রাজি । আপনি হুকুম দিলেই মেঘকুমারকে সিংহাসনে বসানোর সকল ব্যবস্থা করতে পারি ।

(মেঘকুমার, মেহেরী ২ সন্তানসহ প্রবেশ)

মেঘকুমার : আব্বাহুজুর আমি আমার ২ সন্তান ও মেহেরীকে সঙ্গে নিয়ে আমার শ্বশুরালয়ে বেড়াইতে যেতে চাই । আপনি খুশি মনে আমাদের বিদায় দিন ।

www.pathagar.com

ফিরোজ : একি বলছ বাবা মেঘ। আমি স্থির করেছি তোমাকে সিংহাসনে বসিয়ে আমি অবসর নিবো। আর এই মুহূর্তে তুমি বেড়াইতে যেতে চাও শ্বশুরালয়ে? তা হই না বাবা। আর কয়েকটা দিন পরে।

মেহেরী : আব্বাহুজুর আমার পিতা-মাতাকে দেখার জন্য আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আপনি খুশি মনে বিদায় দিলে আমরা পিতা মাতার সঙ্গে দেখা করে আবার তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো।

ফিরোজ : মা তুমি আমাকে উভয় সংকটে ফেললে। কারণ তুমি আমার মায়ের মত। তাই আমাকে তোমার কথাও রাখতে হয়। এদিকে আমি যে মেঘ কুমারকে সিংহাসনে বসানোর প্রস্তাব দিয়েছি এখন কোন দিকে যাই।

(প্রবেশ পথে সেনাপতি)

সেনাপতি : উভয় দিকই ঠিক রাখা যাবে জাঁহাপানা। তাহলেই সকল সমস্যা সমধান হবে।

ফিরোজ : আপনি কী বলতে চান সেনাপতি সাহেব?

সেনাপতি : আমি বলতে চাই–মেহেরী ২ সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে বাপের দেশে বেড়াইতে যাক। আর এদিকে আপনি কুমারকে সিংহাসনে বসিয়ে বিশ্রাম করুন জাঁহাপানা।

ফিরোজ : তা কী করে হয়? মেহেরী তার ২ সন্তানকে নিয়ে কীভাবে দেশে যাবে?

সেনাপতি : কেন জাঁহাপানা। আপনি আমার হাতে ন্যস্ত করুন। আমি আপনার পুত্রবধূ ও দুই নাতিকে সঙ্গে নিয়ে চলে যাব ইরান শহরে। মেহেরীকে তার বাবা মা'র সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে আবার সঙ্গে করে আপনার কাছে ফিরে আসব। আপনার পুত্রবধূ আমার মেয়ের মত। মেহেরী যদি আমার মেয়ে হত তাহলে কী আমি ওকে নিয়ে যেতে পারতাম না?

ফিরোজ : হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেনাপতি সাহেব, আপনি যুক্তিসঙ্গত কথাই বলেছেন। আমি মেহেরীকে আপনার সঙ্গেই ইরান শহরে পাঠাব।

মেঘকুমার : তা হয় না পিতা মেহেরীকে আমি...

ফিরোজ : বাবা মেঘে তুমি আর অমত কর না। সেনাপতি সাহেব তো আমার নিজের লোক। আর মেহেরী তো তার মেয়ের মতই। তবে আর দেরি নয় সেনাপতি সাহেব। আপনি এই মুহূর্তে মেহেরীকে নিয়ে রওনা হয়ে যান।

সেনাপতি : চলে এসো মা মেহেরী। এসো ভাই তোমরা আমি তোমাদের নানা বাড়ি দেখাব।

মেহেরী : (সবার পায়ে সালাম করে) আব্বা আমি এখন আসি। (প্রস্থান)।

ফিরোজ : উজির সাহেব। আমার মেয়ের মত পুত্রবধূকে আর আমার ২ নাতিকে সেনাপতির সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে আমার যেন কেমন কেমন লাগছে। মোটেও ভাল লাগছে না।

www.pathagar.com

উজির সেনাপতির নিকট ওদের পাঠিয়ে দেওয়া আমার কাছেও সুবিধা মনে হচ্ছে না। আমার মনটাও যেন কেমন করছে।

ফিরোজ : ওদেরকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি বড্ড চিন্তায় পড়ে গেলাম বাবা মেঘ, তুমি আর বিলম্ব না করে এই মুহূর্তে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে ছুটে যাও পিছে পিছে। ওদের সঙ্গে দেখা হলে, তুমি নিজেই ওদের তোমার শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যাবে। যাও আর দেরি করিও না।

মেঘকুমার : আমি তাই যাচ্ছি পিতা। (প্রস্থান)।

উজির : জাঁহাপনা। আর চিন্তা না করে চলুন মহলে গিয়ে বিশ্রাম করি গে।

ফিরোজ : তাই চলুন উজির সাহেব। (প্রস্থান)।

(খোরশেদ রাজার প্রবেশ)

খোরশেদ : আমি নিশিথে নিদ্রায় শুয়ে ছিলাম পালঙ্ক মাঝারে। ঘুমের ঘরে কে যেন আমায় ডেকে বলল, আব্বা আমি আসবো? সেই নাক, সেই মুখ, সেই চোখ, সেই সুর। ঠিক যেন আমার মেয়ে মেহেরীর মতো। তাই আমার মন বলছে—আমার মেহেরী বেঁচে আছে। না না, আমি যে নিজেই মেহেরীকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলাম। ওগো খোদা তুমি আমায় এত নিষ্ঠুর করে দিয়েছিলে কেন?

(খুশুর প্রবেশ)

খুশু : বাবা তুমি অমন করছো কেন? কী হয়েছে তোমার?

খোরশেদ : ওরে. ওরে, বাপ! তুমি আমার বুকে আয়। (জড়িয়ে ধরে) বাবা আমি যে তোকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলাম, তুইকি সত্যিই মেহেরীকে হত্যা করেছিলি? বল্, বাবা বল্ তুই আমাকে সত্য কথা বল।

খুশু : হ্যাঁ বাবা, আমি তোমার আদেশ মতো মেহেরীকে...

খোরশেদ : হত্যা করেছিস! ওহ্ কী নিষ্ঠুর পিতা আমি। নিজের মেয়েকে হত্যার আদেশ দিয়েছি। তবু, তবু কেন, কেন আমার মন বলছে আমার মেহেরী বেঁচে আছে। ও যেন আমায় দেখার জন্য পাগল হয়ে গেছে। ওরে, ওরে খুশু তুই শুধু একবার বল ওকে তুই হত্যা করিস নি। বল বাবা বল। আমি যে মেয়ের শোকে পাগল হয়ে যাব।

খুশু : বাবা, বাবা আমি, আমি মেহেরীকে হত্যা করিনি।

খোরশেদ : হত্যা করিসনি? তা হলে যে রক্তমাখা রুমাল এনে আমায় দেখিয়েছিলি?

খুশু : আমায় ক্ষমা করবেন পিতা আমি আপনার সেই আদেশ পালন করতে পারিনি। আমি যখন মেহেরীকে নিয়ে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলাম তখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এমনকি সেখানেই বিশ্রাম নিই। মেহেরী তখন বিভোর ঘুমে পড়ে যায়। আমি মেহেরীকে হত্যার উদ্দেশে খড়্গ হাতে নেই কিন্তু...

খোরশেদ : কিন্তু তারপর কী হল?

www.pathagar.com

খুশু : তারপর আমি আমার স্নেহের বোন মেহেরীকে...

খোরশেদ : মেহেরীকে...

খুশু : হত্যা করতে পারিনি পিতা। পিতা ঘুমন্ত অবস্থায় মেহেরীকে বনে রেখে আমি পালিয়ে আসি।

খোরশেদ : না, না, এসব তুই মিথ্যা বলছিস আমাকে।

খুশু : আমি যে রক্তমাখা রুমাল আপনাকে দিয়েছিলাম। সেটা আমার ছলনা ছিল পিতা। আমি বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় কুকুর মেরে, কুকুরের রক্তে রুমাল ভিজিয়ে এনে আপনাকে দিয়েছিলাম। সেইজন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি পিতা। আপনি আমায় ক্ষমা করুন পিতা।

খোরশেদ : ওরে বাবা খুশু। আমি যে তোকে কী দিয়ে খুশি করবো তা আমি এখন ভেবেই পাচ্ছি না। বাবা খুশু, তবে আর দেরি নয়, এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড় মেহেরীর খোঁজে।

খুশু তা পিতা আমি এই মুহূর্তে চলে যাচ্ছি মেহেরীর খোঁজে। যেখান থেকেই পারি মেহেরীকে খুঁজে বের করে আপনার নিকট হাজির করবো। চলি পিতা। (প্রস্থান)।

খোরশেদ : •ও গো জগদীশ্বর। আমি দু' হাত তুলে তোমার নিকট প্রার্থনা করি তুমি আমার মেয়ে মেহের নিগারীর সহায় থেকো। (প্রস্থান)।

(গাইতে গাইতে মেঘকুমারের প্রবেশ)

একটি মনের দাম দিতে গিয়ে কী আমি পেলাম
কি আমি পেলাম ...।

পাঠ : হায় খোদা। আমি আর কতোদিন এভাবে মেহেরীকে খোঁজে বেড়াবো? আমি কী আমার ২ সন্তানের দেখা। আর পাবো না? ও গো জগদীশ্বর আমি তোমার নিকট ফরিয়াদ করছি, তুমি আমার ২ সন্তান ও মেহেরীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও খোদা। (প্রস্থান)।

(খুশুর প্রবেশ)

খুশু এইতো সেই জায়গা। এখানেই আমার বোন মেহেরীকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখান থেকে সে যে কোন দিকে কোথায় গেছে জানি না। এখন আমি কোন দিকে গেলে মেহেরীকে পাবো? ও গো খোদা, তুমি আমার বোন মেহেরীকে আমার নিকট ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দাও। (প্রস্থান)।

(সেনাপতি, মেহেরী ২ সন্তানসহ প্রবেশ)

মেহেরী : সেনাপতি সাহেব। এ কোন পথে আমাদের নিয়ে এলেন?

www.pathagar.com

সেনাপতি : আমি তোমাকে আসল পথেই এনেছি। কারণ যে পথে আসলে আমি তোমাকে পাবো ঠিক সেই পথেই আমি তোমাকে এনেছি।

মেহেরী : এ কী বলছেন সেনাপতি সাহেব?

সেনাপতি : হাঁ হাঁ মানেটা বুঝলে না সুন্দরী। আমি, আমি তোমার প্রেম সুধা পান করার জন্য বহুদিন অপেক্ষা করছি। ছলে, বলে, কৌশলে আজ তোমায় আমার হাতের মুঠোয় পেয়েছি। এখান থেকে তোমার আর বাঁচার উপায় নেই। তাই তুমি স্বেচ্ছায় তোমার রূপ যৌবন উজার করে দাও। আমি তোমার প্রেম সুধা মন ভরে পান করি।

মেহেরী : না, না সেনাপতি সাহেব ও কথা বলবেন না।

সেনাপতি : 'না' কথাটা আমি বেশি পছন্দ করি না।

মেহেরীর গান :

ও গো শ্বশুরেরী সেনাপতি,
পিতার সমান জানি। আমি শ্বশুরেরী সেনাপতি
আপনে আমার ধর্মের পিতা,
ধর্মের কাজও করেন পিতা—আপনে... ঐ

সেনাপতি : না, না, আমি তোমার কাছ থেকে ও কথা শুনতে চাই না। বলো, তুমি আমাকে প্রেম-সুধা পান করতে দিবে কিনা?

মেহেরীর গান :

ও গো হাতে ধরি পায়ে পড়ি
ক্ষমা করেন আমায় আপনে
ক্ষমা করেন আমায় আপনের হাতে ধরি
পায়ে পড়ি....

সেনাপতি : আমি বুঝতে পেরেছি সোজা কাথায় কাজ হবে না। এখন আমি জোর করে তোমার রূপ-যৌবন হরণ করে নিবো। এসো, এসো সুন্দরী তুমি আমার কছে এসো। (ধরতে যাবে)।

মেহেরের ছেলে : সাবধান, শয়তান। আমরা ২ ভাই থাকতে আমার মায়ের ক্ষতি হতে আমরা দিব না। (ছোরা নিয়ে মারতে যাবে)।

সেনাপতি : তবে রে টেবুল ছে। (আঘাত) যা যমের দুয়ারে পৌছে যা।

মেহের : ওরে দুষ্টু, লম্পট, তুই আমার ছেলেকে মেরে ফেললি। আমি তোকে (ছোরা উত্তোলন)।

সেনাপতি : রাখো, রাখো মেহেরী (বাঁধা দিয়ে) তুমি হয়ত আমাকে এখনও চিনতে পারো নাই। এই চেয়ে দেখ (দাড়ি ফেলে) আমি কে? যাকে একদিন তুমি অপমান করেছিলে।

মেহের ছলিম উদ্দিন মাস্টার।

www.pathagar.com

মাস্টার : হাঁ হাঁ আমি, আমি সেই ছলিম উদ্দিন মাস্টার।

মেহের : শয়তান তুই আমার পিতার নুন জল খেয়ে দেহ পুষ্ট করেছিলি। আমার প্রতারণা করে আমাকে মহল থেকে বনে পাঠিয়েছি। দেখ দেখরে শয়তান আবার আমার মহলে ঠাঁই হয়েছে।

সেনাপতি : তাই তো মহলে ঠাঁই পেয়ে সুখের সাথে ১২টি বছর কাটিয়ে দিলে। ২ সন্তানের মা হলে হাঁ হাঁ হাঁ আর, আর আমি তোমারই প্রেমের আগুনে জ্বলে পুড়ে ১২টি বছর অপেক্ষা করেছি। আজ আমি তোমায় বনে এনেছি। সেই মনের আগুন নিবানোর জন্য এসো, এসো নারী আমার মনের আসা পূরণ করি। (ধরবে) (২য় ছেলে মারতে যাবে)।

২য় ছেলে : তবে রে শয়তান।

সেনাপতি : নে, তুইও যা তোর ভায়ের সঙ্গে (আঘাত করবে)।

মেহের : (ছেলেকে ধরে) এ, তুই কী করলি শয়তান। তুই আমার ২ সন্তানকে মেরে ফেললি। এখন আমি ওর বাবাকে কী জবাব দিবো? (কান্না) না, না এখন আমার কাঁদলে চলবে না। এখান থেকে বাঁচতে হলে আমাকে ছলনার আশ্রয় নিতে হবে।

সেনাপতি : হাঁ হাঁ হাঁ, আমি তোমার ২ সন্তানকে হত্যা করেছি—শুধু তোমাকে পাবার জন্য। ওরা থাকলে ঝামেলা। এখন শুধু তুমি আর আমি। এসো সুন্দরী আমার মনের আশা পূরণ করি।

মেহের : সত্যি, আপনি আমাকে এতো ভালবাসেন সে কথা আমি আগে বুঝি নাই। যাক আমি সব দুঃখ কষ্ট ভুলে গেলাম। আজ থেকে আমি শুধু আপনার।

সেনাপতি : ঠিক বলেছো মেহেরী? তুমি তাহলে আমাকে ভালবাসবে?

মেহের : যে মানুষটা আমার জন্য ১২টি বছর অপেক্ষা করতে পারে- আমি কি তাকে ভালো না বেসে পারি? তবে আমার একটা কথা রাখবেন।

সেনাপতি : চলো মেহেরী কী কথা তোমার। তোমার একটা কেনো তোমার সাত সাত কথাও আমি রাখবো।

মেহেরী : তাহলে এক কাজ করুন। আপনার শরীরের রক্তগুলি ধুইয়ে পরিষ্কার করে আসুন। তারপর আমি আমার যৌবন উজার করে দিবো। যতো ইচ্ছা তুমি পান করতে পারবা।

সেনাপতি : আমি রক্ত পরিষ্কার করতে যাবো, তুমি তো আবার পালাবে না?

মেহের : (কাছে গিয়ে) ও কথা বলো না, লক্ষ্মীটি। আমি যে তোমার। আমি তোমাকে ছেড়ে এই গহিন বনে কোথায় যাবো? এখানে তুমি ছাড়া আমার যে আর কেহই নেই।

সেনাপতি : ঠিক আছে। ঠিক আছে মেহেরী তুমি এখানে বসো। আমি এখনি আমার গায়ের রক্ত পরিষ্কার করে আসছি। (প্রস্থান)।

www.pathagar.com

মেহেরী : হায় খোদা। এখন আমি কেমন করে আমার সতীত্ব রক্ষা করি। আমি এখান থেকে পালিয়ে গেলে আমার এই মৃত দুই ছেলের লাশের কী হবে? কে করবে ওদের সৎকার। আর ওর বাবার সঙ্গে দেখা হলে আমি কী জবাব দিবো? না, না আর দেরী করা চলবে না। সেনাপতি এখনি এসে পড়বে। তাই আমার সতীত্ব রক্ষা করতে হলে এখান থেকে আমাকে পালাতে হবে। ও যে আমার বুকের মানিক, আমি তোদের মা না। আমি রাক্ষসিনী। তোদের দুই ভাইকে আল্লাহর উপর দিয়ে গেলাম। তোরা আমাকে অভিশাপ দিস, অভিশাপ দিস। (প্রস্থান)।

সেনাপতি : একি। মেহেরী কোথায় গেল? তাহলে মেহেরী এবারও কি আমাকে ধোকা দিয়ে বোকা বানিয়ে চলে গেল। মেহেরী যে পথে পালিয়ে গেছে ঠিক আমিও সেই পথেই যাবো। (প্রস্থান)।

(খুশুর প্রবেশ পথে সেনাপতিকে ঘেষে)

খুশু একি। লোকটি উন্মাদের মতো ছুটে গেল কেন? ওকে তো তাহলে দেখতে হয়। (প্রস্থান)।

মেহেরী : হায় খোদা। তুমি আমাকে রক্ষা কর। খোদা তুমি আমায় রক্ষা করো।

(সেনাপতির প্রবেশ পথে)

সেনাপতি : ঐ ঐ তো মেহেরী দৌড়াইতেছে। তবে যাবে কোথায়? আরো শয়তানী কোথায় পালাবি? তোর পালানোর পথ বন্ধ।

মেহেরী : হে খোদা আমি বুঝি আমার ইজ্জত আর রক্ষা করতে পারলাম না। ও গো কে কোথায় আছ আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও।

সেনাপতি : হাঁ, হাঁ, হাঁ, কেউ নেই, কেউ নেই। সুন্দরী শুধু শুধু তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে? তবে এখন যাবে কোথায়? কে তোমাকে রক্ষা করবে?

মেহেরী : শয়তান মনে রাখিস সতি নারীকে স্পর্শ করলে জ্বলে পুড়ে মরবি।

সেনাপতি : হাঁ তুমি ঠিকই বলেছো সুন্দরী। আমি যে তোমার প্রেমের আগুনে জ্বলে পুড়ে মরছি। এসো এসো সুন্দরী আমি তোমার প্রেম সুধা পান করে মনের জ্বালা নিবারণ করি। এসো। (ধরবে)।

মেহেরী : ছেড়ে দে ছেড়ে দে শয়তান। আমাকে ছেড়ে দে।

সেনাপতি : ছেড়ে দেব। হাঁ, হাঁ, হাঁ।

মেহেরী : ও গো কে কোথায় আছ। এই শয়তানের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।

(খুশু প্রবেশ পথে)

খুশু ঐ ঐ তো বনের ভিতরে মেয়ে লোক চিৎকার করছে। (দেখে) সাবধান দুস্যু?

সেনাপতি : এই তুই কেরে? আমার কাজে বাঁধা দিতে এসেছিস। ভালোয় ভালোয় এখান থেকে পালিয়ে যা।

www.pathagar.com

খুশু : না গেলে?

সেনাপতি : না গেলে আমি তোকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিবো।

খুশু : তা হলে দেখা যাক—কে কাজে যমালয়ে পাঠায়।

সেনাপতি : এসো তবে ধর অস্ত্র কর রণ, এবার মিটবো তুমার যুদ্ধের সাধন।

(উভয়ে তুমুল যুদ্ধ প্রবেশ পথে মেঘকুমার)

মেঘকুমার : ওহো লোক দু'টি যে এতো মারামারি করছে, তবে কেন, কেন ওরা মারামারি করছে?

(সেনাপতির পতন খুশু রশি দ্বারা বেঁধে)

খুশু : এই যে বোন, তুমি মেয়ে মানুষ–একা একা কেন বনে এসেছিলে?

মেহেরী : সে অনেক কথা–ভাই।

খুশু : তুমি আমার ভাই ডাকলে–আরে বোন ঐ ভাই ডাক শুনার জন্যে কত পাহাড় পর্বত তন্ন তন্ন করে খোঁজে বেড়াইতেছি।

মেহেরী : কেনো ভাই?

খুশু : সে অনেক কথা।

মেঘকুমার : পথে মেয়েটা বলে অনেক কথা আবার ছেলেটাও বলে অনেক কথা। এই অনেকটাই কি আমার জানতে হবে। তারা কী করে?

মেহেরী : কি আপনার অনেক কথা ভাই?

খুশু : ডেকো না ডেকো না আমায় ভাই বলে ডেকো না। আমি নিজ হাতে আমার বোনকে এই বনে বনবাস দিয়েছিলাম।

মেহেরী : আপনার বোনের নাম মেহেরী নিগার–তাই না?

খুশু : তা তুমি ও নাম জানলে কী করে?

মেহেরী : দেখুন তো–এই লোকটি আপনার বোনকে পড়াতো না? ওর হাতের পত্র পেয়ে মেহেরীকে বনবাসে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। ঐ দেখুন সেই শয়তান ছলিম উদ্দিন মাস্টার। আমিই তোমার সেই বোন মেহের নিগার।

খুশু : আয় বোন তুই আমার বুকে আয়।

মেহেরী : (জড়িয়ে ধরে) ভাইজান।

খুশু : বোন আমি তোকে কত খুঁজেছি।

(মেঘকুমারের প্রবেশ)

মেঘকুমার : বেশ তো ভাই আর বোন মিলন হলো। আমি আর কত খুঁজবো আমার স্ত্রী পুত্রকে।

মেহেরী : (স্বামীকে ধরে) ওগো তুমি এখানে কীভাবে এলে?

মেঘকুমার : আমি তোমাকেই খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসেছি।

www.pathagar.com

মেহেরী : ভাইজান, ইনি আমার স্বামী–ফেরুজ বাদশার ছেলে মেঘকুমার।

খুশু : ফিরোজ বাদশার ছেলে তোমার স্বামী! এসো এসো ভাই, এসো বোন–তোমরা আমার বুকে (জড়িয়ে) এসো।

মেঘকুমার: মেহেরী আমার সন্তান কোথায়? ওদের যে দেখছি না।

মেহেরী : আমায় ক্ষমা করেন স্বামী। আমি আপনার সন্তানকে রক্ষা করতে পারি নাই। ঐ শয়তান আমার ছেলে দু'টিকে হত্যা করেছে।

মেঘকুমার : হত্যা করেছে। তবে রে শয়তান আমি তোকে...

মেহেরী : (বাঁধা দিয়ে) না, না স্বামী—আপনে ওকে মারবেন না।

(মেহেরী মেঘকুমারের হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে) ঐ শয়তানকে হত্যা করবো আমি (অস্ত্র বসিয়ে দিয়ে) এখন বুঝে নে শয়তান উপরওয়ালা আছে কি নেই?

সেনাপতি : ওহ্। আমি পাপ করেছিলাম। তাই আজ আমাকে প্রাণ দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো। ওগো পৃথিবীর মানুষ তোমরা এমন পাপ করো না, এমন পাপ করলে পরিণামে জীবন দিতে হয়। ওহ্ (মৃত্যু)।

মেহেরী : চলেন স্বামী।

খুশু : চল সবাই আমরা বাড়ি যাই।

www.pathagar.com

২. গুনাই বিবি

বন্দনা :

আমরা প্রথমে বন্দনা করি আল্লাহ নবীর নাম
তারপরে বন্দনা রসুলের চরণ ও
পূবেতে বন্দনা করি পূবে উদয় ভানু
একদিকে উদয় গো ভান চৌদিকে রৌসান ও। ঐ
আমরা দক্ষিণে বন্দনা করি দরিয়ার সাগর ও
সেই সাগরে চালায় ডিঙ্গে সাই সদাগর ও। ঐ
পশ্চিমে বন্দনা করি হজ্ব-মক্কা শহর ও
সেই শহরে রইছে জনম রসুল পয়গাম্বর ও। ঐ
উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত ও
সেই পর্বতে রইছে জনম মালকের পাহাড় ও। ঐ
চার কোনা বন্দনা করি আমরা করলাম স্থির
পাতালে বন্দিয়া গাবো আশি হাজার পীর। ঐ
সভা করে বসছেন সবে হিন্দু মুসলমান ও
মুসলমানকে জানাই সালাম হিন্দুকে প্রণাম ও। ঐ
সবার ভিতর যে জন জানেন জারি কিস্সা সান
সে জন আমার উস্তাদ গুরু আমি তার সাগরেদ। ঐ
সবার ভিতর আছেন যতো শ্রোতা বন্ধুগণ
মন দিয়ে শুনেন সবাই গুনাই বিবির গান। ঐ

(লাল মিয়ার প্রবেশ)

লাল : হায় খোদা! একি দুঃস্বপ্ন দেখালে আমায়। আমার মন বলছে, আমি বোধহয় আর বাঁচবো না। এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে আমাকে চলে যেতে হবে। কোথায় আবদুল হামিদ, আবদুল হামিদ।

(হামিদ এর প্রবেশ)

হামিদ : আমার ডেকেছেন বড়ো সাহেব?

লাল : হামিদ তুমি এই মুহূর্তে আমার ভাই দুলো ও ছেলে তোতা মিয়াকে আমার সম্মুখে ডেকে নিয়ে এসো।

হামিদ : আমি তাই যাচ্ছি বড়ো সাহেব। (প্রস্থান)।

(দুলু ও তোতা মিয়ার প্রবেশ)

দুলু : দাদা! আমার কী জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন?

লাল : ভাই দুলু বাবা তোতা তোমরা আমার কাছে এসো।

দুলু : দাদা, দাদা, আপনার কী হয়েছে? আপনি অমন করছেন কেন?

লাল : (ধরে) ওরে তোরা শোন। আমি আজ নিশিতে নিদ্রায় শুয়েছিলাম পালঙ্ক মাঝারে। হঠাৎ কে যেন আমায় ঘুমের ঘোরে ডেকে বললো লাল তুমি

www.pathagar.com

স্বর্গবাসে চলে এসো। তখনি আমার ঘুম ভেঙে গেল। জাগ্রত হয়ে দেখি কেউ নেই আমার পাশে। তাই আমার মন বলছে, আমি হয়তো আর বাঁচবো না রে।

দুলু দাদা, দাদা। স্বপ্নের কথা বিশ্বাস করা যায় না। দাদা।

লাল তবু যে মরণের কথা আমার মনে হয়েছে। তাই মরণের পূর্বে আমি তোমাকে কয়েকটা শর্ত দিয়ে যেতে চাই। বলো ভাই বলো, তুমি আমার শর্তগুলি পালন করবে কিনা?

দুলু বলেন ভাই—আপনার কী শর্ত। আমি আপনার সব শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো?

লাল : ভাই দুলু, আমার এক নম্বর শর্ত হলো–আমার ছেলে তোতা মিয়াকে সন্তানের আদর দিয়ে লালন পালন করবে। দুই নম্বর শর্ত হলো তাকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবে। তিন নম্বর শর্ত হলো–যৌবন প্রাপ্ত হলে, পরমা সুন্দরী কন্যাদানে বিবাহ দিবে। চার নম্বর শর্ত হলো—তাদের সংসার গড়ার সময় হলো ১৮ লক্ষ টাকার অর্ধেক ভাগ তাকে বুঝিয়ে দিবা—বলো ভাই তুমি আমার কথা রাখবে কিনা?

দুলু আপনার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো?

(গাইতে গাইতে পাগলের প্রবেশ)

ও লাল মিয়া তোমায় করি মানা
দুলুর হাতে টাকা সপিও না (২ বার)
ও দুলুর হাতে সপিও না গো (২ বার)
ও লাল মিয়া... ঐ

দুলু দূর হয়ে যা পাগল।

পাগলের গান :

ও পাগল পাগল বলিস কারে
আমি নইরে সেই পাগল (২ বার)
কাঁদতে কাঁদতে জনম যাবে
রক্ত হবে তোর চোখের জল।
ও পাগল পাগল... ঐ (প্রস্থান)।

লাল : ভাই দুলু, পাগল যেন কী বলে গেল।

দুলু : দাদা, ও হয়েছে বনের পাগল। যা তা বলে থাকে। ওর কথায় কান দিও না, দাদা।

লাল এই নাও ভাই কাগজপত্র (দিবে) আমি যে আর স্থির থাকতে পারছি না। সমস্ত পৃথিবীটা যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। ওগো তোরা আমায় ধর, আহ্।

তোতা : বাবা, বাবা।

www.pathagar.com

দুলু : দাদা, দাদা।
লাল : ভাই দুলু, বাবা তোতা—আ-মা-র আর সময় নেই। আহ। (মৃত্যু)।
দুলু : ওহ তোতা দাদা আর নেই।
তোতা : বাবা, বাবা- ওহ বাবা এখন আমার কী হবে?

গান :

আমি ডাকিবো কারে গো পিতা পিতা বইলা (২ বার)
মাতা মইল পিতা মইল কাকা গো
কাকা নাই কো আপন ভাই।
আমি ডাকিবো কারে গো... ঐ
আজ হতে কেবা আমায় কাকা গো
করিবে লালন- আমি ডাকিবো... ঐ

দুলু বাবা, তোতা এই দুনিয়া ছেড়ে সবাইকে একদিন চলে যেতে হবে। আর দুঃখ করো না তোতা, আমিতো আছি। চল, এখন তোমার পিতার সৎকারের ব্যবস্থা করি।
তোতা : তাই চলো কাকা। (সকলের প্রস্থান)।

(দুলুর প্রবেশ)

দুলু : কোথায় আবদুল হামিদ (২ বার)।

(হামিদের প্রবেশ)

হামিদ : আমায় ডেকেছেন, ছোট সাহেব।
দুলু : হামিদ তুমি এই মুহূর্তে আমার বন্ধু রহমান খাঁকে ডেকে নিয়ে এসো।
হামিদ : আমি তাই যাচ্ছি ছোট সাহেব। (প্রস্থান)।

(হামিদ ও রহমান খার প্রবেশ)

রহমান : সালাম বন্ধু সালাম। তবে আমায় কী জন্যে স্মরণ করেছেন?
দুলু : বন্ধু. আমি স্থির করেছি আমার বাড়ির সম্মুখে একটা নতুন স্কুল গঠন করবো তাতে আপনার মতামত আমি কামনা করছি–বন্ধু।
রহমান : স্কুল গঠন করবেন—সে তো আনন্দের কথা বন্ধু। আপনার এলাকার ছেলেমেয়ে সবাই সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে।
দুলু বন্ধু–তাহলে আর কালবিলম্ব না করে আজই দুইজন কারিগর ডেকে এনে স্কুলঘর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করে দিন।
রহমান : বন্ধু আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আমি আজই স্কুলের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করে দিবো। হামিদ তুমি ২ জন কারিগর ডেকে নিয়ে এসো।
হামিদ : আমি তাই যাচ্ছি জাঁহাপনা। (প্রস্থান)।

(গাইতে গাইতে কারিগরের প্রবেশ)

www.pathagar.com

আমার চিনলে না গো- আমরাই কলের মিস্ত্রী
নাও গড়ছি জাহাজ গড়াই আমরা গো
সাহেব গড়াই রেলের গাড়ী–
আমায় চিনলে না গো... ঐ ।

মিস্ত্রী : সালাম জাঁহাপনা । আমাদের কী জন্যে ডেকেছেন হুজুর ।

রহমান : শুন মিস্ত্রী । আমার বন্ধুর বাড়ির সম্মুখে একটা নতুন স্কুল গঠন করা হবে । তোমরা কী পারবে স্কুলের নির্মাণ কাজটি করে দিতে?

মিস্ত্রী : পারবো না কেন । নৌকা, গাড়ি, বাড়ি, সেতু, স্টীমার গড়াই তো আমাদের কাজ । তবে স্কুলের কাজের মজুরী দিবেন পাঁচ হাজার টাকা ।

দুলু শুন মিস্ত্রী, আমি তোমাদের পুরো পাঁচ হাজার টাকাই দিবো । তবে ভাল করে কাজ করবে । চলেন বন্ধু আমরা এখন অন্তঃপুরে যাই ।

রহমান : তাই চলেন বন্ধু । (উভয়ের প্রস্থান) ।

মিস্ত্রী : আরে মদন কাজ ভালো না হলে তোর আমার হবে কিন্তু ভীষণ চোদন । ধর, আর দেরি না করে কাজ কর ।

২য় মিস্ত্রী : এইতো ভাই আমি আরম্ভ করলাম ।

গান :

ও ঘর তুলিলাম সারি সারি
স্কুল দিলাম দুলুর বাড়ি
স্কুল দিলাম দুলুর বাড়ি গো
স্কুল দিলাম দুলুর বাড়ি.... ঐ

(দুলু ও রহমানের প্রবেশ)

দুলু : কি মিস্ত্রী এখনও তোমাদের কাজ শেষ কর নি?

২য় মিস্ত্রী : শেষ, জমিদার সাহেব । আমাদের কাজ একেবারে কম্প্লিট । ভালোভাবে দেখে নিন ।

দুলু : বেশ চমৎকার কাজ করেছো তোমরা । এই নাও তোমাদের মজুরীর টাকা (দিবে) ।

১ম মিস্ত্রী : জমিদার সাহেব, এখন আমরা আসি । আর যদি কাজের দরকার হয়–তা হলে আমাদের ডাকবেন । আসি–সালামু আলায়কুম । (প্রস্থান) ।

দুলু বন্ধু অতি উত্তম স্কুল নির্মাণ হয়েছে । এখন আপনি একজন মাস্টার ডেকে স্কুলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করুন ।

রহমান : আপনি কোনো চিন্তা করবেন না । আমি আজই মাস্টার এনে স্কুল পরিচালনার ব্যবস্থা করে দিবো । চলেন বন্ধু–এখন আমরা অন্তঃপুরে যাই । (উভয়ের প্রস্থান) ।

(মাস্টারের প্রবেশ)

www.pathagar.com

মাস্টার : আমি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এ অনার্স পাশ করে ১ বছর যাবৎ বাড়িতে বেকার বসে আছি। তাই আজ থেকে জমিদার বাড়ির নতুন স্কুলের মাস্টারিতে জয়েন্ট করলাম। দেখি স্কুলটি চালু করতে পারি কী না?

(দুলু ও তোতার প্রবেশ)

মাস্টার : আসুন আসুন জমিদার সাহেব। বসুন, তা কী মনে করে স্কুলে এলেন?

দুলু : মাস্টার সাহেব। আমি বসতে আসিনি। আমি এসেছি আমার ভাতিজা তোতা মিয়াকে স্কুলে ভর্তি করে দিতে।

মাস্টার : জমিদার সাহেব–আমি তোতা মিয়াকে ভর্তি করে নিলাম।

দুলু : ওকে আপনি ভালোভাবে শিক্ষা দিবেন–আমি এখন আসি। (প্রস্থান)।

(রফিক ও গুনাই এর প্রবেশ)

রফিক : সালাম মাস্টার সাহেব।

মাস্টার : ওয়ালাইকুম সালাম। তা কাজী সাহেব সঙ্গে এই মেয়েটি কে?

রফিক : মাস্টার সাহেব এইটা আমার ছোটবোন। ওর নাম গুনাই সুন্দরী, ওকে আপনার স্কুলে ভর্তি করে দিতে এসেছি। আপনি ওকে স্কুলে ভর্তি করে নিন।

মাস্টার : কাজী সাহেব ৩ টাকা ৯ পয়সা ভর্তি ফিস আর মাসিক বেতন ১ টাকা পাঁচ আনা–তা এনেছেন তো?

রফিক : সেটা তো আমার জানা ছিল না তবে আগামী কাল গুনুর কাছে পাঠিয়ে দিবো। আপনি আমার বোনকে ভালোভাবে শিক্ষা দিবেন। এখন তবে আসি আমি। (প্রস্থান)।

মাস্টার : তোতা মিয়া তুমি এখানে বসে বসে পড় :
আষাঢ়ে নামিল ঢল খালে আর বিলে
মনো মিয়া মারে মাছ নিয়ে যায় চিলে।

আর গুনু তুমি পড় :

আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বোশেখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।

(পাগলের প্রবেশ–পথে)।

পাগল : ধরুন, ধরুন মাস্টার সাহেব। আমার পড়া ঠেইল্ল্যা আইতেছে।

মাস্টার : এই বেয়াদব–(মারবে)।

পাগল : রাখেন স্যার মারবেন না। আপনারটা হয় নাই।

মাস্টার : এই বেয়াদব, কী হয় নাই।

পাগল : এই যে স্যার আবার কইলেন, আমার নাম তো বেয়াদব না স্যার।

মাস্টার : আরে বোকা।

www.pathagar.com

পাগল : না, না, স্যার তাও হলো না- আমার নাম বোকাও না।

মাস্টার : তাহলে তোর নাম কী? থাকিস কোথায়?

পাগল : স্যার, আমার আসল নাম নেংটা ছেড়া-বাড়ি আমার টুংরা পাড়া। বাবা গেল হাটে মায় গেছে ঘাটে। আসতে সময় মায় কইছে বসতে দিবেন চটে।

মাস্টার : হ্যাঁ, হ্যাঁ এই চটেই বস আর পড়।

পাগল : বসবে এবং উঠে পড়বে।

মাস্টার : এই নেংটা একি হচ্ছে?

পাগল : কেন স্যার, আপনেই যে কইলেন বস্ আর পড়।

মাস্টার : আরে আমি তোরে বইয়ের পড়া পড়তে বলছি। বুঝলি? আজ তোমাদের স্কুল ছুটি দেওয়া গেল। আগামীকাল সময় মতো স্কুলে এসো। (মাস্টারের প্রস্থান)।

তোতা : দাঁড়াও গুনাই। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

গুনাই : আমার সঙ্গে তোমার কী কথা আছে?

পাগল : ও বুঝেছি। আমি কিন্তু বুইজে ফেলাইছি। তোমরা কী করবা ঠিক আছে আমি যাই। তারপর দেখা যাবে-হে (প্রস্থান)।

তোতার গান :

শুন শুন গুনাই গো সুন্দরী বলি যে তোমারে-
তোমার সনে ভালোবাসা হইবে কেমনে গো
ভালো হইবে কেমনে- আমি বলি যে তোমারে।

গুনাই এর গান :

কি কথা শুনাইলে তোতা আমি লজ্জায় মরি
এতো বড়ো হইছো সিয়ান না কইরাছ বিয়া গো ভালো
না কইরাছো বিয়া-আমি বলিযে তোমারে।
কেমন তোমার বাপ-মাও গো কেমন তোমার হিয়া
এমন বয়সের কালে না কইরাইছে বিয়া গো ভাল
আমি লজ্জায় মরি... ঐ

তোতার গান :

ভালো আমার বাপ-মাও গো ভালো আমার হিয়া
তোমার মতো সুন্দর পেলে-তারাই করাতো বিয়া গো
ভাল তারাই করাবে বিয়া...আমি বলি যে ... ঐ।

গুনাই এর গান :

লজ্জা নাইরে ওহের তোতা শরম নাই তোমার
গলেতে কলসি বেধে জলে ডুইবা মর গো ভাল
জলে ডুইবা মর...আমি বলিযে ... ঐ।

www.pathagar.com

তোতার গান :

কোথায় পাবো হীরার গো কলস- কোথায় পাবো দড়ি
তুমি হও গো প্রেম সাগর- আমি ডুইবা মরি গো ভাল
আমি ডুইবা মরি... আমি বলি যে... ঐ ।

গুনাই এর গান :

প্রেম সাগরে গহীন গো গঙ্গা নামলে উঠা দায়
প্রেম সাগরে ডুইবা মরলে কাঁদবো তোমার মায় গো ভাল
কাঁদবে তোমার মায়... আমি বলি যে... ঐ

তোতার গান :

নাই কো আমার বাপ-ভাই গো নাইকো আমার মায়
ও-তোমার প্রেমে ডুইবা মরলে তাতেও আমার ভালো গো
গুনু তাতেও আমার ভালো- আমি বলি যে... ঐ ।

গুনাই তোতা সত্যি আমাকে তোমার এতো ভাল লেগেছে?

তোতা হ্যাঁ গুনু, তোমাকে আমি প্রথম দেখাতে মন প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলেছি । এখন তুমি বলো গুনু তোমার ভালবাসা আমি পাবো কিনা?

গুনাই তোতা আজ আমি বাড়ি যাই । ও দিকে আবার আমার দাদা রাগ করতে পারে । অন্যদিন তোমার সঙ্গে সব কিছু বলবো ।

তোতা ঠিক আছে–আজ তুমি বাড়ি যাও । আগামী স্কুলে আসার পথে এক সঙ্গে গল্প করতে করতে আসবো । চলো ।

গুনাই তাই চলো । (উভয়ের প্রস্থান) ।

(মঞ্চে গানসহ নাচ)

দিও না রূপসী গো প্রেম-জ্বালা
তোমার গলে দিবো মিলন মালা
এসো কাছে এসো ছলনা করো না ।

(তোতার প্রবেশ–পথে)

তোতা : একি, কথা ছিল গুনু আসবে–এক সঙ্গে স্কুলে যাবো । কিন্তু গুনু, যে এখনও আসছে না ।

(গুনাই এর প্রবেশ–পথে)

গুনাই : এই যে তোতা আমি এসেছি । আমার দেরি হয়েছে বলে তুমি মন খারাপ করোনি তো?

তোতা না, না, গুনু তোমার উপর কী আমি মন খারাপ করতে পারি? চলো গুনু এখনো স্কুলে স্যার আসে নাই । আমরা স্কুলে বসে বসে গল্প করবো ।

গুনাই তাই চলো । (মঞ্চে) ।

www.pathagar.com

(পাগলের প্রবেশ)

তোতা : কিরে পাগল এতো সকাল সকাল স্কুলে আসলি যে।

পাগল : ও তাতে বুঝি তোদের অসুবিধা হলো। ঠিক আছে আমি চলেই যাই। তোদের কাজ তোরা চালা। স্যার এলেই আমি আসবো। (প্রস্থান)।

তোতা : দেখি গুনু তোমার কলম খানা আমাকে দাও। (দিবে) এখন আমার টা তুমি নাও। (উভয়ে খাতায় নাম লিখবে।)

(মাস্টারের প্রবেশ)

তোতা ও গুনাই : সালাম স্যার। (উঠে দাঁড়াবে)।

মাস্টার : আজ তোমরা পড়া শিখে এসেছো তো? কী কথা বলছো না যে?

(পাগলের প্রবেশ)

পাগল : রাখেন রাখেন স্যার। আসেই পড়া দিবেন না স্যার।

মাস্টার : কেনরে পাগল? তোর আবার কী হলো?

পাগল : হয় নাই স্যার হবে।

মাস্টার : কি হবে–বল, তাড়াতাড়ি।

পাগল : স্যার সময় হবার এখনো ১০ মিনিট বাকি। তাই সময়ের আগেই আমি একটা গান গামু।

গুনাই ও তোতা : (হাসবে) এই পাগল তুই গান জানস?

পাগল : স্যার আমি কিন্তু শুরু করলাম।

গান :

তোতা মিয়া গুনাই বিবি স্কুলেতে যায়
চশমারি আড়ে আড়ে ফিরে ফিরে চায়–
আবার ডাকে ইশারায়... ঐ
স্কুলেরি সময় নাইরে অসময়ে তারা যায়রে
বই পুস্তক নিয়ে তারা স্কুলেতে যায়–
চশমারি আড়ে আড়ে ফিরে ফিরে চায়-
আবার ডাকে ইশারায়... ঐ
ছাত্র মাস্টার কেহ নাইরে সেই সুযোগে দুই জন কইসে
প্রেমের আলাপ করছে তারা চোখে চোখে চায়
চশমারি আড়ে আড়ে ফিরে ফিরে চায়
আবার ডাকে ইশারায়... ঐ

মাস্টার : তোতা, গুনাই একি পাগলে যে গান করলো–এটা কি সত্য?

গুনাই : না, স্যার পাগলে মিথ্যা বলছে।

মাস্টার : মিথ্যাই যদি হয়, তোতার কলম তোমার হাতে কেনো? আর তোতার হাতে দেখি তোমার খাতা। দেখি–(খাতা নিবে) একি খাতার ভিতর শুধু

www.pathagar.com

গুনাই এর নাম। একি করছো তোমরা? তোতা মনে রেখো এটা পাঠশালা। এখানে লেখাপড়া হবে। এখানে প্রেম-পিরীতির জায়গা না। আজ তোমাকে সাবধান করে দিলাম। ভবিষ্যতে আর কোনো দিন এসব যেন না দেখি। আজ তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম।

তোতা স্যার, আমার কলমে কালি ছিল না—তাই গুনুর কলমটা আমি নিয়েছি।

মাস্টার তোতা, আর কথা বাড়াইও না। তাহলে কিন্তু তোমাদের গার্জিয়ানকে আমি বলে দিবো।

পাগল হ স্যার ঠেলার নাম বাবাজী। পাগড়ী ওয়ালা সেলাম পায়।

মাস্টার এই পাগল আবার কী বলতে চাস?

পাগল স্যার গরীব বেশি খেলে-রাক্ষস আর ধনী খেলে-খানেওয়ালা-তাই বুঝালাম আজ যদি আমি গুনুকে ভাল বাসার কইতাম তাহলে আপনে এতক্ষণ বেত মেরে আমার পিঠের ছাল তোলে নিতেন। যাই স্যার আমি আর এই স্কুলে আসবো না যে স্কুলে বিচার নাই সেই স্কুলে না থাকাই ভালো।

মাস্টার যা পাগল এখন সবার ছুটি। (প্রস্থান)।

গুনাই এর গান :

কি অপমান করলে গো তোতা স্কুলে আসিয়া
সঙ্গে থাকলে খালেক দাদা মাথায় দিত বাড়ি গো
ভাল মাথায় দিত বাড়ি... আমি বলি যে তোমারে...।

তোতার গান :

কার বা খাইছি টাকা গো বাড়ি কার বা বাপের ধারি
কার বা বাপের আছে শক্তি মাথায় দিবে বাড়ি গো
ভাল মাথায় দিবে বাড়ি...আমি বলি যে তোমারে।

গুনাই এর গান :

তোমার যদি আসা গো থাকে আমায় করতে বিয়া
ঘটক পাঠাইয়া দাও গো আমার দাদার ধারে গো
ভাল আমার দাদার ধারে... আমি বলিবে তোমারে... ঐ

তোতা ঠিক আছে গুনু আমি সুযোগ বুঝে তোমার দাদার নিকট ঘটক পাঠাইবো। এখন আসি গুনু। (প্রস্থান)।

গুনাই হায় খোদা। এখন আমি কী করবো। স্কুলের এইসব কেলেঙ্কারীর কথা হয়তো এতক্ষণে দাদার কানে পৌঁছে গেছে। আমি এখন দাদার সম্মুখে কেমন করে যাবো। না, না আমাকে যে কোনো একটা পথ বের করতেই হবে। দাদার কাছে আমিও ছলনার আশ্রয় নিবো। (প্রস্থান)।

(দুলু ও রহমানের প্রবেশ)

www.pathagar.com

দুলু বন্ধু দাদার মৃত্যুর সময় স্থাবর-অস্থাবর সব কিছু আমার হাতে ন্যস্ত করে গেছে। এখন সবকিছুর মালিক আমি, সেই আনন্দে এখন আমি দিশেহারা। তাই আমি স্থির করেছি যে এই মুহূর্তে শিকারে যাবো। তাতে আপনার মতামত কী বন্ধু?

রহমান : বন্ধু, শিকারে যাবেন সে তো আনন্দের কথা। চলুন আর বিলম্ব করে এখনি বেরিয়ে পড়ি।

দুলু ...তাই চলুন বন্ধু আমরা শিকারে যাত্রা করি। (প্রস্থান)।

(রফিকের পিছে গুনাইয়ের প্রবেশ)

রফিক : একি বোন গুনু আজ তোমার মুখখানা মলিন দেখছি কেন? কী হয়েছে তোমার? আমায় খুলে বলো।

গুনাইয়ের গান :

দাদা আর যাবো না ঐ স্কুলে পড়িতে
ঐ স্কুলে পড়তে গেলে দাদা গো
দাদা সম্মান রবে না দাদা আর যাবো না... ঐ
শাল গেরামের তোতা মিয়া দাদা গো
দাদা কলম নিলো কেড়ে... দাদা আর... ঐ
ঐ স্কুলের মাস্টার সাহেব দাদা গো
দাদা বিচার হলে না দাদা আর যাবো না... ঐ
পড়িতে যদি ইচ্ছে থাকে দাদা গো
দাদ মাস্টার আনো বাড়িতে
দাদা আর যাবো না ঐ স্কুলে... ঐ

রফিক ঠিক আছে বোন গুনাই, আজ থেকে তুমি আর ঐ স্কুলে যাবে না। আমি তোমার জন্য বাড়িতেই মাস্টারের ব্যবস্থ করবো। (উভয়ের প্রস্থান)।

(দুলু ও রহমানের প্রবেশ)

দুলু বন্ধু বহুপথ অতিক্রম করে এলাম কিন্তু কোথাও একটা শিকার পাওয়া গেল না। এখন যে পিপাসায় আমার বুক ফেটে যায়। যেখান থেকে পারেন আমাকে পান করান। বন্ধু আমাকে পানি পান করান।

রহমান : এই নিঘোর কাননে পানি কোথায় পাবো বন্ধু। আর একটু সম্মুখে এগিয়ে চলুন। ঐ তো দেখা যায় রফিক কাজীর বাড়ি। সেখানে গেলে পানি পান করাতে পারবো বন্ধু।

দুলু তা হলে সেইখানেই চলুন বন্ধু।

রহমান রফিক কাজী বাড়িতে আছেন।

(রফিকের প্রবেশ)

www.pathagar.com

রফিক কে?
রহমান আমি ডাক্তার রহমান। সঙ্গে আমার বন্ধু জমিদার দুলু মিয়া।
রফিক তা কী মনে করে এই গরীবের বাড়ি এসেছেন?
দুলু ভাই রফিক, এসেছিলাম শিকারে বহু বন জঙ্গল ঘুরে ক্লান্ত হয়েছি। পিপাসায় বুক ফেটে যায়। তাই পিপাসায় কাতর হয়ে ছুটে এলাম আপনার বাড়ি। এক গ্লাস জল দিয়ে ক্লান্তিটা দূর করে দেন ভাই।
রফিক : জমিদার সাহেব আপনি ভিতরে আসুন।

(দুলু ও রহমান মঞ্চে উঠবে)

রফিক : বোন গুনু, তুমি জমিদার সাহেবকে জল এনে দাও। (গুনাই এর প্রস্থান)।
দুলু ভাই রফিক ঐ মেয়েটি কে?
রফিক ঐটা আমার একমাত্র বোন গুনাই সুন্দরী।
দুলু ভাই রফিক আপনারা কয় ভাই কয় বোন?
রফিক জমিদার সাহেব, আমরা দুই ভাই এক বোন।
দুলু ভাই রফিক আজ জল পান করবো না। আর এক দিন এসে জল পান করবো। চলেন বন্ধু। (প্রস্থান)।
রফিক : জমিদার সাহেব, জল পান না করেই চলে গেল?

(খালেকের প্রবেশ)

খালেক : দাদা, জমিদার সাহেব পিপাসায় কাতর হয়ে জল পান করতে চাইল আবার জলপান না করেই চলে গেল—এর কারণ কী?
রফিক : আমিও তো তাই ভাবছি।
খালেক : দাদা–হয়তো তুমি ভালো ব্যবহার করোনি, তাই জল পান না করেই চলে গেল। এর পরিণাম যে কী হবে আমিও তাই ভাবছি দাদা। দেখবে একটা অঘটন ঘটিয়েই ছাড়বে। (প্রস্থান)।
রফিক ওরে খালেক তুই আমাকে ভুল বুঝলি।

(গুনাইয়ের জল নিয়ে প্রবেশ)

গুনাই : দাদা এই নিন জল।
রফিক : যে জল খাবে সে চলে গেছে বোন। চলো বোন আমরা অন্তর মহলে যাই। (প্রস্থান)।

(দুলুর প্রবেশ)

দুলু : আমি একি দেখিলাম দু'নয়নে। ঐ রফিক কাজির বোন গুনাই সুন্দরী রূপে যে আমি পাগল হয়ে গেছি। কিছুতেই আমার প্রাণে যে আর বধে মানছে না। তাই ঐ গুনাই সুন্দরীকে পেতে হলে আমার বন্ধু রহমান খাঁকে আমার দরকার। কোথায় হামিদ, হামিদ?

www.pathagar.com

(হামিদের প্রবেশ)

হামিদ : আদেশ করুন জাঁহাপনা ।

দুলু : হামিদ তুমি এই মুহূর্তে আমার বন্ধু রহমান খাঁকে ডেকে নিয়ে এসো ।

হামিদ : আমি তাই যাচ্ছি জাঁহাপনা । (প্রস্থান) ।

(রহমানের প্রবেশ)

রহমান বন্ধু আমায় কী জন্য স্মরণ করেছেন?

দুলু বন্ধু । রফিক কাজীর বোন গুনাই সুন্দরী রূপে আমি মুগ্ধ হয়েছি । ঐ গুনাই সুন্দরীকে না পেলে বৃথাই আমার জমিদারি, বৃথাই বেঁচে থাকা । যেমন করেই হউক ঐ গুনাই সুন্দরীকে আমি চাই—চাই ।

রহমান টাকা হলে কিনা হয় । আপনি দিবেন টাকা—আমি করবো কাজ ।

দুলু বলেন বন্ধু কত টাকা চাই আপনার দশ হাজার বিশ হাজার না, পঞ্চাশ হাজার । আপনি যত টাকা চাইবেন আমি তাই দিবো । তবু আমি ঐ গুনাই সুন্দরী কে আমি চাই বন্ধু ।

রহমান বন্ধু আজ আমাকে অন্তত বিশ হাজার টাকা দিন । আমি আজই চলে যাবো রফিক কাজীর বাড়ি ।

দুলু বন্ধু আপনি মাত্র ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন । আমি যাবো আর আসবো । (প্রস্থান) ।

রহমান যাক আজ একটা সুবর্ণ সুযোগ আমার হাতে এসে পড়লো । আমি ও ধীরে ধীরে তোমার প্রতিশোধ নেবো । টাকা হাঁ হাঁ হাঁ- টাকা দিবেন হুজুর আর আমি হবো হুজুরের মজুর । কোথায় কোথায় রে করিম–এক ছিলিম তামাক লয়ে আয় ।

(দুলুর, টাকা নিয়ে প্রবেশ)

দুলু : এই নিন, বন্ধু ২০ হাজার টাকা । তবু গুনাইকে আমার চাই ।

রহমান : বন্ধু আপনি কোনো চিন্তা করবেন না । আমি এই মুহূর্তে চলে যাবো রফিক কাজীর বাড়ি । ঐ গুনাই সুন্দরীকে নিয়া আপনার বিবাহের কথা পাকা করে ফিরে আসবো । (প্রস্থান) ।

দুলু : গুনাই । গুনাই সুন্দরী তোমার কথা ভাবতে ভাবতে আমি হয়ে গেছি ক্লান্ত । যেই দিন তোমাকে ঘরে এনে তোমার রূপ-যৌবন ভোগ করতে পারবো সেই দিন আমি হবো শান্ত । হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ... (প্রস্থান) ।

(হুক্কা হাতে পথিকের প্রবেশ)

পথিক : কই? এক ভদ্রলোক যে তামাক খেতে চাইল–তাকে আর দেখছি না । গেল কোথায় । এখন আমি কী করি । যাক ভদ্রলোক যখন নাই নিজের তামাক নিজেই খাই ।

www.pathagar.com

গান :

পরাণের হুক্কারে তোর নাম কে রাইখাছে ডাব (২ বার)
হুক্কার ভিতর গঙ্গার জল খুলির ভিতর পানি
রাখাল বন্ধুর কলকীরে লাগিয়ে হামুর হুমুর টানি।
পরাণের হুক্কারে... ।
কলকী গেল কলিকাতা নইচে রইল আসে-
হুক্কা গেল রেলগাড়ি দাবরাইতে তামাক খাবো কিসে
পরানের হুক্কারে ... । ঐ (প্রস্থান)।

(দাদু ঘটকের প্রবেশ)

দাদু ঘটক : সবাই আমাকে দাদু ঘটক বলে। আমার চৌদ্দ পিড়ি থেকে ঘটক গিরি করে আসছে। এমন কাজ নাই আমি পারি না। সেজন্য তো যুবক যুবতীরা আমার কাছে এসে ভীড় জমায়।

(তোতার গাইতে গাইতে প্রবেশ)

আমি আর বাঁচি না গুনাই ও সুন্দরী (২ বার)
গুনুর কথা মনে হলে আমার গো
আমার পরান যায় ফাটিয়া আমি আর
বাঁচিনা গুনাই ও সুন্দরী... ঐ

দাদু কে রে? তোতা? তোর মনে আবার কী হইছেরে? বল তুই আমারে খুইল্যা বল।

তোতার গান :

গুনাই আমার জানের জান দাদু গো
দাদু গুনার আমার জীবন আমি আর
বাঁচিনা গুনাই এর কারণে ... (২ বার)
গুনাইকে না পেলে আমি দাদু গো
দাদু গলে দিবো দড়ি- আমি আর
বাঁচিনা গুনাই এর কারণে... ঐ।

দাদু আরে দড়ি দিতে হবে না রে দড়ি দিতে হবে না। তোর এই বুড়ো দাদু যখন আছে তখন কোন চিন্তাই নাই। বল আমাকে কী করতে হবে?

তোতা দাদু ঐ রফিক কাজীর বোন গুনাই সুন্দরীকে আমি ভালবাসি। ওকে না পেলে আমার যে কোন শান্তি নাই। কিন্তু...

দাদু কিন্তু, কিরে? গুনাইকে তুই ভালবাসস- এখন গুনাইকে তুই পাবি।

তোতা কিন্তু।

দাদু আবার কিন্তু।

www.pathagar.com

তোতা না, মানে আমার যে কিছুই নাই। সব কিছুর মালিক- কাকা আমি যে সাহস করে কাকার কাছে বলতে পারছি না।

দাদু আরে নাতি, আগে গুনাইকে বিয়ে করে তুই ঘরে আন তারপর তোর কাকার কাছ থেকে তোর জমিদারী ভাগ করে নিবি। সুখে সংসার করবি।

তোতা দাদু তাহলে আপনি আমার ব্যবস্থা করে দিন।

দাদু ঠিক আছে- তুই বাড়ি যা। আমি আজই রফিক কাজীর বাড়ি গিয়ে তোর আর গুনাই বিবির বিয়ের কথা পাকাপাকি করে আসবো। চল বাড়ি চল।

তোতা আমি তাহলে আসি দাদু। (উভয়ের প্রস্থান)।

(খালেকের প্রবেশ পিছে রহমান)

রহমান : খালেক, ও খালেক বাড়িতে আছো?

খালেক : কে? ও খাঁ সাহেব। তা কী মনে করে এসেছেন?

রহমান : আমি এসেছি শুধু তোমাকে বড়োলোক বানাতে। এই নাও ১০ হাজার টাকা তোমাকে দিলাম, কাজ হলে আরো পাবে।

খালেক : আমাকে কী করতে হবে?

রহমান : তোমার বোন গুনাইকে জমিদার দুলু মিয়ার সঙ্গে বিবাহ দিবে। তুমি হবে জমিদারের আত্মীয়।

খালেক : খাঁ সাহেব কথা বলছেন ভাল কিন্তু দাদা এতে রাজি হয় কিনা।

(রফিকের প্রবেশ)

রফিক : কে? খাঁ সাহেব। তা কী মনে করে এসেছেন আপনি?

রহমান : আমি এসেছি আপনার বোন গুনাই সুন্দরীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে।

রফিক : কোথায়? কার সঙ্গে?

রহমান : আমার বন্ধু সাল গ্রামের জমিদার দুলু মিয়ার সঙ্গে। তাতে আপনার মতামত কী?

রফিক ডাক্তার রহমান খাঁ। আমি তো শুনেছি দুলু মিয়ার নাকি স্ত্রী আছে।

রহমান তাতে কী হয়েছে। আমার বন্ধু দুলু মিয়ার একটা কেন এ রকম ১০টা স্ত্রী রাখার যোগ্যতা রাখে।

রফিক জমিদারি আছে বলে সে মনের খায়েসে যা ইচ্ছা তাই করবে- না, না, এ আমি পছন্দ করি না।

রহমান আপনার বোনকে আমার বন্ধু পছন্দ করে ফেলেছে আর অমত না করে বিবাহের দিন তারিখটা দিয়া দিন।

রফিক খাঁ সাহেব। জমিদার দুলু মিয়া মনে করেছে এ পুতুল খেলা। খেললে খেলুক না হয় ভেঙ্গে চুরমার ফেলে দিলাম। না, না তা হবে না। আমি বেঁচে থাকতে আমার বোন গুনাই সুন্দরীকে ঐ লম্পট দুলু মিয়ার সঙ্গে বিবাহ দিব না।

www.pathagar.com

খালেক : দাদা- তুমি?

রফিক : খালেক তুই চুপ কর। আমার কথার উপর তুই-কোনো কথা বলবি না।

রহমান : জমিদার সাহেবকে আপনে লম্পট বলতে পারলেন?

রফিক : লোভী জমিদারকে লম্পট বলবো নাতো কী বলবো? আপনি যান এখান থেকে- আর কোন দিন ভুলেও ঐ জমিদারের নাম নিয়ে আমার এখানে আসবেন না।

রহমান কাজটা বেশি ভাল করলেন না কাজী সাহেব। মনে রাখবেন জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে লড়াই করা মোটেই ঠিক হবে না। (প্রস্থান)।

খালেক দাদা একি করলে তুমি? এমন একটা বড়ো সুযোগ তুমি হাত ছাড়া করলে? তাও আবার অপমান করে। এর ফল কী হবে জান।

রফিক : জানি বলেই তো তাড়িয়ে দিলাম। কারণ দুলু মিয়া একটা লম্পট। আমি বেঁচে থাকতে ঐ লম্পটের কাছে আমার একমাত্র বোনকে বিবাহ দিতে পারি না।

(গাইতে গাইতে দাদু ঘটকের প্রবেশ) :

এক কুলের সেকুল হারাইলাম
হারাইলাম দুই কুল
কোন দিন ফুটিব হরি গুনুর বিয়ের ফুল (২ বার)
আসিবো নাইওরী সব যাবে গন্ডা গড়ি
ঘুমেতে পড়িয়া রবে আওলে মাথার চুল।
এ কুলের... ঐ।

দাদু রফিক কাজী বাড়ি আছো?

রফিক কে? ও দাদু ভিতরে আসেন তা কী মনে করে এসেছেন?

দাদু আমি এসেছি তোমার বোন গুনাই বিবির বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে।

রফিক কোথায়? কার সঙ্গে?

দাদু শাল গ্রামের মরহুম লাল মিয়া জমিদারে একমাত্র ছেলে তোতা মিয়ার সঙ্গে। তাতে তোমাদের মতামত কী?

রফিক দাদু তোতা মিয়া যদি আমার বোন গুনাইকে বিবাহ করতে রাজী হয় তাহলে আমার কোন আপত্তি নাই।

খালেক : না দাদা না। আমি তোতার সঙ্গে বিবাহ দিবো না। কারণ এই তোতা গুনুর কল কেড়ে নিয়েছিল। আমি গুনুর বিয়ে দিলে দুলুর সঙ্গেই দিবো।

দাদু ভাই রফিক- বড়োদের মাঝে ছোটদের কথা বলা আমি পছন্দ করি না। তুমি ঐ নেড়া গেন্দা ছেড়াকে এখান থেকে বিদায় করে দাও।

খালেক কি বললিরে বুড়া- আমি নেড়া গেন্দা? ঠিক আছে আমিও দেখে নিব। (প্রস্থান)।

www.pathagar.com

রফিক : আপনি খালেকের কথা কিছু মনে নিবেন না।
দাদু : আরে না। ওর কথায় কী আসে যায়। তবে বিবাহের দিন তারিখটা দিয়া দাও।
রফিক দাদু। আগামী আষাঢ়ের ১৯ তারিখ হইল রবিবারে বরযাত্রিসহ উপস্থিত হবেন। সেইদিন তোতা মিয়ার সঙ্গে গুনুর বিবাহ সমাধা করে দিবো।
দাদু তাহলে, আমি এখন আসি ভাই। (প্রস্থান)।
রফিক যাক এখন গুনুর বিবাহটা তোতার সঙ্গে হয়ে গেলেই চিন্তা মুক্ত হতে পারি।

(গুনাইয়ের প্রবেশ)

গুনাই : দাদা। তুমি কি এমন চিন্তা করছো?
রফিক : আমি ভাবছি তোকে নিয়ে। তুই কি আমার কথা রাখবি বোন?
গুনাই : কেন দাদা? আম কি কোনো দিন তোমার অবাধ্য হয়েছি?
রফিক : হ্যাঁ রে বোন। আমি তোকে না জানিয়ে জমিদার তোতা মিয়ার সঙ্গে তোকে বিবাহ দিবো বলে কথা দিয়েছি। বল বোন বল তুই আমার কথা রাখবি?
গুনাই দাদা আমি তোমার কথার কোন অমর্যাদা করবো না। তোমার ভালই আমার ভালা।
রফিক তোর কথা শুনে খুশি হলাম। চল বোন আমরা অন্তপুরে যাই। (ধরে)। (প্রস্থান)।

(দুলুর প্রবেশ)

দুলু : আমার বন্ধু রহমান খাঁকে পাঠিয়েছি গুনাই সুন্দরী বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। সে হয়তো বিবাহের দিন তারিখ ধার্য করেই ফিরে আসবে।

(রহমান খাঁর প্রবেশ)

রহমান : বন্ধু আমি এসেছি কিন্তু রফিক কাজী এ বিয়েতে রাজি হয়নি। আপনাকে অসভ্য ভাষায় গালি দিয়েছে। আমাকে অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। সে বেঁচে থাকতে তার বোনকে আপনার কাছে বিবাহ দিবে না।
দুলু বের করে দিয়েছে। তার বোনকে আমার কাছে বিয়ে দিবে না। রফিক কাজী আমি ও দেখে নিবো তোমার বাহাদুরী বন্ধু উপায় বের করুন।
রহমান ধীরে বন্ধু ধীরে কাটা দিয়েই কাটা তুলতে হবে। সে ব্যবস্থা আমি করেই এসেছি। এই তো খালেক এখনি এসে পড়বে।

(খালেকের প্রবেশ)

রহমান : এসো খালেক এসো বলো সংবাদ কী?
খালেক : খাঁ সাহেব আমি দাদাকে রাজি করাতে পারিনি। এই নিন আপনার টাকা।
রহমান : আরে রাখো রাখো টাকা ফেরৎ দিতে হবে না। তোমাকে আরো টাকা দিবো তোমার দাদাকে তুমি দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিবে।

www.pathagar.com

খালেক : না, না এ আমি পারবো না। আমার দাদাকে আমি...

দুলু : তোমাকে পারতেই হবে। তা না হলে যে তোমার বোন গুনাইকে আমি পাবো না খালেক? আমি তোমাকে অর্ধেক জমিদারি লিখে দিবো তবু তোমার দাদাকে তোমার হত্যা করতেই হবে।

খালেক : না, না আমি পারবো না। আমি যাই। (প্রস্থান)।

গোণ্ডা : বলেন জমিদার সাহেব আমাদের কী করতে হবে?

দুলু : খালেককে হত্যা করে বস্তায় ভরে নদীতে ফেলে দিয়ে আসবে তারপর হত্যা করবো রফিক কাজীকে তাহলেই গুনু হবে আমার যাও।

গোন্ডা এই ধর (বাধবে)।

রহমান ধীরে বন্ধু ধীরে রাখো তোমরা। খালেক এদিকে এসো। (একাকি) শোন, খালেক তুমি রাজি হয়ে যাও তা না হলে তুমি ও মরবে, তোমার দাদাও মরবে। তার চেয়ে তুমি বেঁচে থাকো।

খালেক : আমি রাজি।

রহমান : এই তো কথার মতো কথা (পকেট থেকে বের করে) এই নাও খালেক। এই কাগজে আছে বিষ। তোমার দাদা যখন শরবত খাবে, তুমি তখন সুযোগ বুঝে বিষটুকু মিশিয়ে দিবে। তাতেই কেল্লা ফতে। তোমার ও দোষ হবে না ধর নাও। (নিবে)।

খালেক : আমি এখন আসি। (প্রস্থান)।

দুল : হা, হা, হা,। আপনার বুদ্ধি তারিফ করতে হয়। এ জন্যই তো আমি আপনাকে আপনজন মনে করি। চলেন বন্ধু, এখন আমরা বিশ্রাম করি গে।

রহমান তাই চলেন বন্ধু। (প্রস্থান)।

(রফিক কাজীর প্রবেশ)

রফিক : কোথায় বোন গুনু? আমার জন্য এক গ্লাস সরবত নিয়ে এসো। ও হো নামাজের তো সময় হয়েছে। আপাতত নামাজটা পড়ে নেই। (নামাজ পড়বে)।

(গুনুর গ্লাস হাতে প্রবেশ)

গুনু : দাদা তো নামাজে। যাক শরবতটুকু আমি এখানে রেখে যাই। নামাজ শেষে খেয়ে নিবে। (প্রস্থান)।

(খালেকের প্রবেশ)

খালেক : যাক এই সুযোগে আমার কাজটা সেরে নেই। (বিষ দিবে) এখন যাই। (প্রস্থান)।

রফিক পাগলী বোন। শরবত এখানে রেখে গেছে। আমি খেয়ে নেই (খাবে)। ওহ এ আমি কী প্রাণ করলাম এযে বিষ। ওরে তোরা কোথায়? খালেক, গুনু তোরা আমার কাছে আয়। ওহ।

www.pathagar.com

রফিকের গান :

আমার অন্তর জ্বলিল গো দারুণ বিষে গো
কি শরবত খাওয়াইলি গুনু তুমি গো
গুনু বিষ খাওয়ালে মোরে... আমার অন্তর... ঐ ।

(খালেক ও গুনুর প্রবেশ)

খালেক : দাদা, দাদা, কী হয়েছে তোমার? অমন করছো কেন?

রফিকের গান :

শিশুকালে পিতা মরলো খালেক রে- খালেক
মানুষ করলাম তোরে । আমার অন্ত... ঐ ।

খালেক দাদা, আমি তোমাকে বিষ খাইয়েছি । তুমি আমায় ক্ষমা কর দাদা ।

রফিকের গান :

ভাই হইয়া গরু হলি খালেক রে- খালেক
বিষ খাওয়াইলি মোরে । আমার অন্তর... ঐ ।

রফিক ওহ্ খালেক । আমি যে আর স্থির থাকতে পারছিনা । বোন গুনু তোরা আমায় ক্ষমা করে দিস ।

গুনাই দাদা । দাদা ।

রফিক ওরে আমার সময় শেষ । আমি চলে যাচ্ছি । যাবার সময় একটা কথা বলে যাই । বলো ভাই তুমি আমার কথা রাখবে কিনা ।

খালেক : বলো দাদা । কী কথা? আমি তোমার সব কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো ।

রফিক খালেক, গুনাইকে ঐ তোতার সঙ্গেই বিয়া দিয়া দিস । আহ্! (মৃত্যু) ।

গুনাই ও তোতা! দাদা, দাদা, ওহ্ দাদা, তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে?

খালেকের গান :

আমি কাঁদিবো কী সুরে গো ভাই ভাই বলিয়ে
রহমান খাঁর ছলনায় পড়ে আমি গো–আমি
বিষ খাওয়াইলাম দাদারে- আমি কাঁদিবো... ঐ ।

গুনাইয়ের গান :

ও দাদা মইরাছে মইরাছে গুনুর কপাল ভেঙেছে
কারে ডাকবো দাদা বইলে গুনুর ভবে কে আছে । ঐ
আরে ও দাদা খালেকরে, খালেকরে কাজটা করলি কি
আপন হাতে বিষ খাওয়ায়ে মারলি প্রাণের ভাই । ঐ

www.pathagar.com

ও দাদা খালেকরে খালেকরে তোর তো মায়া নাই
রহমান ছলনায় পড়ে মারলি আপন ভাই। ঐ
ও দাদা, খালেকরে খালেকরে বিষ দাও মোর হাতে
সেই বিষ খাইয়ে মরে যাবো আমি ঐ দাদার সাথে। ঐ

খালেক দাদা, দাদা তুমি আমায় ক্ষমা করে দিও। আমি জমিদারের পাল্লায় পড়ে তোমাকে হত্যা করলাম। এসো বোন গুনু যা হবার তো হয়ে গেছে। শত কাঁদলেও আর দাদাকে পাওয়া যাবে না। চলো দাদার সৎকারের ব্যবস্থা করি। (উভয়ের প্রস্থান)।

(দাদুর প্রবেশ পিছে তোতা)

তোতা : দাদু। দাদু।

দাদু : কেডারে? তোতা আয় ভিতরে আয়।

তোতা : দাদু এখন আমার কী হবে? শুনলাম রফিক কাজী মারা গেছে। খালেক কী এ বিয়েতে রাজি হবে?

দাদু আমি ও তাই ভাবছি।

(খালেকের প্রবেশ)

খালেক : আর ভাবতে হবে না। সেজন্য আমি নিজেই এসেছি তোমাদের সংবাদ দিতে। দাদু আমি দাদার কথামত গুনাইকে তোতার সঙ্গেই বিবাহ দিবো। আপনারা তারিখ মতো চলে আসবেন।

দাদু : মাশআল্লাহ। মাশআল্লাহ। আমরা ঠিক সময় মতো তোমার বাড়ি যাবো।

খালেক : আমি তা হলে আসি দাদু। (প্রস্থান)।

দাদু : চলো তোতা এখন বিবাহের প্রস্তুতি নিতে হবে। একটা মালী ডেকে বাড়িটা পরিষ্কার করে নে। আমি আসি। (প্রস্থান)।

তোতা কোথায় হামিদ।

(হামিদের প্রবেশ)

হামিদ : আমায় ডেকেছেন ছোট সাহেব?

তোতা : যাও হামিদ, তুমি এই মুহূর্তে একজন মালী পাঠিয়ে দাও।

হামিদ : আমি তাই যাচ্ছি। (প্রস্থান)।

(মালীর প্রবেশ)

মালী : আমায় কী জন্যে ডেকেছেন ছোট সাহেব?

তোতা : আগামীকাল আমার বিবাহ। তাই তুমি আমার বাড়িটা ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করে রাখবা।

মালী ঠিক আছে। আপনি যান। আমি মাইলানীরে ডেকে কাজ আরম্ভ করি।

www.pathagar.com

তোতা ঠিক আছে আমি তা হলে আসি। (প্রস্থান)।

মালী আরে ও মাইলেনী মাইলেনী।

গান :

আমার মাইলেনী এতি একটু আসো গো (২ বার)
এতি একটু আসো গো... আমার মাইলেনী... ঐ।

মাইলেনীর গান গেয়ে প্রবেশ :

ও উঠ নাথ পড়ে কেনে ডেকেছো আমায় (২ বার)
ডাক শুনিয়া প্রাণ কাঁপে গৃহে থাকা দায়...। ঐ

মালীর গান :

দে দে দে মাইলেনী ঝাড়ু দিয়া দে (২ বার)
রাজ বাড়িতে কাজ পেয়েছি- দে দে দে মাইলেনী... ঐ

মাইলেনীর গান :

আমি পারবো নাহে (২ বার)
রাজ বাড়িটা ঝাড়ু দিতে- আমি পারবো নাহে।

মালী : আরে ও মাইলেনী—পারবি না কেনে—তাই ক।

মাইলেনী : আরে ও মালী তোমার কী মনে নাই। গত বৎসর আমাকে নাকের নাকের নথ কানের দুল, মাথার টিকলী বানাইয়া দিতে চাইছিলা। একটাও দাও নাই।

মালী শালার মাগী, বলে কী হে গত বৎসর আকালের কথা কী তোর মনে নাই? অভাবের তাড়নায় আমাকে বীজ থেকে নাই—সেখানে নারিকেল ঢোকাতে চাস্ হে। নে এবার ঝাড়ুটা দিয়া দে। টাকা পেলে তোর সব গহনা বানাইয়া দিমু।

মাইলেনীর গান :

হাতে না পেলে বিশ্বাস হয় না (২ বার)
হতে লিমু ঝাড়ু দিয়া দিমু
হাতে না পেলে বিশ্বাস হয় না।

মালীর গান :

দেদে দে মাইলেনী ঝাড়ু দিয়া দে (২ বার)
ঝাড়ু নাই দিবি বাপের বাড়ি যাবি
দে দে দে... ঐ

মাইলেনী : আরে ও মালী–ঝাড়ু আমি দিমু তবে না আমাকে রসগোল্লা খাওয়াতে হবে।

মালীর গান :

আমার মাইলেনী রসগোল্লা খাবে গো (২ বার)

www.pathagar.com

রসোগোল্লা খাবে গো—
ছাগলেরি নাদার মতো রসোগোল্লা খাবে গো। ঐ

মাইলেনী : এই তো আমি ঝাড়ু দিয়া দিলাম। চলো এখন ছোট সাহেবের নিকট মজুরী নিয়া আসি।

মালী তাই চল মাইলেনী (উভয়ের প্রস্থান)।

(খালেক ও গুনুর প্রবেশ)

খালেক : ওরে বোন গুনু তুমি এখনি তৈয়ার হয়ে নাও। বরযাত্রী এসে পড়বে।

(তোতা ও দাদুর প্রবেশ)

খালেক : আসুন আসুন দাদু বসুন।

দাদু : শুভ কাজে দেরি করতে নেই। তাড়াতাড়ি মোল্লা ডেকে বিয়ের কাজ সেরে ফেলো।

খালেক : আরে ও মোল্লা সাহেব মোল্লা সাহেব।

গাইতে গাইতে মোল্লার প্রবেশ :

রাজবাড়িতে বিয়ের খবর যাইগো তাড়াতাড়ি
মোল্লাগিরি করে নাই আমার চৌদ্দগিরি
ভাঙা ঘরে শুয়ে থাকি খাইগো মেঘের পানি
ভাত বেনারে গোষ্ঠী মারি যাই না কারো বাড়ি।
মোল্লাগিরি করতে করতে পাকাই দিলাম চুল দাড়ি। ঐ
উঁচু উঁচু নারিকেলের গাছ দেখতে সারি সারি-
ঐ যেন দেহা যায় রফিক কাজির বাড়ি। ঐ

নর্তকীদের নাচ গান :

গুনাই বিবির বিয়া গো
চলুন বাতি দিয়া গো
আমরা নাচিয়া নাচিয়া বিয়ের বরণ করি

মোল্লা (দৌড়া দৌড়ি) এই বাদ্য বন্ধ কর বন্ধ কর। (মঞ্চে) বাপরে বাপ কী শয়তানের শয়তান রে বাবা। আমি হলাম সারা শরিয়তের কাজী। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আমি এক বারেই পড়ি।

দাদু আরে ও মোল্লা সাহেব তাড়াতাড়ি বিয়ে পড়ান।

মোল্লা ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনারা সবাই বসুন। (বসবে) এই যে তোতা মিয়া তুমি এখানে মুখোমুখি বসো। শাল গ্রামের মরহুম লাল মিয়ার একমাত্র ছেলে তোতা মিয়ার সঙ্গে এক লক্ষ টাকা মহরানা ধার্য করিয়া নবগ্রাম নিবাসী মরহুম রফিক কাজী বোন গুনাই সুন্দরীর বিবাহ দিলাম পড়াইয়া। সবাই বলুন আমিন। এখন আমার বখশিশ টা দিয়া দেন।

www.pathagar.com

খালেক এই নাও দাদু-তুমি দিয়া দাও। (দিবে)।

মোল্লা আমি এখন আসি। (প্রস্থান)।

দাদু খালেক, আমাদের বিদায় কর।

খালেক (গুনাই কে ধরে) ভাই তোতা। আজ হতে আমার বোন গুনুকে তোমার হাতে সমার্পন করিলাম। তুমি ওকে সুখে রেখো ভাই। (তোতা ও গুনু খালেক কে সালাম) যা বোন যাবার বেলায় কাদতে নেই। মেয়েদের স্বামীর বাড়ি যে নিজের বাড়ি।

তোতা : আসি ভাই। চলো দাদু। (প্রস্থান)।

খালেক : দাদা আমি আজ তোমার কথা রক্ষা করতে পেরেছি। গুনুকে তোতা মিয়ার সঙ্গেই বিবাহ দিয়েছি। ভাই জান। তুমি আমায় ক্ষমা করে দিও। আমি তোমাকে যে হাতে বিষ দিয়া হত্যা করেছি সেই হাতেই আমার জীবন শেষ করে দিবো। যে খানে তুমি নেই সেখানে আমার বেচে থাকা কোনো অধিকার নেই। তুমি আমায় ক্ষমা করে দিও। দাদা আমি আসছি (চাকু মেরে) ওহ খোদা তুমি আমায় ...ক্ষমা (মৃত্যু)

(গুনাই ও তোতার প্রবেশ)

তোতার গান :

হায়গো বিদায় কর প্রা প্রিয়োসী বিদায় কর মোরে
শিকারে যাবো আমি মনেরই আনন্দে গো হায় হায় গো
কোথায় আমার তীর ধনু এনে দাও মোর হাতে
এখনি চলিয়া যাবো কোর কাব জঙ্গলে গোহায় হায়গোঐ
হরিণ মারবো মৃগ মারবো মারতো টিয়া পাখি
জীবিত ধরিয়া আনবো বনের তোতা পাখি গোহায় ... ঐ

গুনাই সবে মাত্র আপনার আমার বিয়ে হলো দু এক মাস বিশ্রাম করতেন। নিজের সংসার গোছিয়ে নিবেন। তারপর মনের আনন্দে শিকারে যাবেন।

তোতা গুনু। আমার যে কোন সংসার নেই। সব কিছু পিতার মৃত্যুর সময় কাকার হাতে ন্যস্ত করে গেছে।

দাদু গেছে বলেই তো এখন তোর জমিদারির ভাগ তোর কাকার কাছ থেকে ফিরিয়ে নিতে হবে। এখন তোর সংসার হয়েছে।

তোতা : দাদু কাকা কি আমাকে ভাগ ফিরিয়ে দিবে।

দাদু : আরে বোকা। তোকে সাহস করতে হবে। তোর কাকাকে গিয়ে বলবি আমার ভাগ আমি চাই। দেখছি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবি। আমি যাই। তোরা ভাল থাকিস। (প্রস্থান)।

তোতা শুন, প্রিয়সী। আমি এই মুহূর্তে চলে যাবো কাকার কাছে। তুমি মর্জিনাকে সঙ্গে নিয়ে পুকুর থেকে জল এনে রান্না কর। আমি আসি। (প্রস্থান)।

www.pathagar.com

গুনাই মর্জিনা। মর্জিনা।

(মর্জিনার প্রবেশ)

মর্জিনা : আমায় ডেকেছেন বেগম সাহেব?

গুনাই এর গান :

ও দাসী জল আনিতে চলো যাই
দাসী জল আনিতে যাই
জল আনিয়া রান্না করে পতিরে খাওয়াই ।ঐ
ও পতি খাইবে খাইবে পতি শিকারে যাবে-
শিকার করে প্রাণের পতি আনবে যে ঘরে। ঐ
(উভয়ের প্রস্থান)।

(দুলুর প্রবেশ)

দুলু : না, না, আমি আর সহ্য করতে পারছিনা। যে গুনাই সুন্দরী প্রেমানলে দিনরাত আমি জ্বলে পুড়ে মরছি সেই গুনাই সুন্দরী কে আমার ভ্রাতিষপুত্র তোতা মিয়া বিয়া করে ঘরে এনেছে। আমার মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে সে খাবে। এ আমি কিছুতেই হতে দিবো না। যেমন করেই হোক ঐ গুনাই সুন্দরীকে আমার পেতেই হবে।

(তোতার প্রবেশ)

তোতা : কাকা, কাকা, আপনি ভালো আছেন?

দুলু : আমার ভালো মন্দ তোর কিবা যায় আসে। শুনলাম তুই নাকি বিয়ে করেছিস?

তোতা : বিয়ে করেছি বলেই তো চলে এলাম আপনার কাছে।

দুলু তা আমার কাছে কী মনে করে আসলি?

তোতা কাকা এখন আমার সংসার হয়েছে। তাই আমার জমিদারি ভাগটা আমায় দিয়া দিন।

দুলু হা হা হা জমিদারি। এটা কী গাছের পাতা -ছিড়ে তোর হাতে দিবো। কাল করলি বিয়ে আর আজই চাস জমিদারি। তোর কী সে বয়স হয়েছে? জমিদারি চালাতে পারবি?

তোতা পারি না পারি সেটা আমার ব্যপার আমার ভাগ আমাকে দিয়া দিবেন।

দুলু যদি না দেই।

তোতা ছিনিয়ে নিতে বাধ্য হবো।

দুলু তুই পারবি আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে?

তোতা (পিস্তল বের করে) পারবো মানে—এই মুহূর্তে আমার জমিদারির কাগজ আমাকে দিয়া দিন। তা না হলে এই পিস্তলের গুলিতে আপনার মাথাটা উড়িয়ে দিবো।

www.pathagar.com

দুলু রাখো ভাতিজা রাখো। আমি তোর জমিদারি তোকে দিয়া দিচ্ছি (কাগজ পত্র দিবে) এই নে তোর ৯ লক্ষ টাকা। তবে মনে রাখবি কাজটা বেশি ভাল করলি না।

তোতা এখন আমি আসি কাকা। (প্রস্থান)

দুলু তোতা তুই মনে করেছিস জমিদারি পেয়েছি। সুন্দরী নারী ঘরে এনেছি। সুখে সংসার করবে। না, না আমি তা হতে দিবো না। আমি শাল গ্রামের জমিদার দুলু মিয়া হা হা হা। আমি তোর সুখের সংসার ভেঙে চুরমার করে দিবো।

(রহমান খার প্রবেশ)

রহমান : ধীরে বন্ধু ধীরে।

দুলু : বন্ধু আপনি এসেছেন? এই মাত্র তোতা আমার কাছ থেকে পিস্তল ঠেকিয়ে ওর জমিদারির ভাগ নিয়ে গেল। এখন বলুন বন্ধু আমি কী করতে পারি?

রহমান বন্ধু গুনাই বিবিকে আপনার ভ্রাতুষপুত্র তোতা মিয়া বিয়া করেছে। জমিদারি ভাগ করে নিয়েছে। সবই তো শেষ। তবে এখনো কি ঐ গুনাই বিবিকে আপনার দেখতে মন চায়?

দুলু বন্ধু। গুনাই বিবির প্রেমাললে আমি জ্বলে পুড়ে মরছি। ওকে এক নজর দেখার জন্য আমি পাগল।

রহমান ধীরে বন্ধু ধীরে। বন্ধু আমি এই মাত্র দেখে এলাম গুনাই বিবি ঐ পুকুর পাড়ে গোসল করতে যায়। আপনি সেখানে গেলে মন ভরে গুনাই বিবিকে দেখতে পাবেন।

দুলু তাহলে আর দেরি নয় বন্ধু চলুন এখনি যাবো আমি ঐ পুকুর পাড়ে- গুনাই সুন্দরী কে দেখে আমার মনকে কিছুটা হলেও শান্তনা দিবো।

রহমান : তা হলে চলুন বন্ধু। (উভয়ের প্রস্থান)

(গুনাই এর প্রবেশ)

গুনাই : স্বামী গেছে জমিদারি ভাগ করে নিতে কিন্তু এখনো যে ফিরে আসছে না।

(তোতার প্রবেশ)

তোতা : এই যে প্রিয়োসী। নাও জমিদারির কাগজপত্র। আমি কাকার কাছ থেকে ভাগ করে এনেছি। আজ থেকে এই সবের মালিক তুমি।

গুনাই স্বামী। আপনি ক্লান্ত। বিশ্রাম করুন আমি পুকুর থেকে স্নান করে এসে আপনারে খেতে দিবো।

তোতা তাই চলো। (উভয়ের প্রস্থান)।

(গুনাই হাসতে হাসতে দাসীসহ প্রবেশ)

www.pathagar.com

গান :

ও দাসী চলো যাই চলো যাই পুকুরের পাড়ে
পুকুর পাড়ে করবো গোসল বইসে নিরলে (২ বার)
ওদাসী নামই লো নামই লো দাসী ঐ না জলেতে

(দুলু ও রহমান প্রবেশ)

রহমান : ঐ ঐ তো বন্ধু আপনার গুনাই বিবি। আপনি প্রাণ ভরে দেখুন

দুলু : বন্ধু ওহ এখন যে আমার প্রাণে আর বাধ মানছে না। না বন্ধু না (ধরতে যেতে চাবে)

রহমান (ধরতে) ধীরে বন্ধু ধীরে। আপনি থামুন। এতো তাড়াহুড়া করলে চলবে না। সবে মাত্র শুরু (দুলু ঢিল ছুড়বে) আহ বন্ধু করলেন কী? চলেন এখন তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি। (প্রস্থান)

গুনাই : দাসী, দাসী লো, কে যেন ঢিল ছুঁড়ে মারলো।

দাসী : ঐ ঐ আপনার চাচা শ্বশুড় আর রহমান খা বকুল গাছের আড়ালে থেকে চলে গেল।

(গুনাই এর গাইতে গাইতে প্রস্থান)

ও দাসী চলো যাই চলো যাই গৃহে ফিরে যাই
ঢিল ছোঁড়ার ঘটনা আমরা স্বামীকে জানাই
ও স্বামীকে জানাই বো জানাই বো বকুল গাছটি কাটাইবো
গাছ থাকিতে এই পুকুরে গোসল না করিবো। ঐ (প্রস্থান)।

(তোতার প্রবেশ)

তোতা : গুনুযে গোসল করতে গেল কিন্তু মন ভার করে ফিরে আসছে কেনো? (প্রবেশ পথে)। কী প্রিয়োসী। তোমার মনটা ভার কেন? আর গোসল না করে ফিরে এলে কেন? (মঞ্চে)।

গুনাই এর গান :

চান করিতে পারি নাই গো স্বামী (২ বার)।

তোতা কেনো পারনি?

গান :

আপনার চাচা দুলু হারে মিয়া ও হারে
প্রান নাথ সঙ্গে রহমান খা রে ও জাতি গেল রে
তোতা : বলো প্রিয়োসী কী হয়েছে তোমার?

গান :

আউলা কেশে পাগলিনী বেশে ও যারে

www.pathagar.com

প্রান নাথ দেখে গেল মোরে রে
ও জাতি গেল রে...

তোতা দেখে গেছে তাতে কী হয়েছে?
গুনাই স্বামী শুধু দেখেই যায়নি।
তোতা আর কী করেছে তোমায়?

গুনুর গান :

পুকুর পাড়ে বকুল গাছের আড়ে ও হারে
প্রান নাথ পাতা ছুড়ে মারে রে...ওজাতি গেলরে
গাছটি যদি না কাটো গো স্বামী ও হারে
প্রাণনাথ গলে দিবো দড়ি রে ও জাতি গেলরে। ঐ

তোতার গান :

বিশ্বাস হয় না হয়না গো বিশ্বাস (২ বার) ও হারে
প্রাণ প্রিয়ে সাক্ষী তোমার কেবারে-ওহারে
বিশ্বাস হয় নারে ... ঐ।

গুনুর গান :

স্বাক্ষী আছে মর্জিনা গো দাসী (২ বার) ও হারে
প্রাণনাথ জিজ্ঞাস করেন তারে রে–ও জাতি গেলরে।

তোতা : কোথায় মর্জিনা?

(মর্জিনা প্রবেশ)

মর্জিনা : আমায় ডেকেছেন ছোট সাহেব?
তোতা : সত্যি করে বল মর্জিনা গুনাই যা বলেছে তা কি সত্য?
মর্জিনা : হা, ছোট সাহেব সব সত্য। আমরা তাড়াতাড়ি না এলে হয়তো ইজ্জত যেত।
গুনাই স্বামী আপনি ঐ বকুল গাছটি কেটে ফেলুন।
তোতা ঠিক আছে গুনু- আমি আজই পুকুর পাড়ের ঐ বকুল গাছটি কাটার ব্যবস্থা করবো। তুমি এখন ঘরে যাও।
গুনাই চল দাসী আমরা ঘরে যাই। (সকলের প্রস্থান)।

(মানিকের মার পিছে তোতার প্রবেশ)

তোতা : মানিক। আরে ও মানিক বাড়ি আছো?
মা : কেডা বাবা? মানিক কে ডাকছো?
তোতা : আমি তোতা মিয়া তা তোমার মানিক কোথায় গেছে?
মা : বাবা তুমি বসো আমি মানিক কে ডাইকে দেই। ও বাবা মানিক, মানিক রে না ওকে নিয়ে আর পারি না। বাবা মানিক, ও মানিক।

www.pathagar.com

(মানিকের প্রবেশ পথে)

মানিক : আইতাছি মা আইতাছি। তা কি হয়েছে মা এতো ডাহা ডাহি।

মা : ঐ যে তোতা বাবা আইছে। কি কইতে চায় সুনই।

তোতা মানিক তুমি আমার পুকুর পাড়ের বকুল গাছটি কেটে দিতে পারবা?

মানিক পারবো না মানে—লাই, কুমুর, ঝিংগে, কুদু, তরমুছ সব গাছ আমি কেটে সাফা করে দিতে পারি। আর সাধারন একটা বকুল গাছ-এতো ব্যাপারই না। তবে আমারে টেয়া দিতে হবে এক শ'।

তোতা ঠিক আছে—তোমাকে এক শত টাকাই দিবো। তবে আজই গাছটি কাটতে যাবে। আমি যাই। তুমি এসো। (প্রস্থান)।

মানিক মারে আমি গাছ কাটতে গেলাম। তুই আমার জন্য খাবার নিয়ে যাস।

মা যা বাবা। আমি তোর জন্য খাবার নিয়ে যাবো। (উভয়ের প্রস্থান)।

(কুড়াল কাঁধে মানিকের প্রবেশ)

পথে বিবেকের গান :

কোড়াল কাঁধে নিয়া গাছের গুড়ায় গেল
গাছের গুড়ার যাইয়া মানিক কুড়ালে ধার দে
কোড়াল ধার দিয়া মানিক গাছে কুপ দেয়
এক কুপ দুই কুপ তিন কুপ দেয় চার কুপের
কালে মানিক গাছের চাপায় পড়ে—
দূর থেকে রহমান খানো নজরে পড়িল
(বিবেকের প্রস্থান)

(রহমান খার প্রবেশ)

মানিক : ওহ কে আছো আমারে বাঁচাও।

রহমান : এইতো সুবর্ণ সুযোগ আমি এখন (কুড়াল দিয়া আঘাত)। যা শালা জনমের মতো চইলা যা। তুকে দিয়েই শুরু করবো আমার প্রতিশোধ-চরম প্রতিশোধ। (প্রস্থান)।

গাইতে গাইতে গুনু দাসীসহ :

ঝুর ঝুর ঝুরছে বকুল ফুরফুরি হাওয়ায় (২ বার)
ফুরফুরি হাওয়ায় গো সখি ফুরফুরি হাওয়ায়
ঝুর ঝুর ঝুর, ঝরছে বকুল ফুরফুরি হাওয়া
ফুল তোলা আর ভালো লাগেনা (২ বার)
চল গো সখি দেখে গো আসি কান্দে কারবা ছেলে
ঐ না পুকুরের পশ্চিম গো পাড়ে (২ বার)

www.pathagar.com

মা মা বলে চিৎকার গো করে (২ বার)
চল গো দেখে গো আসি—কান্দে কারবা ছেলে ।

দাসী একি বেগম সাহেবা মানিক যে গাছের নিচে পড়ে আছে । ও খোদা রক্ত কেনো?
গুনাই মানিক ও মানিক কথা বলছে না কেনো?

বিবেকের গান :

মানিক আর বলবে না গো কথা— (২ বার)
স্বর্গের মানিক স্বগে গেছে বন্দি হবে তোতা ।
মানিক আর বলবে নাকো কথা—ঐ
গুনাই : এখন তাহলে কি হবে ।

গান :

হ্যান্ডকাপ লাগাবে পুলিশ নিবেরে টানিয়া
গুনাই বিবি কাদবে তখোন চক্ষে অশ্রু দিয়া
চক্ষে আশ্রু গো দিয়া গুনাই বিবি ... ঐ

গুনুর গান :

ওদাসী -দাসী লো তুই তো ধর্মের বোন
মানিকের খুরে কথা দাসী রাখবি গোপন
ও দাসী দাসী লো আমরা গৃহে ফিরে যাই
মানিকের ই খুনের কথা স্বামীরে জানাই ।

গুনাই : দাসী দাসী - লো ধর মানিকের লাস আমরা গোপন করে রাখি (ঢেকে দিবে) চল দাসী আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি ।
দাসী তাই চলেন । (উভয়ের প্রস্থান) ।

(দুলুর প্রবেশ পিছে রহমান)

রহমান : বন্ধু এবার একটি মজার সংবাদ দেই আপনাকে ।
দুলু : কি এমন মজার সংবাদ বন্ধু?
রহমান : মানিক গাছের চাপায় পড়ে মারা গেছে ।
দুলু : মানিক তোতার বকুল গাছ কাটতে মারা গেছে?
রহমান : হ্যা বন্ধু এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না । চলুন মানিকের মাকে সঙ্গে নিয়ে শেরপুর থানায় কেস করে দেই । তাহলে তোতার হবে জেল । আর এই সুযোগ আপনি পাবেন গুনাই বিবিকে ।
দুলু হে হে বন্ধু গুনাই সুন্দরী কে পাবার জন্য আমি সব করতে পারি । তাহলে আর দেরী নয় চলেন আমরা বেড়িয়ে পরি ।
রহমান তাই চলুন । (প্রস্থান) ।

(খাবার নিয়ে মানিকের মার প্রবেশ)

www.pathagar.com

মানিকের মা : বাবা মানিক। মানিক। ছেলেটা সকাল বেলা পান্তা ভাত খেয়ে গাছ কাটতে আইছে। না জানি কত্তো খিদে পাইছে। মানিক ও মানিক।

(দুলু ও রহমান খার প্রবেশ)

রহমান : আরে ও মানিকের মা- তোমার হাতে কি?

মানিকের মা : মানিকের জন্য খাবার নিয়ে আইছি।

রহমান : তোমার মানিক আর নাই।

মানিকের মা : নাই? আমার মানিক নাই? তাহলে কই গেছে? আহারে পোলাডা খিদেয় মরে যাবে।

দুলু : মানিকের মা। তোমার মানিক কে তোতা মিয়া মেরে ফেলেছে।

মানিকের মা : কেন? আমার মানিক কে তোতা মারবে কেনো?

রহমান : তোমার মানিকের সঙ্গে তোতার ঝগড়া বেধেছিল- তখন তোতা রাগ করে মানিকের হাতের কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে মানিককে মেরে ফেলেছে। লাশ পর্যন্ত সরিয়ে ফেলেছে। তুমি খুজলেও মানিক কে পাবে না

মানিকের মা আমি গাছের গুড়ে গিয়ে আগে দেহি। এই যে গো আমার মানিকের রক্ত। বাবা মানিক——মানিকরে (কাঁদবে)।

দুলু আর কেঁদে কী করবে? চলো আমার সাথে থানায় গিয়ে কেস করে দেই।

মানিকের মা কেস, করলে কী অইবো?

রহমান তুমি পাবে অনেক টাকা। আর মানিক হত্যার দায়ে তোতার হবে ফাঁসি।

মানিকের মা না, না আমি যাবো না। আমার মানিক মরে গেছে- তাই বলে আরেক জনকে মরতে দিবো না।

রহমান এই যে বুড়ি- তুই থানায় কেস করতে না গেলে আমি তোকে এখোনি মেরে ফেলবো।

মানিকের মা না, আমাকে মাইরো না। আমি রাজি। তোমরা যা কও তাতেই আমি রাজি।

দুলু চলেন বন্ধু——এসো বুড়ি।

মানিকের মা তাই চলো বাবা। (সকলের প্রস্থান)।

শেরপুর থানা

(দারগা ও দুই জন পুলিশের প্রবেশ)

দারুগা : সেন্টি আজ কোনো নতুন কেস আসেনি?

পুলিশ : না স্যার এখনো আসেনি। তবে কে যেনো এদিকে আসছে।

(দুলু ও রহমান খার প্রবেশ)

www.pathagar.com

দুলু সালাম দারুগা সাহেব।

দারুগা আসুন জমিদার সাহেব। বসুন তা কী মনে করে আপনি থানায় এসেছেন?

দুলু আপনি একটি কেস লেখুন। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র তোতা মিয়া এই বুড়ির ছেলে মানিক কে কুপিয়ে হত্যা করেছে।

দারুগা সাক্ষি আছে—জমিদার সাহেব।

দুলু হে দারুগা সাহেব। আমি নিজে সাক্ষি আর সাক্ষি আমার বন্ধু রহমান খা। বাদী—এই বুড়ি মানিকের মা। আপনি কেস ফাইল করে আজই তোতাকে বন্দি করে আনুন।

দারুগা ঠিক আছে। আপনি যান। আমি এখনি যাবো তোতা মিয়াকে বন্দি করতে।

দুলু আমি এখন আসি দারুগা সাহেব। (প্রস্থান)

দারুগা। এই সিপাই চলো আমার সাথে তোতা মিয়াকে ধরে আনতে হবে।

পুলিশ। তাই চলুন স্যার। (উভয়ের প্রস্থান)

(তোতা, গুনাই ও দাসীর প্রবেশ)

তোতা : গুনু যে কথা তুমি শুনালে। এখন আমার কী উপায় হবে?

গুনাই : আপনি মানিকের মায়ের কাছে গিয়ে সব কিছু খুলে বলুন। মানিকের মাকে আমরাই লালন পালন করবো।

(দারুগা ও পুলিশের প্রবেশ)

দারুগা : এই সিপাই। বাড়ির ভিতরে ঢুকে তল্লাশি করো—তোতা মিয়া আছে কিনা।

পুলিশ : (মঞ্চে) এই ব্যাটা তোমার নাম কী? কী তোমার পরিচয়?

তোতার গান :

কি পরিচয় দিবো বাবু, বাবু শাল গ্রামে বাড়ি
পিতার নামটি লাল মিয়া ওগো বাবু আছে জমিদারি কি
বলি হে...

পুলিশ স্যার আসামী পাওয়া গেছে।

দারুগা বেধে ফেলো।

পুলিশ এই ব্যাটা হাত বাড়িয়ে দাও।

তোতার গান :

কি বাধন বান্দিলেন সিপাইগো
সিপাই সহেনা পরানে গো

www.pathagar.com

সিপাই ভবে কেও নাইরে...(২ বার)
একেতো চামের রশি সিপাই গো—
সিপাই তাতে দিছো শক্ত কষি গো সিপাই ভবে কেও নাইরে... ঐ।

দারুগা এই সিপাই নিয়ে চলো।

সিপাই চলো তোতা মিয়া নৌকায় চড়ে বসো।

গুনাই এর গান :

নাও ভিড়াও নাও ভিড়াও দারুগা বাবু
নাও ভিড়াও মোর ঘাটে রে ও প্রাণ গেলরে। (২ বার)
পাঁচ শত টাকা দিবো দারুগা বাবু
পান-বিড়ি খাই তেরে ও প্রাণ গেল রে। ঐ
তুব যগি না হয় দারুগা
বেচবো গলের হার রে ও প্রাণ গেলরে।ঐ
তবু যদি না হয় দারুগা বাবু
বেচবো বাপের জমি গো- ও প্রাণ গেল রে। ঐ

দারুগা এই মাঝি। নাও ভিড়াও। যাও তোতা মিয়া তোমার স্ত্রীর নিকট বিদায় নিয়ে এসো।

তোতার গান :

ও প্রিয়ে গৃহে যাও গৃহে যাও প্রিয়ে গৃহের অন্ন খাও
প্রাণের অন্ন খেয়ে প্রিয়ে জীবন বাচাও।

গুনাই এর গান :

ও গৃহে যাবো না গৃহে যাবো না আমি অন্ন খাবো না
প্রাণের পতি জেলে দিয়ে আমি অন্ন খাবো না।

তোতার গান :

আমায় ভুইলো না গো ওগো প্রাণেশ্বরী
আমার কথা মনে হলে যাইও শেরপুর।

গুনাই এর গান :

আমি কারে লইয়া যাবো শেরপুর
প্রাণের স্বামী গো কারে লইয়া যাবো শেরপুর

তোতা শুনো প্রিয়সী। আমার কথ মনে হলে তুমি বছির মাঝিকে সঙ্গে নিয়ে শেরপুর থানায় যাইও। তা হলে আমার দেখা পাবে।

দারুগা তোতা মিয়া চলে আসেন। আর অপেক্ষা করা চলবে না। নিয়ে এসো সিপাই

www.pathagar.com

সিপাই চলে আসুন তোতা মিয়া।
(প্রস্থান)
দাসী বেগম সাহেবা। যা হাবার তাতো হয়েই গেছে।
সেজন্য আর চিন্তা করে কী হবে?

গুনাই এর গান :

শোনার পালঙ্কে পালঙ্কে দাসী কে শয়ন করবে
প্রাণের পতি নাই কো ঘরে পালঙ্ক রই বে যে পড়ে
ও পালঙ্ক রইল পড়ে রইল পড়ে পতি গিয়েছে জেলে
পতি বিনে ঘরে আমি থাকি কেমনে। ঐ

দাসী চলেন বেগম সাহেব। এখন আপনে বিশ্রাম করুন।
গুনাই তাই চল দাসী। (উভয়ের প্রস্থান)

(দুলুর প্রবেশ)

দুলু : হা হা হা আমি জমিদার দুলু মিয়া যা বলি তাই করি। তোতা মিয়া তোকে খুনের দায়ে পাঠায়েছি জেলে। এখন তোর রূপবতী গুনাই সুন্দরী কে আমি অনায়াসে ভোগ করবো। : হা হা হা (প্রস্থান)।

গুনাই এর প্রবেশ ও গান :

ও কোকিল ডাইকো না ডাইকো না কোকিল ঐ
কদম ডালে
শীত বসন্ত সুখের কালে কোকিল পতি নাই ঘরে। (২ বার)
ও পতি নাই ঘরে পতি নাই ঘরে পতি রয়েছে জেলে
পতি বিনে একা ঘরে আমি থাকবো কেমনে। ঐ
ও পতি নাই দেশে পতি নাই দেশে পতি রয়েছে জেলে
কারে নিয়া খেলবো পাশা আমি কইসে নিরলে।ঐ

(দুলু মিয়ার প্রবেশ পথে)

দুলু : চমৎকার চমৎকার। যেমন রূপ তেমনি সুর। গাও সুন্দরী আবার গাও।
গুনাই : কে? চাচা মিয়া?
দুলু : না, না সুন্দরী ও সম্পর্ক মুখে আনবে না। কারণ আমি যেদিন পিপাসায় কাতার হয়ে জল পান করতে গিয়েছিলাম তোমাদের বাড়ি সেই দিন তোমাকে প্রথম দেখেই আমি তোমাকে আমার মনের রানি করে নিয়েছি। শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে শুধু তোমার কথাই ভেবে আসছি। এখন তুমি বলো নারী আমাকে তোমার যোবন সুধা পান করতে দিবে কিনা?

www.pathagar.com

(গুনাই এর গান)
ও আমার চাচা জান চাচা জান আপনে এজিদের সমান
আপন ভাতিজা জেলে দিয়া আমায় বিয়া করতে চান। (২ বার)

দুলু : হে হে সুন্দরী। আমি তোমায় বিয়ে করবো।

গুনাই এর গান :

ও আমার চাচা জান চাচা জান আপনি একি করতে চান
আপনার মেয়ে সবুর জান কে করেন গে বিয়ে। (২ বার)

দুলু কী? বললি কিরে শয়তানি। আমার মেয়েকে বিয়ে করবো? তবে আজ আর তোর রক্ষা নাই। আমি এই মুহূর্তে তোর রূপ যৌবন ভোগ করে, আমার মনের জ্বালা নিবারণ করবো।

গুনাই : এই শয়তানের হাত থেকে বাঁচতে হলে আমাকে ছলনার আশ্রয় নিতে হবে।

দুলু : এসো সুন্দরী। তুমি আমার কাছে এসো। তা না হলে আমি জোর করে তোমার সতীত্ব হরণ করবো।

গুনাই : তা আর করতে হবে না। আপনি কি সত্যিই আমাকে ভালোবাসেন?

দুলু : হ্যাঁ সুন্দরী আমি তোমার জন্য জীবন ও দিতে পারি। বলো তুমি কী চাও?

গুনাই : যদি আমাকে ভালো বেসেই থাকেন–তাহলে আপনার স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। আর আপনার জমিদারি আমার নামে লিখে দিতে হবে। তা হলে আমি চির সাথী হিসাবে আপনার ঘরে যাবো।

দুলু ঠিক আছে, আমি এই মুহূর্তে জমিদারি ও তালাকের কাগজ এনে দিবো যাবো আর আসবো। (প্রস্থান)

(রহমান খার প্রস্থান)

রহমান : শাব্বাশ নারী। তোমার বুদ্ধির তারিখ করতে হয়।

গুনাই : কে?

রহমান : আমি রহমান খা। জমিদারের বন্ধু।

গুনাই : কি চান এখানে?

রহমান : চাই না কিছুই। তবে—

গুনাই : তাহলে এখানে এসেছেন কেন?

রহমান : আমি এসেছিলাম তোমার ইজ্জত বাঁচাতে। আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। তোমার স্বামী জেলে যাবার পর থেকে আমি তোমাকে পাহারা দিতেছি যাতে করে ঐ লম্পট জমিদার তোমার ইজ্জতের ক্ষতি না করতে পারে। মনে করো আমি তোমার ভাই।

গুনাই আপনি আমাকে বোন বললেন?

www.pathagar.com

রহমান : হ্যাঁ বোন। আমি বিদেশ থেকে লেখাপড়া করার কালে এই লম্পট আমার সতী সাতী স্ত্রীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি করেছে। সে দিন থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই ওর পিছু নিয়েছি। এখন আমি কেটে পড়ি। ও হয়তো এখনি এসে পড়বে। (প্রস্থান)

(দুলুর প্রবেশ)

দুলু : এই নাও সুন্দরী তালাক আর জমিদারির কাগজ। তোমার নামে দিয়া দিলাম। (নিবে)। এখন চলো সুন্দরী দুইজন একটু বিশ্রাম করি।

গুনাই : বিশ্রাম শয়তান লম্পট চলে যা এখান থেকে। তা না হলে আমি তোকে খুন করবো।

দুলু : ওরে শয়তানি। তুই আমার সর্বনাশ করে এখন চলে যেতে বলিস। আমি তোর দেমাগ এই মুহূর্তে ভেঙে দিবো। এই দেখ— (ধরবে)।

গুনাই ওগো কে আছো আমায় বাঁচাও-বাঁচাও

দুলু কেউ আসবে না আমার হাত থেকে তোকে রক্ষা করতে আয়রে শয়তানি।

রহমান আমি আছি সতী নারীকে রক্ষা করতে।

দুলু কে বন্ধু আপনি কেন এসেছেন এখানে?

রহমান ধীরে বন্ধু ধীরে। ভালোয় ভালোয় এই সতী নারীর হাত ছেড়ে দিন। তুমি চলে যাও বোন। (গুনুর প্রস্থান)।

দুলু একি করলেন বন্ধু। আমার শিকার ছেড়ে দিলেন?

রহমান আমি আগেই বলেছি তাড়া হুড়া কাজের ফল ভালো হয় না। যা করবেন ধীরে ধীরে করবেন। আর বেশি সময় নেই দেখবেন গুনাই বিবি অনায়াসে আপনার কাছে ধরা দিবে।

দুলু ঠিক আছে—আপনার কথাই মেনে নিলাম। চলেন এখন অন্তপুরে যাই।

রহমান তাই চলুন। (উভয়ের প্রস্থান)

(চিন্তিত গুনাই বসা দাসীর প্রবেশ)

দাসী : বেগম সাহেবা একা একা বসে কী এমন চিন্তা ভাবনা করছেন?

গুনাই এর গান :

ও দাসী শুনই লো শুনই লো দাসী দুঃখের কথা কই
এই বাড়িতে বসত করলে দাসী ইজ্জত বাঁচবার নাই। (২ বার)

দাসী বেগম সাহেবা। কী হয়েছে আমায় খুলে বলুন।

গুনাই দাসী দাসী লো। আমার লম্পট চাচা শ্বশুর আমার ইজ্জত লুটতে চায়। তাই এখানে আর থাকা যাবে না। আজই তুই বছির মাঝিকে ডেকে আন। আমি শেরপুর থানায় গিয়ে আমার স্বামীর জামিনের চেষ্টা করবো।

www.pathagar.com

দাসী ঠিক আছে বেগম সাহেবা আমি বছির মাঝিকে ডেকে আনছি।

(দাসীর গান)

ও বছির বছির গো তুমি জলদী আসো না
গুনাই বিবি চাইছে নৌকা শেরপুর যাবে। (২ বার)

বছিরের প্রবেশ পথে গান :

ও দাসী দাসী গো- আমি জরে বাঁচি না
মা বইলাছে বছির বাবা তুমি বিদেশে যাইও না। (২ বার)

গুনাই : বছির ভাই একি কথা বলছো তুমি?

বছির : বেগম সাহেবা আমার মা বৈদেশে যাইতে মানা করেছে। তাই আমি আপনার কথা পালন করতে পারবো না।

গুনাই বছির ভাই। আমার স্বামী যে যাবার সময় তোমার কথাই বলে গেছে।

বছির ঠিক আছে—ছোট সাহেব যখোন আমার কথা বলেই গেছে—তাহলে তো যেতেই হবে। তবে উঠুন আপনারা। নৌকায় চড়ে বসুন। আমি পাল তুইল্যা দেই।

মাঝির গান :

গঙ্গায় তোর রঙ্গ ডেউ খেলে লো বুবু জান
গঙ্গায় তোর রঙ্গ ঢেউ খেলে
আগা দিয়ে উঠে ঢেউ গো—পাছা দিয়ে নাড়ে। (২বাড়)
তাই দেখিয়া গুনাই বিবি চমকে চমকে
উঠে লো বুবু জান গঙ্গায় তোর রঙ্গ ঢেউ খেলে।
ঐ (গাইতে গাইতে প্রস্থান)
(থানা-দারোগা-পুলিশ)

(গুনাই, বছির ও দাসীর প্রবেশ)

বছির বেগম সাহেবা ঐ তো শেরপুর থানা। এখন নৌকা থেকে নেমে থানায় যান।

গুনাই চলো সবাই যাই।
(মঞ্চে উঠতে চাইবে পুলিশের বাধা)

পুলিশ এই মহিলা। ভিতরে যাওয়া হবে না।

গুনাই কেন ভাই আমরা বহুদুর থেকে। এসেছি। বড়ো বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো।

ওছি সিপাই। ওদের কে ভিতরে আসতে দাও। এই তোমাদের বাড়ি কোতায়? আর এখানে কী জন্য

গুনাই আমি এক হত ভাগেনী এক খুনির স্ত্রী বাবা। আমি এসেছি সাল গ্রাম থেকে।

ওছি ও বুঝতে পেরেছি। তুমি তাহলে জমিদার তোতা মিয়ার স্ত্রী।

www.pathagar.com

গুনাই হে বাবা- আমি সেই অসহায় গুনাই বিবি। বাবা এই পৃথিবীতে আমার আপন বলতে কেহ নাই। আজ হতে আপনি আমার ধর্মের বাবা।

ওছি বাবা! মা তুই আমাকে বাবা বলে বড়ো দায় ঠেকালি মা।

গুনাই বাবা আপনি মেয়ের জামাই এর জন্য যে ব্যবস্থা হয় করে দিন।

ওছি মা তুই আর কোন চিন্তা করিস না। যে পর্যন্ত আমার মেয়ের জামাই কে মুক্ত করতে না পারবো সেই পর্যন্ত তুই আমার বাসায় থাকবি। আমি কালই তোর স্বামীর পুনর্বার তদন্ত করার জন্য কোর্টে আবেদন করবো। দেখবি মা তোর স্বামী মুক্তি পেয়ে গেছে।

গুনাই : তাই যেন হয় বাবা।

উছি : এখন চলো সবাই আমার বাসায়।

গুনাই চল দাসী : (সকলের প্রস্থান)

কোর্ট অফিস, পেশকার ও পিয়ন)

উছি : এই নিন স্যার (ফাইল দিবে) আমার কাগজপত্র।

পেশকার : স্যার, শেরপুর থানার ওসি সাহেব তোতা মিয়ার কেসের পুনরায় সাক্ষী নেওয়ার আবেদন করেছেন।

হাকিম আবেদন মঞ্জুর ওয়াডার ওয়াডার।

পিয়ন আসামী তোতা মিয়া সাক্ষী দুলু মিয়া- হাজির।

উকিল মহামান্য আদালত আমি ১নং সাক্ষী জমিদার দুলু মিয়াকে কিছু জিজ্ঞাসা করার অনুমতি প্রার্থনা করছি। স্যার।

হাকিম অনুমতি দেওয়া গেল।

উকিল জমিদার সাহেব। আপনি তো শাল গ্রামের সমস্ত বিচার শালিম করে থাকেন?

দুলু হে, হে আমি এলাকার সব বিচার করে থাকি। আমার ভাতিজা তোতা খুবই খারাপ। সামান্য কয়টা মজুরীর টাকা না দিয়া মানিক কে গলাধাক্কা দেয় এবং এক সময় কথা কাটাকাটিতে মানিকের উপর রাগান্বিত হইয়া মানিকের হাতের কুড়াল কেড়ে নিয়ে মানিক কে কুপিয়ে হত্যা করে। আমি পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। স্যার। সেই জন্যেই তো আমি নিজে সাক্ষি হয়েছি।

উকিল : জমিদার সাহেব। সেই সময় আপনার সঙ্গে আর কে কে ছিলেন?

দুলু : আমার সঙ্গে আমার বন্ধু রহমান খাঁ ছিল।

উকিল : মারামারির সময় ওখানে কী জন্য গিয়েছিলেন?

দুলু : আমরা দুই বন্ধু বেড়াইতে গিয়ে দেখতে পেলাম—তোতা মানিক কে খুন করলো।

উকিল জমিদার সাহেব। আপনি যেতে পারেন। মাননীয় আদালত আমি ডাক্তার রহমান খাকে কিছু জিজ্ঞাস করার অনুমতি চাই স্যার।

www.pathagar.com

হাকিম অনুমতি দেওয়া গেল।

পিয়ন ডাক্তার রহমান খাঁ—হাজির।

(রহমান খার প্রবেশ)

উকিল : ডাক্তার সাহেব। বলুন তো তোতা মিয়া যখন খুন করে তখন আপনি কেনো সেখানে ছিলেন? আর এ কেসের সাক্ষিই বা কেনো হলেন?

রহমান মানিক খুন হতে আমি দেখেছি। তাই মানিকের মা আমাকে সাক্ষি করেছে।

উকিল আপনি যেতে পারেন। মহামান্য আদালত আমি বাদী নি মানিকের মাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার অনুমতি চাই ছি।

হাকিম অনুমতি দেওয়া গেল।

পিয়ন বাদিনী মানিকের মা হাজির।

(মানিকের মার প্রবেশ)

মানিকের মা : (পথে) বাবা গো আমি কিছু জানিনে।

উকিল : বলতো মানিকের মা তোমার মানিক কে কে খুন করেছে?

মানিকের মা : বাবা গো কেডা খুন করেছে তা আমি কেমনে কমু

উকিল : ঠিক আছে মানিকের মা।
তুমি তো ভালো মানুষ। মিথ্যা কথা বলো না। তাই না?

মানিকের মা : হে বাবা আমি মিথে কথা কমুনা।

উকিল : মানিকের মা তোতা মিয়াও তো মিথ্যা কথা কয় না। তাই না?

মানিকের মা : হ, বাবা ছোট সাহেব খুব ভালা মানুষ। মিছে কথা কয় না।

উকিল : দেখেন স্যার। মানিকের মা মিথ্যা কথা বলে না। তোতা মিয়াও ভাল মানুষ, মিথা কথা বলে না। আচ্ছা মানিকের মা তুমি তোতার বিরুদ্ধে মামলা করলে তোতা ছাড়া ঐ গ্রামে আর কোনো লোক ছিল না? ওদের বিরুদ্ধে মামলা করলে না কেন?

মানিকের মা : বাব গো। ঐ ডাক্তার সাব আর বড়ো সাহেব আমাকে কইল- তোতাকে আসামী দিলে আমি নাকি বহু টেহা পামু তাই।

উকিল আচ্ছা মানিকের মা এ যাবৎ জমিদার দুলু মিয়া তোমাকে কত টাকা দিয়েছে?

মানিকের মা বাবা গো। আমি হিসেব জানিনে। ওরা যা কয় আমি তাই করি।

উকিল মানিকের মা তুমি এখন আসতে পারো। (প্রস্থান)। মহামান্য আদালত আমি শেরপুর থানার উছি সাহেবের কাছ থেকে কিছু জানার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করছি।

হাকিম অনুমতি দেওয়া গেল।

www.pathagar.com

উকিল উছি সাহেব। বলুন তো- তোতা মিয়া যে বুড়ির ছেলে মানিক কে খুন করেছে—তা আপনি কেমন করে জেনেছেন?

উছি আমি জমিদার দুলু মিয়া আর তার বন্ধু ডাক্তার রহমান খার কথা বিশ্বাস করে তোতা মিয়াকে খুনের দায়ে চালান করে দেই। পরবর্তী সময়ে তোতা মিয়ার স্ত্রীর মুখে সব কিছু জিনে শাল গ্রামে গোয়েন্দা মারফত জানতে পারি এই মোকদ্দমা দুলু মিয়ার চক্রান্ত।

দুলুর উকিল মহামান্য আদালত। আমার প্রতিপক্ষ বিজ্ঞ উকিল সাহেব তোতা মিয়ার মতো একজন দোষী খুনীকে নির্দোষ প্রমাণ করতে চান। আমার পক্ষের সাক্ষী একজন ন্যায়, নিষ্ঠা চরিত্রবান সমাজ হিতৈষী ব্যক্তির উপর দোষ চাপায়ে দিয়ে আইনকে ফাঁকি দিতে চাইছেন মহামান্য আদালত।

তোতার উকিল : মহামান্য আদালত। আমার প্রতিপক্ষ উকিল সাহেব যে বলে গেল জমিদার দুলু মিয়া একজন সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি কিন্তু আমি বলবো- সে একজন লম্পট, চরিত্রহীনা।

দুলুর উকিল : নো, নো, নো, ইম্পসেবল। ইহা হইতেই পারে না। আপনি বার বার একজন সমাজ সেবক জনদরদী জমিদারকে চরিত্রহীনা বলতে পারেন না। কী প্রমাণ আপনার কাছে?

তোতার উকিল : বিনা প্রমাণে আমি জমিদার সাহেব কে দোষ দিচ্ছি না। মহামান্য আদালত, এই দেখুন আমার হাতেই তার প্রমাণ। (কিছু কাগছপত্র হাকিমের টেবিলে দিবে)।

হাকিম : (নিয়ে) এতো দেখছি দুলু মিয়ার স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয়েছে। আর এইটা তো দেখছি দুলু মিয়ার সমস্ত সম্পত্তি গুনাই বিবির নামে উইল করে দেওয়া হয়েছে।

তোতার উকিল : মহামান্য আদালত। এই সমস্ত ঘটনা কেনো জমিদার সাহেব করেছেন—তাতে বুজা যায়—দুলু জমিদার সাহেবের লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল গুনাই বিবির উপর। তাকে পাবার জন্যই দুলু মিয়া আর বন্ধু রহমান খা মানিককে হত্যা করে তোতা মিয়াকে খুনের দায়ে জেল হাজতে পাঠায়েছে।

হাকিম : কারণ?

তোতার উকিল : কারণ অতি সহজ মহামান্য আদালত। তোতা মিয়া আজীবন জেলে থাকলে দুলু মিয়া সহজে গুনাই বিবিকে নিয়ে ঘর করতে পারবে। কিন্তু গুনাই বিবি একজন সতী নারী। সে তার স্বামীর মুক্তি চায়। তাই আদালতের কাছে আমার আকুল আবেদন দুলু মিয়া ও রহমান খার বিধি- বিধান মোতাবেক শাস্তি এবং নির্দোষ তোতা মিয়ার মুক্তির জন্য জোর সুপারিশ জানাই মহামান্য আদালত।

www.pathagar.com

হাকিম সকল সাক্ষী ও গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী বিবেচনা করে তোতা মিয়াকে আদালত বেকুসুর খালাস দিচ্ছে। আর মিথ্যা মামলা করার জন্য দুলু মিয়াকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো এবং তার বন্ধু রহমান খাকে সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার আদেশ দিছি। আদালত আজ। এ পর্যন্ত মূলতুবি ঘোষণা করা হইল।

গুনাই স্বামী।

তোতা গুনু। চলো গুনাই—আজ থেকে আমরা শুরু করবো গুনাই বিবির সংসার।

www.pathagar.com

লোকক্রীড়া

লোকক্রীড়া বা গ্রামীণ খেলাধুলা বাঙালির জীবনের আনন্দের এক অনস্বীকার্য অংশ। বিশেষ করে গ্রামের মানুষদের নিস্তরঙ্গ জীবনে খেলাধুলার ভূমিকা অতুলনীয়। প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামের বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা বিভিন্ন রকমের খেলাধুলার মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করে আসছেন। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক মানবর্দ্ধন পালের কথা এখানে প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরছি। তিনি বলেছেন, 'খেলা তো সংস্কৃতিরই স্বরূপ–সমাজের বহির্কাঠামের প্রকাশ। মানুষে-মানুষে বিভাজন যখন ছিল না, ছিল না গ্রামীণ ও নগর-সংস্কৃতির ব্যবধান–ছিল কেবলই মানব-সংস্কৃতি সভ্যতার সেই ঊষালগ্নে খেলাধুলা বা ক্রীড়া-সংস্কৃতি বলতে কি কিছু ছিল? মানবসভ্যতার সেই আদিম যুগে পশু শিকারের পূর্বপ্রস্তুতিমূলক যে 'ইন্দ্রজাল'–তা কি ক্রীড়া-সংস্কৃতির প্রপিতামহ? একালের খেলা তো বিনোদন এবং রম্যতারই প্রকাশ। তাই আদিম মানুষের ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রস্তুতিমূলক ক্রিয়া কখনও ক্রীড়া হতে পারে না। তাই বিনোদনলাভ এবং বিনোদনদান, যা একালের ক্রীড়া-সংস্কৃতির মূল চেতনা।' তিনি আরো বলেছেন, 'আমাদের দেশে নাগরিক ও গ্রামীণ খেলাধুলায় এখনও রয়ে গেছে বিস্তর পার্থক্য। এ পার্থক্য যেমন ক্রীড়া সংঘটনের বিষয়ে তেমনই উপকরণে। এ দেশের নাগরিক খেলাধুলা, হোক না তা ইনডোর কিংবা আউটডোর–ফুটবল থেকে ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট থেকে টেনিস–সবই পাশ্চাত্যের। সবই ইউরোপীয় সংস্কৃতি থেকে আগত এবং অধিকাংশই ইংরেজ-ঔপনিবেশিক কালে নগরজীবনে বাবু-সংস্কৃতিতে আত্তীকৃত। কিন্তু বাংলা ও বাঙালির যে মৃত্তিকা-সংলগ্ন লৌকিক সংস্কৃতি তা কিন্তু ভুঁইফোর নয়, বিদেশাগতও নয়। গ্রামীণ খেলাধুলায় আছে মাটির কাছাকাছি খেটে খাওয়া মানুষের জীবনাচরণের বৈনোদনিক রূপ এবং কৃষি-সংস্কৃতির নানা উপকরণ—গ্রামীণ বাদ্যযন্ত্রই বলি বা খেলাধুলার নানা উপকরণের কথাই ভাবি–লক্ষ করা যাবে, সবই শ্রমঘনিষ্ঠ লৌকিক জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত এবং নিজস্ব উদ্ভাবিত। 'যাঁরা ক্ষেতে চালাইছে হাল, যারা বীজ বোনে' কিংবা হাতুড়ি চালায় তাদেরও মানসমুকুরে ফুল ফোটে, মন চায় বিনোদন। কিন্তু তাদের বিনোদন বিলাসিতা নয়। বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, 'বিত্ত যাদের অনুপার্জিত এবং অবসর প্রচুর'–সেই সব সংখ্যালঘুদের আয়েশি জীবনে খেলাধুলা স্বাস্থ্যরক্ষা ও হজমশক্তি বৃদ্ধির উপাদান এবং বিনোদন-বিলাসিতা হতে পারে। কিন্তু শ্রম এবং হাত-হাতিয়ার যাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন তাদের জীবনে খেলাধুলা বিলাসিতা নয়, নির্জলা বিনোদনও নয়। বিশ্রাম যেমন কাজের অঙ্গ, শ্রমজীবী মানুষের জীবনেও খেলাধুলা তেমনি কর্মপ্রেরণার উৎস। কেবল কর্মপ্রেরণাই নয়, শোষিত গ্রামীণ মানুষের লোকজ খেলাধুলায় আছে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শোষক শ্রেণিকে পরাজিত করার অনুপ্রেরণাও। তিনটি ছাগল মিলে একটি বাঘকে বন্দী করার যে খেলা বাংলাদেশের গ্রামজীবনে বহুল প্রচলিত–তা থেকে কি শোষিত মানুষের একতার মাধ্যমে শোষক শ্রেণির প্রতিনিধিকে

www.pathagar.com

পরাজিত করার অনুপ্রেরণা লভ্য নয়? এই 'বাঘবন্দী' খেলাটিকে রূপক হিসেবেও বর্ণনা করা যেতে পারে। তিনটি ছাগ হতে পারে সংখ্যাগরিষ্ঠ গরিব মানুষের রূপক, আর একটি বাঘ খাদক শোষক শ্রেণির।' সুতরাং গ্রামীণ খেলাধুলা লোক-সংস্কৃতিরই অঙ্গ।

আমাদের বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনে যে খেলাগুলো ঐতিহ্যগতভাবে প্রচলিত আছে সেগুলো হলো : মইদৌড়, গরুদৌড়, ষাঁড়ের লড়াই, ঘোড়দৌড়, মোরগলড়াই, লাঠিখেলা, হা-ডু-ডু, ডাংগুলি, বৌচি, এক্কা-দোক্কা, দারিয়াবান্দা, কানামাছি, গোল্লাছুট, কুস্তি, লাইখেলা, ছয়গুটি, ষোলগুটি, বাঘবন্দী, কুতকুত, জলকেলি, লুকোচুরি, নৌকাবাইচ ইত্যাদি। অঞ্চল ভেদে এসব খেলাগুলোর নামের কিংবা নিয়মকানুনে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের গ্রামজীবনের প্রায় সর্বত্রই এ খেলাগুলোর প্রচলন আছে। তবে ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশভেদে কোনো কোনো খেলা সর্বত্র প্রচলিত নয়। যেমন : নৌকাবাইচ ভাটি অঞ্চল ও নদী-অধ্যুষিত এলাকা ছাড়া পাহাড়ি অঞ্চলে লক্ষ করা যায় না। উল্লিখিত খেলাগুলোকে আবার বিভিন্নভাবে শ্রেণিকরণ করা যেতে পারে। কিছু আছে নিতান্তই শিশুতোষ খেলা এবং সাংবৎসরিকও। যেমন কানামাছি, বৌচি, এক্কা-দোক্কা, কুতকুত, গোল্লাছুট, লুকোচুরি–এ খেলাগুলো বড়োদের নয়, ছোটোদের এবং এগুলোর মধ্যে বেশিরভাগই মেয়ে-শিশুদের খেলা। জলকেলি ও লাইখেলাও মেয়েদের খেলাই তবে তা বিশেষও তরুণী—ঐ যুবতীদের। হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবান্দা ও ডাঙগুলি জাতীয় খেলাগুলো সাধারণত ছেলে-শিশু ও বয়সী পুরুষদের খেলা। ছয়গুটি, ষোলগুটি, বাঘবন্দী–এ-খেলাগুলোতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে কোনো মানুষই অংশ নিয়ে থাকে। বছরের যে কোনো সময়ই এ-সব দ্বি-পাক্ষিক খেলা গ্রামবাংলায় চলতে দেখা যায়। গ্রামবাংলার অনেক খেলা দ্বি-পাক্ষিক ও দলবদ্ধভাবে সংঘটিত হয়। যেমন : হা-ডু-ডু, ডাংগুলি, দাড়িয়াবান্দা ইত্যাদি। গ্রাম-বাংলার অনেক খেলা আছে ঋতুভিত্তিক ও সামাজিক উৎসব-নির্ভর। লাঠিখেলা, নৌকাবাইচ, ষাঁড়ের লড়াই, গরুদৌড়, মোরগ-লড়াই, কুস্তি, জলকেলি ইত্যাদি খেলা ঋতুভিত্তিক, সামাজিক ও লৌকিক উৎসবে-আনন্দে অনুষ্ঠিত হয়। জলকেলি মূলত পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী সমাজে নববর্ষের 'বৈসাকি' উৎসবে অনুষ্ঠিত হয়। পারস্পরিক জল-ছিটানোর এই উৎসবমুখর অনুষ্ঠানে আদিবাসী তরুণ-তরুণী, যুবক - যুবতীরা জলক্রীড়ার মাধ্যমে মূলত নববর্ষে জীবনসঙ্গী অন্বেষণ করে। বাংলা নববর্ষ বা ঈদোৎসব উপলক্ষে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় জনপ্রিয় বলীখেলা। আঞ্চলিক হলেও জব্বারের লৌকিক ঐতিহ্যমণ্ডিত এই বলীখেলা দেশের মানুষের কাছে আকর্ষণীয়। শেরপুর অঞ্চলে ঘুটি খেলা, শালিক পাখি নমস্কার, শব্দখেলা, গাঙ্গি খেলা প্রভৃতি বেশ জনপ্রিয়। শেরপুর অঞ্চলের কিছু লোকক্রীড়া বা গ্রামীণ খেলাধুলার পরিচয় তুলে ধরা হলো।

১. মইদৌড়

মই দৌড় ছিল এরকম—২টি গরুর কাঁধে জোয়াল বেঁধে, সেই জোয়ালের সঙ্গে শক্ত রশি বা দড়ি মইয়ের (আঞ্চলিক ভাষায় জঙ্গ) সাথে যুক্ত করে দেওয়া হতো। একজন করে প্রতিযোগি সেই মইয়ে চড়ে দাঁড়াতো। দৌড় প্রতিযোগিতার মতই সারি ধরে দাঁড়াত প্রতিযোগীরা। তার পিছন থেকে বাঁশি বাজানো বা কোনো শব্দ করলে বা আওয়াজ দিলে মই দৌড় শুরু করত প্রতিযোগীরা। যে জায়গায় মই দৌড় হতো, জমিটি ছিল চাষকরা নরম মাটি। দৌড়ের সময় কোনো কোনো প্রতিযোগী মই উল্টিয়ে

www.pathagar.com

পড়েও যেত। পড়ে গিয়ে অনেকে ব্যথাও পেত এই মই দৌড় প্রতিযোগিতা দেখে অনেক ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা ভয়ও পেত। যে জায়গায় প্রতিযোগিতা হতো, সেটি চতুর্ভূজের মত মাঠ। এই মাঠের চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে মই দৌড় দেখত হাজার হাজার মানুষ। ছোটোরা অধিকাংশই তাদের বাবার ঘাড়ে উঠে মই দৌড় দেখত। ভয়ও পেতো।

২. ষাঁড়ের লড়াই

ষাঁড়ের লড়াই। ত্যাজি, ত্যাজি, বিভিন্ন রঙের ষাঁড় নিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসত প্রতিযোগীরা। জানা গেছে, প্রতিযোগিতার জন্য এই ষাঁড়গুলোকে সারা বছর ধরে ওভাবেই তৈরি করা হতো। এই লড়াকু ষাঁড় দিয়ে কখনো হাল-চাল করানো হতো না। ষাঁড়ের লড়াই অনেক কঠিন ছিল। দেখা যেত এক ষাঁড় অন্য ষাঁড়কে শিং দিয়ে আঘাত করতে করতে কাবু করে ফেলত, তখন ষাঁড়ের মালিক কাছে গেলে তাকেও ভীষণভাবে আঘাত করতে আসত। অনেক সময় আঘাত পেয়ে কেউ কেউ মারাত্মক আহত। এই ধরনের সমস্যা থাকলেও, প্রতিযোগিতায় দারুণ উত্তেজনা ও আনন্দ। প্রতিযোগী ষাঁড়গুলোকে সবাই নিয়ে আসতো অনেক সাজিয়ে। যেমন—গলায় রঙিন কাগজের মালা কিংবা ফুলের মালা, শিং দুটো রঙিন করা এবং ষাঁড়ের শরীরে রঙ দিয়ে সাজান প্রতিযোগিতা। শেষে বিজয়ী ষাঁড়-ওয়ালারা পুরস্কার নিয়ে অনেক আনন্দ করতে করতে বাড়ি ফিরে। পুরস্কার দেয় আয়োজকদের মধ্যে যিনি মুরব্বী বা বয়স্ক নামকরা ব্যক্তি।

৩. ঘোড় দৌড়

ঘোড় দৌড়টাও চমৎকার। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা রঙের ঘোড়া নিয়ে আসে প্রতিযোগীরা। অনেক বড়ো মাঠ। কেউ শাদা ঘোড়া, কেউ লাল ঘোড়ার পিঠে চড়ে প্রতিযোগিতায় নামে। মাঠের ধুলো উড়িয়ে যখন ঘোড়াগুলো দৌড় দেয়, তখন দেখতে ভালই লাগে এবং মনে মনে শিহরণ লাগে। কোনো কোনো ঘোড়া হাঁক দেয়। আমার ভাল লাগত শাদা ঘোড়া দেখতে। মন চাইত একটি শাদা ঘোড়ায় চড়ে আমিও চলে যাই মাঠ পেরিয়ে অনেক দূরে। শৈশবের সেই চাওয়া আজোও পূরণ হয়নি।

৪. লাঠি খেলা

লাঠি খেলা ছিল খুবই চমৎকার। খালি গায়ে লুঙ্গি কাছা মেরে গামছা কোমড়ে শক্ত করে বেঁধে প্রতিযোগিতায় নামত প্রতিযোগীরা। যে লাঠি দিয়ে তারা খেলে, সেটিকে তেল দিয়ে ভাল করে ঘষে নেয় তারা। লাঠিগুলো চিক চিক করে দূর থেকে দেখতে। কেউ কেউ মাথায় লাল অথবা সবুজ কিংবা শাদা ফিতা বেঁধে টান টান উত্তেজনায় নামে। শুরু হয় খেলা। নানান কশরত, কৌশল ও কারুকাজে জেতার জন্য লড়াই করে। লাঠি ঘুরানোর কায়দা-কানুন খুবই চমৎকার। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। একদিকে আত্মরক্ষা, অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করা–একসঙ্গে চলে। লড়াই চলে অনেকক্ষণ। হার-জিত হয়। বিজয়ীরা আনন্দ-উল্লাস করে।

www.pathagar.com

ঘোড় দৌড়

লাঠি খেলা

www.pathagar.com

৫. গাঙ্গি খেলা

গাঙ্গি খেলা আরেকটি মজার খেলা। একদম শারীরিক শক্তির লড়াই। আমাদের নদী পাড়ের মানুষদের এই গাঙ্গি খেলাটি তখন খুবই জনপ্রিয় ছিল। কুস্তি এবং চট্টগ্রামের জব্বরের বলি খেলার মতই। এটি অন্যান্য কোনো অঞ্চলে আছি কিনা জানা যায়নি তবে শেরপুর অঞ্চলে এক সময় খুবই জনপ্রিয় খেলা ছিল এটি। প্রচুর দর্শক ছিল এই খেলার। এখন তো এইসব খেলা আর হয়ই না।

৬. হা-ডু-ডু

প্রাচীনকাল থেকেই গ্রামবাংলার জনপ্রিয় খেলা হা-ডু-ডু। দেশের সব অঞ্চলেই এ খেলা প্রচলিত। এর অন্য নাম কাবাডি। বাংলাদেশের গ্রামীণ খেলাধুলার মধ্যে যে গুলো আন্তর্জাতিক পরিচিত ও মর্যাদা লাভ করেছে এর মধ্যে হা-ডু-ডু অন্যতম। হা-ডু-ডু অঞ্চলভেদে 'ছি' খেলা নামেও পরিচিত। সাফ গেমস্‌সহ বিভিন্ন আন্তঃদেশীয় ক্রীড়াঙ্গনেও গ্রামবাংলার হা-ডু-ডু স্থান লাভ করেছে। দু'দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত এ খেলায় প্রতিদলে ৫/৭ জন করে খেলোয়াড় থাকে। লম্বাকৃতি একটি চতুর্ভূজের মাঝে দাগ কেটে উভয় দল অবস্থান গ্রহণ করে। একদলের খেলোয়াড় অন্য দলের খেলোয়াড়কে একদমে ছুঁয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসতে পারলে ঐ খেলোয়াড় 'মারা' যায়। আর যদি সে ফিরে আসতে না পারে অর্থাৎ অন্য দলের সবাই মিলে তাকে আটকে রাখতে পারলে সে 'মারা' যায়। এভাবে ধারাবাহিক আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণের মাধ্যমে খেলা এগিয়ে যায়। অবশেষে যে দলের সব খেলোয়াড় 'মারা' পড়ে তাদের খেলায় পরাজয় হয়। গ্রামের কোনো সম্পন্ন বাড়ির বড়ো উঠোনে, বীজতলায় কিংবা উন্মুক্ত স্থানে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

অনেকটা হ্রাস পেলেও গ্রামের তরুণ-যুবকদের মধ্যে এখনও হা-ডু-ডু খেলার যথেষ্ট প্রচলন আছে। শক্তিশালী স্বাস্থ্যবান যুবকেরা পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে-গ্রামে হা-ডু-ডু দল তৈরি করত এবং আনন্দ-উদ্দীপনার সঙ্গে বিভিন্ন দলে খেলার প্রতিযোগিতা হতো। গ্রামবাংলায় গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে ক্ষেতে ফসল বোনা এবং আগাছা উত্তোলনের পর বৈকালিক অবসরে যুবকেরা হা-ডু-ডু খেলায় মেতে উঠতো। সমবয়সী বালকেরা হা-ডু-ডু খেলায় আনন্দ পায়। প্রতিযোগিতামূলক এ খেলায় পুরস্কারের ব্যবস্থাও করা হয়।

৭. ডাংগুটি

সোয়া বা দেড় হাত লম্বা একচতুর্থাংশে খণ্ডিত একটি বাঁশের টুকরো এবং ছ'ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একটি বাঁশে কঞ্চি হলো ডাংগুটি খেলার মূল উপকরণ। বাঁশের খণ্ডাংশটিকো ডাং আর কঞ্চির খণ্ডাংশটিকে গুটি বলে। এ খেলাকে দেশের কোনো কোনো অঞ্চলে টেম-ডাং বা টেম খেলা বলে অভিহিত করা হয়। মাঠের একপ্রান্তে লম্বা ধরনের ছোটো একটি গর্ত খুঁড়ে তাতে কঞ্চির গুটিটি রাখা হয়—যাতে এর একটি মাথা একটু উপরের দিকে থাকে। এক পক্ষের একজন খেলোয়াড় ডাং দিয়ে সেই গুটির মাথায় হাল্‌কা আঘাত করে সেটি একটু ওপরের দিকে তোলে। গুটিটি শূন্যে থাকা অবস্থায় ডাং দিয়ে সেটিকে সজোরে আঘাত করে যতদূর পারা যায় নিতে চেষ্টা করে। খেলোয়াড় পর পর

www.pathagar.com

দু'বার একাজে অকৃতকার্য হলে সে আউট হয়। আর ডাং দিয়ে গুটিটি সজোরে আঘাত করে যত দূর নিতে পারে সেই দূরত্ব ডাং দিয়ে পরিমাপ করা হয়। আর গুটিটি শূন্যে থাকা অবস্থায় প্রতিপক্ষ দলের কেউ সেটিকে ধরতে পারলে খেলোয়াড় আউট হয়। এভাবে দু'পক্ষের খেলা হলে পয়েন্ট হিসাব করে হারজিৎ নির্ধারিত হয়। গ্রামবাংলার ডাংগুটি খেলার সঙ্গে আধুনিক বিদেশি ক্রিকেটের অনেক মিল রয়েছে। এ খেলাকে তাই ক্রিকেটের পূর্বপরুষ বলা যেতে পারে।

৮. গোল্লাছুট

প্রতিদলে ৫/৭ জন করে খেলোয়াড় নিয়ে দু'দলের মধ্যে গোল্লাছুট খেলা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামবাংলায় শিশু-কিশোরদের মধ্যে এ খেলা খুব জনপ্রিয়। ৩০/৪০ শতক পরিমাণ ছোটো মাঠ কিংবা গ্রামের বাড়ির পাশে ফসল-কাটা মাঠে গোল্লাছুট অনুষ্ঠিত হতে পারে। বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী সবাই মিলে এ খেলা খেলতে পারে। খেলার স্থানটির একপ্রান্তে ঠিক মাঝামাঝি স্থানে বৃত্তাকার একটি দাগকাটা অংশ থাকে। এটিকে বলা হয় গোল্লা। একপক্ষের দলপতি গোল্লার ভেতরে থেকে সঙ্গী খেলোয়াড়দের নিয়ে হাত ধরাধরি করে বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে ছুঁতে চেষ্টা করে। ছুঁতে পারলে সেই খেলোয়াড় আউট হয়। আর গোল্লাস্থ কোনো খেলোয়াড় যদি বিপক্ষের চোখ ফাঁকি দিয়ে দ্রুত দৌড়িয়ে মাঠের অপর প্রান্তে পৌঁছাতে পারে তবে দলের পয়েন্ট বাড়ে এবং আউট খেলোয়াড় পুনর্জীবিত হয়।

আর যদি বিপক্ষ দল তাকে ছুঁয়ে দিতে পারে তবে সে আউট হয়। এভাবে আউট এবং পুনর্জীবিত হতে হতে যখন গোল্লার দলপতি আউট হয় তখন বিপক্ষ দল গোল্লা দখল করে। এই ধারাবাহিকতায় চলতে থাকে গোল্লাছুট খেলা। এ খেলায় দৌড়ের ক্ষীপ্র গতিই মূলত হারজিতের মাপকাঠি। লিঙ্গ নির্বিশেষে গ্রামবাংলার শিশু-কিশোরেরা এখনও গোল্লাছুট খেলায় যথেষ্ট আনন্দলাভ করে।

৯. ঘুটি খেলা

গ্রামাঞ্চলে ও মফস্বলে এই খেলাটি খুবই জনপ্রিয় খেলাটি শুধু মাত্র মেয়ে শিশু ও কিশোরীরা খেলে থাকে। ঘুটি খেলার আঞ্চলিক নাম উচ্চাঘর বা একের তুলতা/ তুলতি। স্কুলে টিফিনের সময় ও বিকেল বেলা মেয়েরা গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে বসে এই ঘুটি খেলা পাঁচটি ঘুটি দিয়ে খেলা হয় বলে একে পাঁচ গুডি খেলা বলে।

এই খেলাটি সাধারণত ৩ বা ৪ জন খেলে থাকে। এটি এককভাবে বা জোড়ায় খেলা যায়। খেলা যে কোন একজন শুরু করে। ছড়া কেটে কেটে নিয়মানুযায়ী পুরো খেলা একজন শেষ করার পর অন্যজন শুরু করে। আর যদি একজনের ঘুটি চালতে ভুল হয়—এই যেমন, ঘুটি দাপার ভেতর চলে যায় বা অন্য ঘুটির সাথে টোকা লাগে বা ঘুটি হাত থেকে পড়ে যায়—তবে অন্যজনের দান চলে আগে। ঘুরে ঘুরে প্রথমজনের দান আবার আসে। এভাবে খেলা চলতে থাকে। যদি জোড়ায় খেলা হয়, তবে জুটির একজন যেখানে ভুল করে, অন্যজন সেখানে থেকেই শুরু করে। এই খেলাটি খেলে মেয়েরা খুব মজা পায়। ছড়াগুলোও সুন্দর এই যেমন :

www.pathagar.com

উচ্চাঘর একটু খানি
উচ্চাঘর দুটুক জানি
উচ্চাঘর তিনক টেকা
উচ্চাঘর চারক দানা
উচ্চাঘর পঞ্চে খানা

তেলে পাতা ক্যামিনী
তেল দুটুক যামনী
তেল তিন ছটেকা
তেল চারকে দানা
তেল পাঞ্চে খানা

এখানে এই ঘুটি খেলার আরো একটি প্রকার আছে—বাপটি। তবে বাপটি খেলার সময় ছড়া কাটতে হয় না। এখনো এই খেলাটি গ্রামে ও মফস্বলে খুব প্রচলিত। আরো কিছু ছড়া উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না। যেমন—

অবর দুকুনা এক
অবর দুকুনা দুই
অবর দুকুনা তিন
অবর দুকুনা চার
অবর দুকুনা পঞ্চ

আছোট দুকনা এক
আছোট দুকনা দুই
আছোট দুকনা তিন
আছোট দুকনা চার
আছোট দুকনা পঞ্চ

ফুল ফুল ফুলটি
যমুনা যমুনা যমুনাটি
কন্যা কন্যা কান্যাটি
পদ্মা পদ্মা পদ্মাটি
ফুল পঞ্চ যমুনা পঞ্চে কন্যা পঞ্চে
পদ্মা পঞ্চে উট্টা পঞ্চে

১০. কানামাছি ভোঁ ভোঁ

কানামাছি ভোঁ ভোঁ একটি জনপ্রিয় লোক খেলা। একে কানামাছি মউ মউ বা কানামাছি ও বলে। খেলাটি ছেলে ও মেয়ে সবাই মিলে একসাথে খেলা যায়। সাধারণত ৭ বা ৮ জন

www.pathagar.com

ছেলে মেয়ে একসাথে খেলে থাকে। এটি একটি মজার খেলা। শুরুতে টস করে ঠিক করে নিতে হয় প্রথমে কার চোখ বাঁধা হবে বা কে কানামাছি হবে। যে প্রথমে কানামাছি হয়, তার দু'চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দেয়া হয়। তারপর একজন কানামাছি চোখের সামনে একটা আঙুল উঁচিয়ে ধরে বলে কয়টা আঙুল বলো তো যদি বলতে না পারে তবে বুঝতে হবে কানামাছি কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এরপর শুরু হয় আসল খেলা। কানামাছির চারদিকে ঘুরতে থাকে সবাই—এক ঝাঁক মাছির মতো। কেউ তাকে হালকাভাবে ধাক্কা দেয়, কেউ দেয় গায়ে টোকা। আর মুখে কাটে মজার এই ছড়াটি—

কানামাছি ভোঁ ভোঁ
যাকে পাবি তাকে ছো।

আর হ্যাঁ কানামাছি নিয়মমতো এদিক ওদিক হাত বাড়িয়ে কাউকে ধরার চেষ্টা করে। সেও ছড়া কাটে—

আনি মানি জানি না
পরের ছেলে মানি না
আনি মানি জানি না
পরের মেয়ে মানি না।

এমনি করে চলতে চলতে হঠাৎ করে কানামাছি একজনকে ধরে ফেলবে। অমনি সে বলবে–মামা গো মামা, মাছ ধরছি। সবাই তখন জানতে চাইবে—কি মাছ? জব্বাবে কানামাছি যাকে ধরবে—তার নাম বলবে। এবার যার নাম বললো, তার চোখ বাঁধা হবে মানে সে কানামাছি হবে। আর সবাই কানামাছি ঘিরে আগের মতোই ঘুরতে থাকবে। মুখে সেই ছড়া। ছড়া কাটবে কানামাছি ও এভাবেই খেলা চলতে থাকবে। স্কুলে টিফিনের সময় বা স্কুল ছুটির পর বিকেলবেলা ছেলে-মেয়েরা কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলে খুব আনন্দ পায়। ইচ্ছে করলে তারা নতুন নতুন ছড়া তৈরি করেও কাটতে পারে।

১১. শালিক পাখি নমস্কার

গ্রাম ও মফস্বলের মেয়ে শিশু ও কিশোরীরা এই খেলাটি খেলে থাকে। এটি একটি আনন্দদায়ক খেলা। সাধারণত ৫ বা ৬ জন মিলে খেলাটি খেলে। প্রথমেই বুড়ি নির্বাচন। বুড়ি নির্বাচন করার পদ্ধতিটাও চমৎকার। সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একসাথে হাত উঁচু করে ফুলদানির মতো মেলে ধরবে। এরপর দ্রুত হাতের এপিঠ বা ওপিঠ মেলে ধরবে যারটা অন্যদের চেয়ে আলাদা হবে (হতে পারে এপিঠ ওপিঠ) সে তার হাতে চুমো খাবে তার মানে সে উঠে পড়লো (উট্টা)। এভাবে পর্যায়ক্রমে সবাই উঠে পড়ার পর যে একজন থাকবে, সেই বুড়ি হবে। বুড়ি পাখির ডানার মতো দুই হাত মেলে ধরে বসবে। আর বাকিরা একজন করে অঙ্গভঙ্গিসহ ছন্দময় বিভিন্ন ছড়া কাটতে কাটতে ডানার উপর দিয়ে ঘুরে আসবে। ছড়াগুলোও চমৎকার যেমন :

শালিক পাখি নমস্কার
পা দুটো তার পরিষ্কার
ভুয়া (ভ্রু) তার ভালো

www.pathagar.com

চুল তার কালো
নীল পাহাড়ে গিয়েছিলাম
চা পাতি এনেছিলাম
চা পাতির গন্ধে
বাঘের রক্ত
হরিণের শিং
বাইদার (বেদেরা) বাঁশি বাজায়
স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট

খেলার সময় বুড়ির ডানা সকল হাতে যার পা লাগবে সে বুড়ি হবে। তখন আগের বুড়ি খেলতে পারবে। এভাবে খেলা চলতে থাকবে। আরো একটি ছড়া উদ্ধৃত করছি :

পানির তলে কী?
বাচ্চা ফুটাইছি
বাচ্চার নাম কী?
আনি টুনি পাখি
বাচ্চার মা বাপ কই?
সুপারি বাগানে–
সুপারি বাগানে কী করে?
ডাররা ডাররা ফুল তুলে
ফুল তুইল্‌লা কী করে?
লাবনীর বিয়া ঠিক করে
লাবনীর বিয়া কোনদিন?
আইজ বাদে তিনদিন
যে বুড়ি হবে, তার বিয়ের কথাই বলতে হবে।

এই খেলায় আরো একটি মজার ব্যাপার হলো, কেউ অঙ্গভঙ্গিসহ পুরো ছড়া না জানলে ছড়াটির যত লাইন ততবার কিত কিত দম দেয়া যাবে। প্রয়োজনে দম ছাড়া যাবে। যেমন—

আমার নাম মিতা
চুলে পড়ি ফিতা
কানে পড়ি দুল
ভালোবাসি গোলাপ ফুল

ওই বাড়ির সেলিনা
তার সাথে খেলি না
তার সাথে আড়ি
যাই না তাদের বাড়ি
তাদের বাড়ি দোতলা
আমার বাড়ি নিচতলা

www.pathagar.com

মাগো তোমার পায়ে পড়ি
পুতুল নিয়ে খেলা করি
পুতুলের মাথায় কুকড়া চুল
বেদে বেদে (গুচ্ছ গুচ্ছ) গোলাপ ফুল
গোলাপ ফুলে পোকা
জামই বাবু বোকা
সেই জামাই ভালো না
পুতুলের বিয়ে দেব না'

এই ছড়াটি আঠারো লাইন, কেউ ছড়াটির আঠারো লাইন না জানলে কিন্তু দম দিবে। এখসে 'শালিক পাখি নমস্কার' খেলাটি মেয়ে শিশু ও কিশোরীরা স্কুলে টিফিনের সময় বা স্কুল ছুটির পর পড়ন্ত বিকেলে আনন্দের সাথে খেলে থাকে। আর হ্যাঁ, খেলাটির শিরোনামে আমাদের চিরায়ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের চিত্রই ফুটে উঠেছে।

১২. শব্দখেলা

শব্দখেলা একটি মজার খেলা। দুজন বা কয়েকজন মিলে এটি খেলা যায়। সাধারণত মেয়েরা খেলাটি খেলে থাকে। খেলার নিয়ম এরকম—প্রথমজন একটা শব্দ বলবে। যেমন : আম। দ্বিতীয় জন আম শব্দটা বলে–আমের শেষ বর্ণ–দিয়ে একটি শব্দ তৈরি করবে। যেমন, আম–মশা। তৃতীয় জন এ দুটো শব্দ বলার পর নতুন শব্দের শেষ বর্ণ দিয়ে আরেকটি নতুন শব্দ তৈরি করবে। এই যেমন, আম–মশা-শামুক। এভবে আবার প্রথম জনের পালা আসবে। সে বলবে—আম, মশা, শামুক, কলা। এরপর দ্বিতীয় জনের পালা। সে বলবে—আম, মশা, শামুক, কলা, লাউ, উট। আর এভাবেই চলতে থাকবে শব্দখেলা। এ যেন শব্দ দিয়ে শখের মালা তৈরি করা। তবে হ্যাঁ, শব্দমালার প্রতিটি শব্দ ধারাবাহিকভাবে বলতে হবে। কেউ না পারলে সে বা যাবে। তখন পরের জনের পালা আসবে। এভাবে এক এক জন ঝরে পড়ার পর শেষ জন বিজয়ী হবে। গ্রামে ও মফস্বলে মেয়েরা স্কুল বা কলেজে টিফিনের সময় কখনো মাঠে, কখনো বা কমনরুমে গোল হয়ে বসে শব্দখেলা খেলে। এ খেলা ওদের অনেক আনন্দ দেয়ার পাশাপাশি শব্দ ভাণ্ডারও পড়ার বৈকি। এছাড়া বিকেল বা সন্ধেবেলা আড্ডার এক ফাঁকে শব্দখেলা কিশোরী ও তরুণীদের প্রচুর আনন্দ দেয়।

১৩. দাড়িয়াবান্দা

গ্রামবাংলার অন্যতম জনপ্রিয় খেলা দাড়িয়াবান্দা। এ খেলায় কোনো বড়ো মাঠের প্রয়োজন হয় না। বাড়ির উঠোন কিংবা পার্শ্ববর্তী বীজতলাতে ছক কেটে দাড়িয়াবান্দা খেলা যায়। দু'পক্ষের এ খেলায় প্রতি পক্ষে ৫জন করে খেলোয়াড় থাকে। খেলার স্থানে লম্বা এবং চতুর্ভুজাকৃতি ৫টি ঘর কাটা হয়। মাঝখানে একটি সরু পথ থাকে। প্রত্যেক ঘরের সরু পথে এক পক্ষের ৫জন খেলোয়াড় পরপর দাঁড়ায়। অন্য পক্ষের খেলোয়াড়রা দণ্ডায়মান পাহারাদার খেলোয়াড়ের স্পর্শ এড়িয়ে ছককাটা ঘরে প্রবেশ করতে চায়। এভাবে পরপর

www.pathagar.com

পাঁচটি ছক স্পর্শবিহীনভাবে সবাই পার হতে পারলে সে দলের জিৎ হয়। আর যে খেলোয়াড় স্পর্শিত হয় সে আউট হয় এবং দলের সবাই আউট দলে সে দলের খেলোয়াড়রা হয় পাহরাদার খেলোয়াড়।

১৪. মোরগ লড়াই

জানা যায়, মোগল আমল থেকে বাংলার বিশেষ-বিশেষ অঞ্চলে মোরগের লড়াই প্রচলিত। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-কুমিল্লা অঞ্চলে পাওয়া যায় এক বিশেষ প্রজাতির মোরগ। এর নাম হাঁসলি মোরগ। যোদ্ধা-মোরগ হিসেবে এর সমাদর সারাদেশে। এ মোরগগুলো দেখতে বেশ উঁচু এবং লম্বাটে গলার। এরকম একটি যোদ্ধা মোরগ ঐ অঞ্চলে ১৫/২০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। জাতীয়, লোকজ এবং ধর্মীয় উৎসবের বিশেষ দিনে এরকম হাঁসলি মোরগের লড়াই অনুষ্ঠিত হয়। এই যোদ্ধা-মোরগের নখগুলো ব্লেড দিয়ে তীক্ষ্ণ করে দেওয়া হয়। কখনোবা তাদের পায়ে ছোটো চাকুও বেঁধে দেওয়া হয়। তারপর কোন ছোটো মাঠ বা প্রাঙ্গণে দু'টি মোরগকে ছেড়ে দেওয়া হয় লড়াইয়ের জন্য। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মোরগ রক্তাক্ত হয়ে পরাজিত না হয় ততক্ষণ এ লড়াই চলে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল অঞ্চলে মোরগের লড়াই খুব জনপ্রিয়।

১৫. নৌকাবাইচ

নদীমাতৃক বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলের অন্যতম জনপ্রিয় খেলা নৌকা বাইচ। বিশেষত ভাটি অঞ্চলের গ্রামবাংলায় সামাজিক সাংস্কৃতি, ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসবে নৌকাবাইচের অনুষ্ঠান হয়।

নৌকা বাইচ

www.pathagar.com

ভাটি অঞ্চলের অবস্থাপন্ন কৃষক পরিবারে সাধারণত বাইচের নৌকা থাকে। গ্রাম জীবনে সেটি আভিজাত্যের লক্ষণ হিসেবেও গণ্য করা হয়। বাংলার ভাটি অঞ্চলের প্রধান যানবাহন নৌকা। বছরের প্রায় ছ'মাস এ সব অঞ্চল জলমগ্ন থাকায় একমাত্র নৌকাই তাদের বাহন। তাই ধনী-দরিদ্র সবার বাড়িতেই থাকে ছোটো-বড়ো একটি হলেও নৌকা। বর্ষাকালে ভাটি অঞ্চলে বছরের দীর্ঘ সময় খেলাধুলার তেমন সুযোগ না থাকায় অবসর সময়ে গ্রামের তরুণ-যুবকরা সমবেতভাবে নৌকা দৌড়িয়ে আনন্দলাভ করে। কালক্রমে তাই প্রতিযোগিতামূলক নৌকা বাইচের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। বর্ষা ও শরৎকালের আষাঢ়-শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে নৌকাবাইচ অনুষ্ঠিত হয়। ৪০/৭০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৬/৭ ফুট প্রস্থের লম্বাটে ধরনের নৌকাই বাইচের জন্য উপযুক্ত। এ ধরনের দ্রুতগামী নৌকাকে রঙিন করে সাজিয়ে প্রতিযোগিতায় আনা হয়। এতে একজন মাঝি পেছনে দণ্ডায়মান থাকে এবং একই পোশাকধারী বৈঠাচালক থাকে ২৫/৫০ জন। বাজনার তালে-তালে দ্রুতলয়ে বৈঠা চালনা করা হয়। লোকজ দেবী মনসাপূজা এবং ভাসানগানের সঙ্গেও নৌকাবাইচের সম্পর্ক লক্ষ করা যায়।

নৌকা বাইচ

www.pathagar.com

লোকপেশাজীবী গ্রুপ

নানান ধরনের বৃত্তিকে কেন্দ্র করে নানান লোক পেশাজীবী সৃষ্টি হয়েছে। কৃষি জীবনের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে ঐতিহ্যবাহী পেশাজীবীদেরও ভূমিকা অনন্য। কৃষিক্ষেত্র ছাড়াও গার্হস্থ্য জীবনে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র লোক পরম্পরাগতভাবে তৈরি করে আসছেন বিভিন্ন পেশাজীবী। এক্ষেত্রে কামার, কুমার, তাঁতী, ছুতার প্রভৃতি পেশাজীবীর নাম উল্লেখযোগ্য। শেরপুর অঞ্চলেও রয়েছে ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন পেশার মানুষ।

১. কামার

প্রাচীনকালে কৃষিকাজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গভূমিতে কামার পেশার উৎপত্তি হয়। হিন্দু সমাজের মধ্যে আবির্ভাব ঘটে লোহার কারিগর বা কর্মকার শ্রেণির। ঐতিহ্যবাহী কৃষিকাজ, সেচকাজ, গৃহস্থালি ও গৃহায়নের সাথে কামারদের অস্তিত্ব জড়িয়ে আছে।

নালিতাবাড়িতেও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা কামার পেশায় নিয়োজিত আছেন। নালিতাবাড়ি বাজারে বা নির্দিষ্ট পাড়ায় রয়েছে কামার পাড়া। যেমন– তারাগঞ্জ দক্ষিণ বাজারের কামার পট্টিতে কামাররা বসবাস করেন। এছাড়া আড়াইআনী বাজারেও কামার বসতি ছিল। বর্তমানে এই পেশায় মুসলমানদেরকেও দেখা যায়।

কামারগণ পেশাগতভাবে কৃষিকাজ, সেচকাজ, গৃহায়ণ ও গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত লোহাজাত দ্রব্যসামগ্রি তৈরি করে থাকেন। তাদের প্রস্তুতকৃত গৃহস্থালি ও গৃহায়ণ সামগ্রির মধ্যে– দা, বটি, কুড়াল, শাবল, পেরেক, চাকু, ছুড়ি, হাতুড়ি, ছেনি, কুড়ানী, চিমটি, হাতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আর কৃষিকাজ ও সেচকাজে ব্যবহৃত সামগ্রির মধ্যে রয়েছে– কোদাল, লাঙ্গলের ফলা, কাচি, নিড়ানি, খুন্তি, বেদেকাটি ইত্যাদি। কামারদের দেবতা বিশ্বকর্মা, যাকে ভাদ্রমাসের শেষ দিনে মিষ্টান্ন, চিড়াগুড়, ফুলফল, চন্দনের বাটা রস, গাঁদাফুল, কাপড় ও রূপার অলংকার দিয়ে পূজা-অর্চনা করা হয়। ঐদিন তাদের প্রস্তুতকৃত সামগ্রিকেও উপাসনা করা হয়। এমনকি ওই পূজা-অর্চনার দিন তারা তাদের পেশাগত কাজও বন্ধ রাখেন। মহিলারা অনন্তা, সাবিত্রি, শশী, পঞ্চমী ইত্যাদি ব্রত পালন এবং নিস্তারিনী ও মঙ্গল চণ্ডীর কাহিনি পরিবেশন করেন। কামাররা শূদ্র হলেও সমাজে অস্পৃশ্য নন। নালিতাবাড়িতে তারা তাদের এই ঐতিহ্যবাহী পেশা ও সংস্কৃতি নিয়ে সবার সাথে মিলে মিশে বসবাস করছেন। তারা তাদের তৈরিকৃত সামগ্রি নিয়ে বৈশাখি, চৈত্র সংক্রান্তি ও কৃষি মেলায়ও অংশগ্রহণ করেন।

কামার বা লোহার কারিগরদের কয়লার আগুনে লোহা পোড়ানো, লোহা পেটানোর ছন্দময় শব্দ, পোড়া লোহা থেকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ, লোহা দিয়ে নানা জিনিসপত্র বানানো এ যেন কামারপট্টির সাধারণ দৃশ্যপট, আর এই সাধারণ দৃশ্যপট-ই অসাধারণ মাত্রায় মনে করিয়ে দেয় আমাদের সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের কথা, মনে করিয়ে দেয় আমরা বাঙালি।

www.pathagar.com

কামার ভুবন কর্মকার কর্মরত

কামার ভুবন কর্মকারের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করছেন সংগ্রাহক কোহিনূর রুমা

www.pathagar.com

তারাগঞ্জ দক্ষিণ বাজারের কামারপট্টি। ঐতিহ্যবাহী কামারপাড়া। এখানে তৈরি করা হয়, আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যবাহী লোহার বিভিন্ন সামগ্রি যা গৃহস্থালি ও কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে আমাদের এই প্রাচীন শিল্পের অবস্থা কেমন, অপরদিকে এই শিল্পীদের অবস্থাই বা কেমন তা জানার জন্য একজন কামার শিল্পীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে, সেটি নিচে তুলে ধরা হলো :

সংগ্রাহক : আপনার নাম কি?

ভুবন কর্মকার : আমার নাম ভুবন কর্মকার।

সংগ্রাহক: আপনার বাবার নাম কি?

ভুবন কর্মকার: হরিমোহন কর্মকার।

সংগ্রাহক : আপনার মায়ের নাম কি?

ভুবন কর্মকার : সন্ধ্যা রাণী কর্মকার।

সংগ্রাহক : আপনার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা?

ভুবন কর্মকার : আমার বর্তমান ঠিকানা মহল্লা- তারাগঞ্জ দক্ষিণ বাজার (কামারপট্টি) ওয়ার্ড নং-৪, পৌরসভা: নালিতাবাড়ি, ডাকগর ও উপজেলা : নালিতাবাড়ি, জেলা: শেরপুর। এবং এটিই আমার স্থায়ী ঠিকানা।

সংগ্রাহক : আপনার পূর্বপুরুষের ভিটা কোথায়?

ভুবন কর্মকার : আমার পূর্বপুরুষের ভিটা নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায়। আমার দাদা এক সময় নালিতাবাড়ি চলে আসে।

সংগ্রাহক : আপনার বয়স কত?

ভুবন কর্মকার : পঁয়তাল্লিশ বছর।

সংগ্রাহক : আপনি কোন পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন?

ভুবন কর্মকার : অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত।

সংগ্রাহক : আপনি কামার পেশায় কিভাবে এলেন?

ভুবন কর্মকার : বাবা, বড়ো ভাই কামার পেশার মানুষ। দাদাও ওই পেশায় ছিলেন। বাবাকে, বড়ো ভাইকে কাজ করতে দেখেছি, দেখতে দেখতে শিখেছি, কাজটার প্রতিও আস্তে আস্তে ভালোলাগা জন্মেছে, পরে আমিও এই পেশায় এসেছি। বলতে পারেন বংশানুক্রমেই আমি এ পেশায় এসেছি।

সংগ্রাহক : কবে থেকে এই পেশায় আছেন?

ভুবন কর্মকার : ছোটো বেলা থেকে এই পেশায় আছি। ত্রিশ বছর তো হবেই।

সংগ্রাহক : আপনার কাজের অনুপ্রেরণা কে?

ভুবন কর্মকার : আমার বাবা, আমার দাদা (বড়ো ভাই)। বাবা, দাদাকে দেখেই আমি এই পেশায় আসার অনুপ্রেরণা পেয়েছি।

সংগ্রাহক : এই কাজ কার কাছ থেকে শিখেছেন?

ভুবন কর্মকার : আমার বাবার কাছ থেকে শিখেছি। বাবা বলতেন- এটা কর, ওটা কর, দেখিয়েও দিতেন, আর এভাবেই শিখেছি। এছাড়া শুরুতেই বললাম না, দেখতে দেখতেই শিখেছি।

www.pathagar.com

সংগ্রাহক : আপনার পরিবারের আর কেউ এই পেশায় আছেন কি না?

ভুবন কর্মকার : আমাদের যৌথ পরিবার। বাবার বয়স হয়েছে, বাবা এখন অবসরে আছেন। আমি, আমার বড়ো দুই ভাই, আমরা এই পেশায় আছি। আমাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করছে।

সংগ্রাহক : আপনার ছেলেমেয়ে ক'জন?

ভুবন কর্মকার : আমার এক ছেলে এক মেয়ে।

সংগ্রাহক : আপনার ছেলে মেয়েরা কে কোন ক্লাসে পড়ে?

ভুবন কর্মকার : ছেলেটা প্লে-তে পড়ে আর মেয়েটা নার্সারিতে।

সংগ্রাহক : আপনার পূর্ব পুরুষের আর কেউ একাজ করতেন কিনা?

ভুবন কর্মকার : হ্যাঁ, করতেন। আমার বাবা, ঠাকুর দাদা, বড়ো বাপ-সবাই এই পেশায় ছিলেন।

সংগ্রাহক : আপনি কি এই কাজটি ব্যবসায়িকভাবে করছেন?

ভুবন কর্মকার : হ্যাঁ, ব্যবসায়িক ভাবেই করছি। এই কাজ করেই আমি জীবন-জীবিকা নির্বাহ করি।

সংগ্রাহক : মাসে কেমন আয় হয় আপনার?

ভুবন কর্মকার : পনের থেকে বিশ হাজার টাকা মাসে আয় হয়। কিন্তু এর থেকে লোহা, কয়লা, রাত হাতুড়িসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতির খরচ, কারিগরের বেতন বাদ দিলে বেশি কিছু থাকে না। এক কথায় এ পেশায় এখন পোষায় না। সংসারের ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে।

সংগ্রাহক : আপনার কাজের ধরন বা পদ্ধতি কী?

ভুবন কর্মকার : আগে একটি লোহা নিয়ে হাওয়া মেশিনের সাহায্যে আগুনে পুড়িয়ে লোহা নমনীয় করতে হয়। এরপর হাতুড়ি দিয়ে লোহা পিটিয়ে পিটিয়ে সাইজ করা হয়। সাইজ করার পর র‍্যাত বা শান মেশিন দিয়ে ধার করতে হয়। এবং এরপর আবার আগুনে পোড়ানোর পর ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে ট্যাম্পার করতে হয়। এভাবেই আমরা লোহার বিভিন্ন সামগ্রি তৈরি করি।

সংগ্রাহক : একটি সামাগ্রি তৈরি করতে কী কী উপকরণ/ সরঞ্জাম লাগে?

ভুবন কর্মকার : এই যে বললাম, তারপরও আপনি জানতে চাইছেন, লোহা, কয়লা, রাত বা শান মেশিন, হাতুড়ি, হাওয়া মেশিন, পানি—এইসব লাগে।

সংগ্রাহক : আধুনিক কী কী সরঞ্জাম উপকরণ এখন ব্যবহৃত হচ্ছে?

ভুবন কর্মকার : আধুনিক যন্ত্রপাতির ভেতর হাওয়া মেশিন, শান মেশিন এগুলো আসছে। এতে অবশ্য কাজ একটু সহজ হয়েছে, সুবিধা বেড়েছে, পরিশ্রমও একটু কম হয়।

সংগ্রাহক : হাওয়া মেশিন, শান মেশিনের সুবিধাটা কেমন?

ভুবন কর্মকার : হাওয়া মেশিন হওয়াতে সুবিধা হচ্ছে– এটা কারেন্টে চলে। আগে যখন এই হাওয়া মেশিন ছিল না, তখন আরেক জনের ভাতি টানতে হতো। আর শান মেশিন আসাতে– দা, কাচি, ধার দেয়া যায়। এটাও কারেন্টে চলে। আগে রাত দিয়ে

www.pathagar.com

ঘষে ধার করতে হতো। যদিও আমরা এখনো রাত ব্যবহার করি এতে কাজ বেশি মসৃণ সুন্দর হয়।

সংগ্রাহক : একটি দা কাচি তৈরি করতে কত সময় লাগে?

ভুবন কর্মকার : একটা দা তৈরি করতে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা সময় লাগে। এর একটি কাচি তৈরি করতে ১ ঘণ্টা সময় লাগে। আসলে জিনিসের উপর সময়টা নির্ভর করে।

সংগ্রাহক : একটা দা বা কাচি তৈরি করতে কত মজুরি পান?

ভুবন কর্মকার : আসলে কাজের ধরন অনুযায়ী মজুরি পাই। একটা দা তৈরি করে তিন থেকে চার শ' টাকা, আর একটা কাচি তৈরি করে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা পাই।

সংগ্রাহক : এতে সংসার চলে?

ভুবন কর্মকার : হ্যাঁ চলে। তবে পরিশ্রম অনুযায়ী মজুরি কম। মজুরি আরো ভালো পেলে আরো ভালো চলতো। জানেনই তো সংসারের খরচ এখন কতো বেড়ে গেছে।

সংগ্রাহক : বর্তমানে এর চাহিদা কেমন?

ভুবন কর্মকার : এখনো লোহার জিনিসের চাহিদা আছে। চাহিদা ভালো, তবে আমাদের ব্যবসাটা সিজনাল। এই যেমন, ধান কাটার সময় কাচির চাহিদা বেশি। আবার কোরবানীর ঈদের সময়-দা, চাকু, ছুড়ির চাহিদা বেড়ে যায়। আর দা, কুড়াল, শাবল, বটি-এগুলো সারা বছরই কম-বেশি চলে। সারা বছরই কম-বেশি বেচাকেনা হয়।

সংগ্রাহক : আমাদের শেরপুরের এইসব পণ্য সামগ্রির বৈশিষ্ট্য কী?

ভুবন কর্মকার : আমাদের লোহার সামগ্রিগুলো উন্নত মানের হয়। অন্য জেলা বা উপজেলা থেকে মান অনেক ভালো হয়।

সংগ্রাহক : অন্যান্য এলাকা থেকে এইসব লোহার সামগ্রির পার্থক্য কী?

ভুবন কর্মকার : অন্যান্য এলাকার সাথে আমাদের কাজের পার্থক্য হচ্ছে, আমাদের কাজের ফিনিশিং ভালো, সাইজ ভালো, তাই চাহিদাও বেশি। নালিতাবাড়িতে প্রাচীনকাল থেকেই এই কাজ হচ্ছে, আমরা বংশানুক্রমিকভাবে এই কাজ করছি, আমাদের রক্তে মিশে আছে এই কাজ, আমাদের অভিজ্ঞতা বেশি, আর তাই আমদের কাজও বেশি ভালো, মানসম্মত হয়। একজন এসে হুট করে, এই পেশা ধরলে আমাদের মতো ভালো করতে পারবে না– এটাই স্বাভাবিক।

সংগ্রাহক : এই পেশা ও আপনাদের বর্তমান অবস্থা কেমন?

ভুবন কর্মকার : এই পেশার ও আমাদের অবস্থা ভালো। সরকার যদি এই খাতে বিনিয়োগ করেন, তবে ঐতিহ্যবাহী এই পেশার আরো প্রসার ঘটবে। এছাড়া বেসরকারি বিনিয়োগকারীরাও যদি এগিয়ে আসেন, তবে এই খাত আরো সমৃদ্ধ হবে। আসলে এটা তো একটা শিল্প, এই শিল্পের ইতিহাস - ঐ তিহ্য ধরে রাখার জন্য সবাইকে আরো সচেতন হতে হবে। এই শিল্প বাঁচলেই আমরা মানে শিল্পীরা বাঁচবো, আমাদের জীবন আরো সুন্দর-স্বচ্ছল হবে।

সংগ্রাহক : আচ্ছা বর্তমানে স্টিলেব ছুড়ি, চাকু, পাওয়া যায় এটা কি এই শিল্পের উপর কোন প্রভাব ফেলছে?

www.pathagar.com

ভুবন কর্মকার : কিছুটা প্রভাব তো পড়বেই। তারপরও লোহার জিনিসের চাহিদাই আলাদা। স্টিল-স্টিলই, লোহা-লোহাই।

সংগ্রাহক : আগের দা/ কাচির সাথে সাথে এখনকার দা/কাচির পার্থক্য কী?

ভুবন কর্মকার : বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। গুণগত মানেরও বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। আগে আমরা যেভাবে বানাতাম, এখনও ওভাবেই বানাই, কাজেই পার্থক্য থাকার কোন সুযোগ নেই।

সংগ্রাহক : আপনাদের তৈরিকৃত জিনিসগুলো মূলত কী কাজে লাগে?

ভুবন কর্মকার : মূলত গৃহস্থালি ও কৃষিকাজে লাগে। এছাড়া গৃহায়ণের কাজেও লাগে।

সংগ্রাহক : আপনার কি ধারণা এই পেশা টিকে থাকবে?

ভুবন কর্মকার : হ্যাঁ, টিকে থাকবে। কারণ, এইসব সামগ্রি কোন মেশিনের সাহায্যে তৈরি করা যাবে না, আমাদের মতো কারিগর দিয়েই তৈরি করতে হবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, দা, কুড়াল, কাচি, এগুলো তো গৃহস্থালির কাজে, কৃষিকাজে লাগবেই।

সংগ্রাহক : আপনার ভবিষৎ পরিকল্পনা কী?

ভুবন কর্মকার : আমরা বংশানুক্রমেই কাজ করে যাচ্ছি, জীবন-জীবিকার জন্য কাজ করতে হবে। বিশেষ কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই। তবে এই পেশার আরো প্রসার ঘটলে, সরকার এই ঐতিহ্যপূর্ণ পেশার দিকে সুদৃষ্টি দিলে, এই পেশার একজন মানুষ হিসেবে আরো খুশি হবো, আমাদের জীবনমান আরো সুন্দর-সমৃদ্ধ হবে।

সংগ্রাহক : আর আপনার স্বপ্নের কথা যদি বলি?

ভুবন কর্মকার : স্বপ্ন, যতদিন এই পেশায় আছি– ততদিন যেন মন-প্রাণ ঢেলে কাজ করতে পারি, স্বপ্ন বলতে এটুকুই; আমি যেন আমার দেশমাতার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে জড়ানো এই পেশার যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা বজায় রাখতে পারি। আর হ্যাঁ, আধুনিক যন্ত্রপাতির চেয়ে ওই আগের মতো হাতে কাজ করলে কাজের মান বেশি ভালো হয়। আধুনিক যন্ত্রপাতিতে অতো মানসম্মত কাজ হয় না। তাই স্বপ্ন দেখি,সবাই যেনো আধুনিক যন্ত্রপাতি নির্ভর না হয়ে আমাদের এই পেশার ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ধরে রাখেন।

সংগ্রাহক : আপনি কী একজন শিল্পী হিসেবে জীবনে তৃপ্ত?

ভুবন কর্মকার : হ্যাঁ, তৃপ্ত। তবে, মানুষ যখন ওভাবে মূল্যায়ণ করে না, তখন খুব কষ্ট পাই।

সংগ্রাহক : আপনি কি এই কাজে আপনার উত্তরসূরি কাউকে রেখে যেতে চান?

ভুবন কর্মকার : না, চাই না।

সংগ্রাহক : কেন?

ভুবন কর্মকার : কারণ, সময় বদলে গেছে। এই পেশায় পরিশ্রম অনুযায়ি মজুরি অনেক কম, মাসিক আয় অনেক কম। এতে সুন্দর-সচ্ছলভাবে চলা যায় না। এছাড়া

www.pathagar.com

সামাজিক মর্যাদাও কম মানে একজন সৃজনশীল মানুষ হিসেবে ন্যায্য মর্যাদাটা আমরা পাই না। সমাজ ওভাবে মূল্যায়ন করে না বা করতে শিখেনি।[১]

২. তাঁতি

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে সব কিছুই অন্যদের থেকে আলাদা এবং স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অনন্য। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে তারা তাদের সকল প্রকার ব্যবহার্য পণ্য সামগ্রী নিজেরা উৎপাদন করে তা ব্যবহার করে থাকে। তাদের মুখের ভাষা, বসবাসের ধরন, খাদ্যাভাস, রীতি-নীতি, বিশ্বাস মূল্যবোধ এবং পোশাক পরিচ্ছদ একে অন্যের থেকে আলাদা। শেরপুর জেলায় কয়েকটি আদিবাসীদের মধ্যে কোচ জনগোষ্ঠীর লোকেরা শ্রীবরদী, ঝিনাইগাতী, এবং নালিতাবাড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী পাহাড়ি গ্রামসমূহে বসবাস করে থাকে। এর মধ্যে এখন শুধু ঝিনাইগাতীর রাংটিয়া গ্রামেই নিজস্ব তাঁতের প্রচলন দেখা যায়। এক সময়ে প্রতিটি ঘরে ঘরে কাপড় বুননের তাঁত থাকলেও সময়ের স্রোতে তা হারিয়ে গেছে। বার বার রাজনৈতিক অশান্তির জন্যে দেশ ত্যাগের কারণে নিজস্ব তাঁতের প্রচলন কমে গেছে বলে মনে করেন শ্রীবরদী উপজেলার বাবেলাকোনা গ্রামের বর্ষীয়াণ ব্যক্তি শ্রী বৈদ্যনাথ কোচ। কারণ সেই সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে কিছু সুবিধাভোগী মানুষেরা তাদের চোখের সামনে তাদের ব্যবহার্য তৈজসপত্রসহ অস্থাবর সম্পত্তি লুটপাট করে নিয়ে যেত বলে জানান তিনি। এছাড়াও সিনথেটিক কাপড়ের বহুল ব্যবহার, সহজ লভ্যতা এবং তাঁতে ব্যবহৃত সুতার উচ্চ মূল্য তাঁত ব্যবহারকারীদের নিরুৎসাহিত করার আরেক কারণ বলে মনে করেন, রাংটিয়া গ্রামের তরুণ সমাজকর্মী ও গবেষক যুগল কিশোর কোচ। এতো কিছুর পরও রাংটিয়া গ্রামে দু'একজনে ধরে রেখেছে নিজস্ব তাঁতে লেপেন বুনার কাজ। 'লেপেন' কোচ মহিলাদের পরনের কাপড়ের নাম। এক সময়ে তারা সবাই নিজস্ব তাঁতে লেপেন বুনত। কিন্তু এখন ১. কষ্টমনি কোচ (৪৫) স্বামী মাখন কোচ এবং ২. নাগনাই কোচ (৫০) স্বামী খুদিরাম কোচ এই দু'জনেই কাপড় বুনার কাজটি ধরে রেখেছেন। নতুন প্রজন্মদের মাঝে এ কাজ জানা লোক নেই বললেই চলে। তবে অর্পনা কোচ (২৫) মাঝে মধ্যে বুনে থাকেন। কোচরা তাঁতকে 'বানা' বলে থাকেন। তাদের ভাষায় কাপড়কে 'ছকা' বলা হয় এবং সুতাকে 'খুনটিং'। নাগনাই কোচ বলেন আগে কার্পাস তুলা দিয়ে নিজেরাই সুতা তৈরি করতেন তারা। রংও নিজেরাই বানাতেন। এখন জুম চাষ নেই এবং উঁচু ভূমিতে তুলাচাষও আর হয় না। তাছাড়া তুলা উৎপাদনে কেউ আর উৎসাহিত হয় না তাই নিজস্ব সুতা তৈরি অনেক আগে থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে। বাজার থেকে মোটা সুতা কিনে এনে চড়কায় ঘুরিয়ে তা নাথাইয়ে গুটি পেঁচানো হয়। একেক রঙের সুতা আলাদা করে নাথাইয়ে গুটি করে রাখে। নানা রঙের সুতা সারিবদ্ধভাবে তাঁতে সাজিয়ে বুননের কাজ করেন। তাতে তৈরিকৃত লেপেন হয়ে উঠে রং বেরং-এর। খুব যত্ন করে বুনা হয় কাপড়। একেকটি লেপেন বুনতে ৮/১০ দিন সময় লাগে। আর এই একটি লেপেন বিক্রি হয় সাত শ' থেকে আট শ' টাকায়। তাতে সুতা কিনা, শ্রমের মজুরি সব মিলিয়ে পোষায় না

www.pathagar.com

তাদের। তাঁত দিয়ে পরনের লেপেন ছাড়াও গামছা, বিছানা চাদর, ওড়না বুনা হয়। গামছা দেড় থেকে দুইদিন সময় লাগে। আর বিছানা চাদর বহর অনুসারে ১০/১২ দিন সময় লাগে। কিন্তু সমস্যা একটাই। উৎপাদন খরচ পরে যায় অনেক বেশি। এর চেয়ে বাজারে অনেক কম দামে প্রিন্ট করা সুন্দর সুন্দর কাপড় খুব সহজেই পাওয়া যায়। তাই নিজস্ব তাঁতের তৈরি করা কাপড়ের চাহিদা কমে গেছে বলে জানান কষ্টমনি কোচ। অন্যদিকে এই তাঁতে সারা বছর কাপড় বুনাও যায় না। বর্ষা মৌসুমে কাজ বন্ধ রাখতে হয়। কারন তখন রোদ থাকে না। অন্যদিকে উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া এবং উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য কম থাকায় পেশা হিসাবে কাজ করাও সম্ভব হচ্ছে না। রাংটিয়া গ্রামে বেরসকারী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ডভিশন বাংলাদেশ ঝিনাইগাতী এ.ডি.পি. গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৭টি আধুনিক তাঁত দিয়েছে। কিন্তু তাতে বুননের মান ভাল হয় না। নিজস্ব তাঁতে তৈরিকৃত পণ্য যেমন মজবুত হয় আধুনক তাঁতে হয় না। তাই আধুনিক তাঁতে বুনন সময় একটু কম লাগলেও এর চাহিদা কম থাকে বলে জানান তাঁতিরা।

নিজস্ব তাঁতের তৈরি পণ্যের চাহিদা থাকলেও উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বেশি থাকায় কম স্বভাব সুলভভাবেই সহজ প্রাপ্য এবং কম মূল্যের পণ্যের দিকে ঝুঁকছে তারা। এক্ষেত্রে গারোদের তৈরিকৃত দকশাড়ি ব্যবহার করছেন অনেকে। একটি দকশাড়ি দুই থেকে আড়াই শ' টাকায় পাওয়া যায় এবং বুনন ও কাপড়ের বৈশিষ্ট্য প্রায় সমান বলে মানিয়েও যায় বেশ। নিজেদের তৈরি করা লেপেন উৎসবের সময়েই বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে এখন।

তথ্যনির্দেশ :

১. মো. আব্দুর রউফ, ব্যবসায়ী, তারাগঞ্জ দক্ষিণ বাজার, নালিতাবাড়ি, শেরপুর, তারিখ : ২৪.১০.২০১২, সময় : সন্ধ্যা ৬.৩০ মি.

www.pathagar.com

ধাঁধা

লোকসংস্কৃতির ধারায় ধাঁধা বিশেষ স্থান দখল করে আছে, গ্রামীণ জীবনের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে। ধাঁধার ভেতর যেমন থাকে রহস্য, তেমনি রহস্যবোধ। রহস্যভেদ করতে পারলেই সৃষ্টি হয় রসের। এক সময় জীবনের গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে অর্থাৎ প্রাসঙ্গিকক্রমে ধাঁধার খুব ব্যবহার ছিল।

সংগৃহীত ধাঁধা

১.

মোল্লা বাড়ির ঘুড়া (ঘোড়া)
এক বিয়ানেই বুড়া।
উত্তর : কলাগাছ।

২.

উপরে মাংস ভিতরে চামড়া।
উত্তর : মুরগির গিলা।

৩.

ছোট লোকে খেলে ছোট লজ্জা পায়,
বড় লোকে খেলে বড় লজ্জা পায়
আমি যে খেয়েছিলাম, আমার বাড়ির ধারে
এই কথার মানে কি, বলো তো আমারে।
উত্তর : আছাড় খাওয়া।

৪.

চারদিকে কাঁচ দিয়ে ঢাকা
মধ্যেখানে লাল টকটকা।
উত্তর : হারিকেন।

৫.

নালিতাবাড়ির হাটে দেখলাম
দুই মায়ের পেটে এক সন্তান।
উত্তর : দরোজার কপাট।[১]

৬.

আগে হইল মিয়া ভাই, পরে হইল মা।
ভাইবা চিন্তা আমি হইলাম, বাবা হইল না।

www.pathagar.com

উত্তর : স্বাক্ষর।

৭

রন্ধনের আগে সদা আমি গ্য হই
সকল শহরে আছি আমি, কলিকাতায় নই।
উত্তর : 'র'।

৮.

সুন্দর রমণী এক অতি চমৎকার
অলঙ্কার পরে থাকে পেটের ভেতর
জীবনে নাহি তার নারীর অহংকার
চাঁদ সূর্যের সাথে করে ব্যবহার
মাঝে মাঝে উপপতির আলাপ পাইয়া
মিষ্টি সুরে গান গায় বাদ্য বাজাইয়া।
উত্তর : দেয়াল ঘড়ি।

৯.

এলে নাই পানি, বিলে নাই পানি
গাছের আগালে (আগায়) পানি।
উত্তর : ডাব।

১০.

আল্লাহর কী কাম
এক ঘরে এক খাম।
উত্তর : ছাতা।

১১.

উপরে শক্ত ভিতরে পেক
বুদ্দি (বুদ্ধি) থাকলে খুইদ্ (খুঁড়ে) দেখ।
উত্তর : বেল।

১২.

ঢেউ এর উপরে ঢেউ
তার উপরে বইসা (বসে) আছে
লাট সাহেবের বউ।
উত্তর : শাপলা।

১৩.

সাগরেতে জন্ম আমার থাকি সবার ঘরে
একটু পানির ছোঁয়া লাগলে যাব আমি মরে।
উত্তর : লবণ।

১৪.

এক গাছ টান দিলে বেল গাছ নড়ে

www.pathagar.com

কুকুরে ডাক দিলে সমুদ্র নড়ে।
উত্তর : ভূমিকম্প।[২]

১৫.
এটটুজলা (একটু খানি) শিশু দুত (দুধ) ভাত খায়
বড় বড় গাছের লগে (সাথে) যুদ্দ (যুদ্ধ) করতে যায়।
উত্তর : কুড়ার।

১৬.
উঠান ঠনঠন বাটত বাড়ি
কোন মাইনসের (মানুষের) পুটকিত দাঁড়ি।
উত্তর : পেঁয়াজ।[৩]

১৬.
এক থাল (থালা) সুপারি
গণতে (গুনতে) পারে কোন বেপারি।
উত্তর : তারা।

১৭.
আয় ছেলেরা পাহাড়ে যাই
লাল লাল গুড (গোল ফল) খাই
গুডা আছে, বডা (বোঁটা) নাই।
উত্তর : ডিম।

১৮.
আশি টেকার (টাকার) খাসি
লেংগুর (লেজ) ধইরা ঠাসি।
উত্তর : কল/টিউবওয়েল।[৪]

১৯.
নানী একটা কাপড় দিলো
ভিজাইতে পারলাম না, পারলামই না।
উত্তর : কচুপাতা।

২০.
চার কালি (কোন) দিয়া মনকাডা (মনকাঁটা)
মাঝখানে বুড়া বেডা (প্রবীণ ব্যক্তি)
বুড়া বেডার মাতা (মাথা) ফাডা (ফাটা)।
উত্তর : আনারস।

২১.
ওককুতা গুজা, খুদে মাডি (মাটি)
দশ ঠ্যাং (পা), তিন পুটকি।
উত্তর : হাল বাওয়া।[৫]

www.pathagar.com

২২.

এক বাড়ি যাইয়া দেহি (দেখি) উলু বনে ছানি
আরেক বাড়ি যাইয়া দেহি গাছের আগায় পানি ।
উত্তর : ডাব ।

২৩.

আল্লাহর কী কুদরত
লাডি (লাঠি) মইধ্যে (মধ্যে) শরবত ।
উত্তর : আখ বা ইক্ষু ।

২৪.

ধরনার উপরে ধরনা (ঘরের সিলিং দেয়া হয় যেই কাঠের উপর)
সেই ধরনায় বসে আছে রূপসী এক কন্যা ।
উত্তর : কবুতর ।

২৫.

নদীর পাড়ে বুবি গাছ বুবি বুবি করে
একটা পাতা ছিড়লে আল্লাহ বিচার করে ।
উত্তর : কোরআন শরীফ ।

২৬.

ওততুজলা (একটুখানি) জন্তুটা দুত (দুধ ভাত খায় ।
চিপি মারলে সমুদ্দুয় (সমুদ্র) যায় ।
উত্তর : টর্চ লাইট ।[৬]

২৭.

দুই আর দুইয়ে কখন পাঁচ হয় ।
উত্তর : যখন ভুল হয় ।

২৮.

তুমি থাকো ডালে ডালে, আমি থাকি খালে বিলে
তোমার আমার দেখা হবে মরনের কালে ।
উত্তর : মরিচ ও মাছ ।[৭]

২৮.

গাঙ্গের (গাঙ) পাড়ে মরিচগাছ
টোকা মারলে সর্বনাশ ।
উত্তর : মৌমাছির বাসা ।

২৯.

আল্লাহর কী কাহিনি
গাছের আগায় পুস্কুনি (পুকুর) ।
উত্তর : ডাব ।

৩০.

ছুটো (ছোট) কালে কাপড় পরে

www.pathagar.com

বড় হইলে নেংটা থাকে।
উত্তর : কলাগাছ।

৩১.

খস খইসসা (খসখসে) গাছের ডগাইগ্গা (ডগডগে) ফুল
তারি (তারই গন্ধে রাজা জমিদার ব্যাক্কুল (ব্যাকুল)।
উত্তর : আনারস।

৩২.

এক আছিল লাল ঘোড়া, সব কিছু খায়
পানি খেলে মারা যায়।
উত্তর : আগুন।[৮]

৩৩.

ঘরের নিচে ঘর
তার নিচে বসে আছে কন্যা ও বর'
উত্তর : মশারী।

৩৪.

এক কুড়ি দুই জেলে
দুই দিকে জাল ফেলে
জালে যদি মাছ ওঠে
কেউ হাসে, কেউ কাঁদে।
উত্তর : ফুটবল খেলা।[৯]

৩৫.

নাগর আলী সাগর আলী উপর টঙ্গী (টঙ)
তিন বইনে (বোন) এক রঙ্গী (রঙের)।
উত্তর : টিকটিকি, কুমির, গুঁই সাপ।

ব্যাখ্যা : এখানে নাগর আলী মানে গুঁই সাপ, সাগর আলী মানে কুমির আর উপর টঙ্গী মানে টিকটিকি।

৩৬.

উড়ে পাখি, মারে তাও
গোশত হারাম, বিষটা খাও।
উত্তর : মাছি।

৩৭.

নীল বরণ ছয় চরণ
দুই চরণে বসে।
উত্তর : মাছি।

৩৮.

গাছটা গজারী, পাতাটা ইলিশা

www.pathagar.com

ধরে কামরাঙা, পরে কালিজিরা।
উত্তর : তিলগাছ।

৩৯.
এলি বাড়ি তেলি ঘর ঘর দিখালি খাম
খামের উপর পুস্কুনি (পুকুর) বিদ্যায় ধরে নাম।
উত্তর : নারিকেল।

৪০.
কিন্‌না আনলাম কাডের (কাঠের) গাই
বিনা টানে দুধ পানাই।
উত্তর : খেঁজুর গাছ।

৪১.
মাইট মটকী ছেডেল
তিন পুটকি, দশ ঠ্যাং।
উত্তর : দুধ পানানো।[১০]

৪২.
হাতির দাঁত, ময়ূরের পাখ (পাখা)
এই শোল্‌লক যে না ভাঙ্গাইতে পারবো
সেই হইল গাধার জাত'
উত্তর : মূলা।

৪৩.
নানী গো বাসায় গেলাম
নানী আমারে দেইখা
দরোজা আটকাইয়া দিলো।
উত্তর : শামুক।

৪৪.
দাদী একটা শাড়ি দিলো
পড়তে পারলাম না, পারলামই না।
উত্তর : রাস্তা।[১১]

৪৫.
সব চিলের আছে ঠ্যাং
কোন চিলের নাই ঠ্যাং।
উত্তর : পাচিল।

৪৬.
বন থেকে বাইরইলো (বেরুল) ভূতি
ভূতি বলে, তোর পাতে মুতি (প্রস্রাব করি)।
উত্তর : লেবু।

www.pathagar.com

৪৭.

কোন দেশে জল নেই।
উত্তর : সন্দেশ।

৪৮.

এক হাড়ি জলে
মাছ কিলবিল করে।
উত্তর : ভাত রান্না করা।

৪৯.

মাছ ধরে পাখি লাল নয়
বলো সে পাখি কারে কয়।
উত্তর : মাছ রাঙা।[১২]

৫০.

তিন অক্ষরে নাম মোর, সবাই খেতে ভালোবাসে
প্রথম অক্ষর দিলে বাদ, খেলতে সবাই ভালোবাসে।
উত্তর : বাতাস।

৫১.

বন থেকে বাইরেইলো (বেরুল) টিয়ে
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।
উত্তর : আনারস।

৫২.

ভেবে চিন্তে বলো ভাই
কোন গ্রামে মানুষ নাই।
উত্তর : টেলিগ্রাম।

৫৩.

না মিললে হবে না
ভেবে চিন্তে বলো না।
উত্তর : হিসাব।[১৩]

৫৪.

কোন বাচ্চার মা নাই।
উত্তর : চৌবাচ্চা।

৫৫.

ঘরেতে আছে সোনা, তবু গয়না হবে না।
উত্তর : লক্ষ্মীসোনা।

৫৬.

সেই জিনিসটা কারে কয়
যার আছে সে ভীরু নয়।

www.pathagar.com

উত্তর : সাহস।

৫৭.

বলো দেখি আন্ত
চোখ মেইললা ঘুমায় কোন জন্তু।
উত্তর : মাছ।

৫৮.

চশামার থাকে
তলোয়ারেরও থাকে।
উত্তর : খাপ।

৫৯.

দুই বার বলুন দাম
ঝরবে দেদার ঘাম।
উত্তর : দরদর।[১৪]

৬০.

শস্য থাকে যাতে
কামান মুখর হয় তাতে।
উত্তর : গোলা।

৬১.

বলো দেখি কোন পাখি
ফুলের নামে ডাকি।
উত্তর : বক।

৬২.

তিন অক্ষরে নাম মোর, সবাই ভালোবাসে
আমায় নিয়ে কেউবা কাঁদে, কেউবা হাসে।
উত্তর : জীবন।

৬৩.

কাটবে যত বাড়বে তত, হবে নাকো ক্ষয়
এমন বস্তু কী আছে, বলো দেখি হয়।
উত্তর : খানা/ কূয়া।

৬৪.

চার অক্ষরে নাম মোর, কলকাতাতে রই
শেষের দুটো দিলে বাদ, বলো দেখি গাছের উপর রই।
উত্তর : তালতলা।[১৫]

৬৫.

বাবা দেয় একবার
মা দেয় বারবার।

www.pathagar.com

উত্তর : সিঁদুর।

৬৬.

তিন অক্ষরে নাম তার জলে বাস করে
মাঝের অক্ষর কেটে দিলে, নারী অঙ্গে পরে।
উত্তর : হাঙর।

৬৭.

হাঁটে গুড়ি গুড়ি
ছাঁটে শুধু মাটি।
উত্তর : চাষী ও হাল।

৬৮.

সাগরে জন্ম নগরে বসতি
মাকে ছুঁলে যায় মরে
আল্লাহর কী কেরামতি।
উত্তর : লবণ।

৬৯.

চার অক্ষরে নাম মোর, বিছানাতে রই
প্রথম দুটি ছেড়ে দিলে, যেথা সেথা রই।
উত্তর : ছারপোকা।

৭০.

উড়লেও পাখি নয়
বলো দেখি কারে কয়।
উত্তর : চামচিকে।[১৬]

৭১.

কমর (কোমর) ধইরা শুআইয়া দেও
কাজ যা করার কইরা নেও
ধুইয়া মুইছা তুইলা দেও।
উত্তর : শিলপাটা।

৭২.

কোন গাছে মাল আছে।
উত্তর : তমাল।

৭৩.

তুমি আমার মনের মানুষ সব কিছু দিতে পারি
তবে কিন্তু তোমায় দেইখা ঐ ডা (ঐটা) দিতে নারি।
উত্তর : ঘোমটা।

৭৪.

কোন বস্তু আছে এ দরায় (ধরায়)

www.pathagar.com

না চাইলেও সবাই পায়।
উত্তর : মৃত্যু।

৭৫.

এক গাছে বহু ফল, গায়ে কাড়া কাড়া (কাঁটাকাঁটা)
পাকলে ছাড়াও যদি, হাতে লাগে আড়া (আঠা)।
উত্তর : কাঁঠাল।[১৭]

৭৬.

তিন অক্ষরে নাম মোর নারী চোখে রাখে
প্রথমটা দিলে বাদ সবাই ঘরে রাখে।
উত্তর : কাজল।

৭৭.

শিবের নামে পাখি
নামটা কী বলো দেখি।
উত্তর : নীলকণ্ঠ।

৭৮.

স্বর্গেতে করে বাস, কোন সে সুন্দরী
তার নাম বাজারেতে পাবে ঝুড়ি ঝুড়ি।
উত্তর : রম্ভা।[১৮]

৭৯.

তিন অক্ষরে নাম মোর, রান্না ঘরে থাকি
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে, ঐ খানেই থাকি।
উত্তর : উনুন।

৮০.

চার অক্ষরে নাম তার ছিল অভিনেত্রী
প্রথম দুই অক্ষর মুছে দিলে, হাতে পরে কর্ত্রী
শেষ দুই অক্ষর দিলে বাদ, মিষ্টি পাবে দিনরাতি।
উত্তর : মধুবালা।

৮১.

কোথাও নাই জল
গাছেল আজলায় (অঞ্জলি) জল।
উত্তর : ডাব।

৮২.

দুই অক্ষরে কোন বস্তু
যেথায় সেথায় শোভা বাড়ায়
কেউ বা তাতে ঘর সাজায়
আবার লাগে দেবের পূজায়।

www.pathagar.com

উত্তর : ফুল ।[১৯]

৮৩.

তিন অক্ষরে নাম তার, থাকে বহু দূরে
প্রথম অক্ষর দিলে বাদ, থাকে নদী তীরে ।
উত্তর : আকাশ ।

৮৪.

পাঁচ অক্ষরে নাম তার, মন্ত্র এক কবি
শেষের তিন অক্ষর দিলে বাদ, মৌচাকেতে পাবি ।
উত্তর : মধুসূদন ।

৮৫.

না খাইলে মুটা (মোটা)
খাইলে শুঠা (চিকন) ।
উত্তর : কলা ।

৮৬.

আড়াত থেইক্আ (জঙ্গল থেকে) আনলাম ভুইত্তা
ভুইত্তা দিল পাতে মুইত্তা ।
উত্তর : লেবু ।

৮৭.

মানুষ কোন কাজে পিছায়?'
উত্তর : ঘর লেপা ।

৮৮.

তিন জনে ধরে একজনে করে
শেষ পযন্ত (পর্যন্ত) ফেনা তুইল্লা (তুলে) ছাড়ে ।
উত্তর : চুলায় ভাত রান্না করা ।[২০]

৮৯.

দুই অক্ষরে নাম তার কোথাও বা নামের শেষে বসে
সাগরের বুকে কখনো বা বাতাসেতে ভাসে ।
উত্তর : পাল ।

৯০.

একটু খানি গাছে
রাঙ্গা (রাঙা) বউটি নাচে ।
উত্তর : মরিচ ।

৯১.

আন্ধা কূয়ার চান্দা মাছ
ফুল ফুটে বার মাস ।
উত্তর : নক্ষত্র ।

www.pathagar.com

৯২.

আন্দা আন্দা আন্দা চার পুকুরের কান্দা
সাপটা রইল গর্তের মধ্যে লেজটা রইল বান্ধ্যা (বাঁধা)।
উত্তর : জাল।

৯৩.

জন্ম দিল পরে
যখন শিশু জন্ম নিল
মা ছিল না ঘরে।
উত্তর : কচ্ছপের ডিম।

৯৪.

তিন অক্ষরে নাম তার, বিরাট জিনিস হয়
মধ্যের অক্ষর বাদ দিলে, জমিতে দেয়।
উত্তর : সাগর।[২১]

৯৫.

ঘরের পিছে মেনা (বোকা) গাই
বারে বারে দুয়াবার (দুধ পানানো) যাই।
উত্তর বাইর/বুচিনা। (বাঁশের তৈরি মাছ ধরার এক প্রকার যন্ত্র)।

৯৬.

এক গিলাসে দুইজাত পানি
আল্লাহরে আমি ওস্তাদ মানি।
উত্তর : ডিম।

৯৭.

আইল পাখি ঝন ঝানাইয়া
বইল পাখি পাখ (পাখা) উড়াইয়া।
উত্তর : তোড়া/ উড়া জাল।

৯৮.

দুই অক্ষরে নাম মোর, আমি একটা ফল
আমার নামে আছে কিন্তু, গুন্দে (গন্ধে) ভরা ফুল।
উত্তর : বেল।[২২]

৯৯.

চার অক্ষরে নাম তার, সেটা একটা পাখি
শেষের দুইটা দিলে বাদ, বাবার ভাইকে ডাকি।
উত্তর : কাকাতুয়া।

১০০.

ঘরের মধ্যে ঘর, তার ভিতরে মানুষ
সারা রাত পড়ে থাকে, নাই কোন হুশ।

www.pathagar.com

উত্তর : মশারী ।

১০১.

চার অক্ষরে নাম তার, দোকানে পাবে
শেষের দুই অক্ষর দিলে বাদ, লেখার জিনিস হবে
প্রথম দুই অক্ষর বাদ দিলে, দেরী বুঝাবে ।
উত্তর : চকলেট ।

১০২.

পা পিষ্ঠ (পিঠ) মাথাটি কুড়ি আঙ্গুল নাকটি
চোখ আছে, কান আছে মুখ নাই (নাভি) ।
উত্তর : মানুষ ।[২৩]

১০৩.

চার অক্ষরে নাম তার, সবাই বলে পাখি
শেষের দুই অক্ষর দিলে বাদ মরুভূমিতে থাকি
প্রথম দুই অক্ষর বাদ দিলে, সত্যিকারের পাখি ।
উত্তর : উটপাখি ।

১০৪.

বলো মিতা
চোখের জন্যে কোন লতা ।
উত্তর : কাজল লতা ।

১০৫.

চার অক্ষরে নাম তার, তীর্থভূমি হয়
প্রথম দুই অক্ষর দিলে বাদ, সব ঘরেতে রয়
শেষের দুই অক্ষর বাদ দিলে, দেবতা বুঝায় ।
উত্তর : হরিদ্বার ।[২৪]

১০৬.

তিন অক্ষরে নাম মোর, ফুল হয়ে রই
প্রথম অক্ষর বাদ দিলে নিয়ম হই
মাঝের অক্ষর দিলে বাদ উপাধি হই
শেষের দুই অক্ষর বাদ দিলে, সব মানুষের সঙ্গে রই ।
উত্তর : পারুল ।

১০৭.

তিন অক্ষরে নাম তারা, জলে দেখা যাবে
মাঝের অক্ষর বাদ দিলে, মাচায় পাবে
প্রথম অক্ষর দিলে বাদ, বোবা হয়ে যাবে ।
উত্তর : শামুক ।

১০৮.

অস্থির উপরে পস্থির বাসা জল দেখিলাম তাতে

www.pathagar.com

চার পায়ে নিল ডালে কও কন্যা বিবরণ
ইন্দুর (ইঁদুর) যে বিলাই (বিড়াল) মারল কী কারণ'

উত্তর বা ব্যাখ্যা : মাকড়শার জালে শিশির পড়েছে, যা এখানে বলা হয়েছে; আর তার উপর পতঙ্গ বা পোকা বসে আছে। মহিষ পানিতে গা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, (চার পা মহিষের), তার গায়ে উপর পুঁটি মাছ নাচছে (মাছের পা নেই), মাছটাকে পাখি (দুই পা পাখির), গাছের ডালে নিয়ে যায়। এদিকে মাটির হাঁড়িতে করে দই শিকায় রাখা, অজ্খি এখানে মাকড়শার জাল, আর পজ্খি পতঙ্গ বা পোকা বোঝানো হয়েছে।[২৫]

১০৯.

এক হাত দড়ি
ঘর সুন্দা (পুরো ঘর) বেড়ি।
উত্তর : বাতি।

১১০.

খেত ধলা, বিছুন (বীজ) কালা
রাও নাই, জবান ভাল।
উত্তর : কোরআন শরীফ।

১১১.

কাডের লাঙ্গল, বাঁশের ফাল
কোন বেডা (বুড়া) যায় ষোল হাল।
উত্তর : বিন্দা। বিন্দা–আউশ ধানের ক্ষেতে ঘাস নষ্ট করার জন্যে বাঁশের যে চোখা যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

১১২.

আড়ানে তনে বাইরইলো (বেরুল) বুড়ি
চোখ তার আঠার কুড়ি।
উত্তর : আনারস।

১১৩.

ঘর আছে, দরজা নাই
মানুষ আছ, রাও (কথা) নাই।
উত্তর : কবর।[২৬]

১১৪.

রাঙ্গা বউ হাটে যায়
দাপ্পুর দুপ্পুর থাপ্পুর খায়।
উত্তর : মাটির পাতিল বা কলসি।

১১৫.

ছুড (ছোট) বেলায় কাপড় পরে
বড় হইলে নেংটা থাকে।
উত্তর : বাঁশ গাছ।

www.pathagar.com

১১৬.
সবুজ মিয়া হাটে যায়, যাইয়া চিমটি খায়।
উত্তর : লাউ।[২৭]

১১৭.
ছাই এ লুটোপুটো, দুই কান বোচা
চৈত্রি মাসে খাইছি আমি পল'র খোঁচা
তিন মাস ছিলাম আমি চিলের ঠোঁটে
ত্রিভুবন দেইখা আইছি, বড়শির খুঁটে।
উত্তর : মাছ। পল–মাছ ধরার এক প্রকার যন্ত্র।

১১৮.
উড়িতে ঝুম ঝুম, পরিতে নূপুর
হাত নাই, পাও নাই
চৌদ্দ হাত নেংগুর (লেজ)।
উত্তর : জাল।

১১৯.
বৃন্দাবনে আসিল এক আশ্চর্য বেদ
ছয় মাসের কইন্যা নয় মাসের পেট
বাপ হাঁটে, জেঠা পেটে, খুড়া কথা কয়
সেই সময় কেবল কইন্যার বচ্ছর পুরা হয়।
উত্তর : ধান। খুড়া—আধো আধো কথা।

১২০
কাডের (কাঠের) বলদ, গোস্তের শিং
চলছে বলদ গাদলার (বর্ষার) দিন।
উত্তর : শামুক।

১২১.
উপরে টমটম, নগরে বাসা
আঁধারে যে ছাও (বাচ্চা) খায়, এই কোন দশা।
উত্তর বা ব্যাখ্যা : চিল খাওয়ার জন্য সাপ নেয়, আর সাপ আঁধারে ঐ চিলের বাচ্চা খেয়ে ফেলে। এখানে 'উপরে টমটম' দিয়ে চিল উপরে থাকে, আর 'নগরে বাস' দিয়ে সাপ এর বাসা বোঝানো হয়েছে।

১২২.
চার অক্ষরে নাম মোর আমি একটি ফল
রংটি মোর কালা (কালো) এমনি ফল কী আছে, বলো দেখি দাদা।
উত্তর : জমরুল।[২৮]

১২৩.
তিন অক্ষরে নাম তার
হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবাই খায় ঘরে

www.pathagar.com

প্রথম অক্ষর বাদ দিরে মহিলারা ব্যবহার করে।
উত্তর : খিচুড়ি

১২৪.
লম্বায় লম্বা ধরে
লম্বায় মরা ধরে
মরায় জ্যাতা ধরে।
উত্তর : বড়শি/ ছিপ দিয়ে মাছ ধরা।

১২৫.
বাটির উপর বাটি
তারে খালি চাটি।
উত্তর: চালতা।

১২৬.
কি টানলে কমে।
উত্তর : বিড়ি/সিগারেট।

১২৭.
কাগজে আছে, কলমে আছে, কলিকাতায় আছে
পৃথিবীর নাই'
উত্তর : 'ক'।

১২৮.
একটা মাথা দুইটা ঠ্যাং (পা)
দুই হাত লম্বা নাকটা
বুক পিঠ নাই (নাভী)।
উত্তর : মানুষ।[২৯]

১২৯.
মরায় জ্যাতা খায়
পেডে (পেটে) ধড়ফরায়।
উত্তর : বাইর। ব্যাখ্যা: মাছা ধরার বাইর পেতে রাখার পর উপরে তুললে ভেতরের মাছগুলো লাফালাফি করে। তখন মনে হয় যেন বাইরের পেটে মাছগুলো ধড়ফর করছে। বাইর মরা অর্থে, আর মাছ (জীবিত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩০.
উইড়া (উড়ে) যায়রে পশু পঙ্খি
জুইরা (জুড়ে) ধরে বিল
সোনার কটরা, রূপার খিল।
উত্তর : বিশাল জাল।

১৩১.
উড়িতে ঝনঝন, পড়িতে ঠাণ্ডা

www.pathagar.com

কোনে পাখির লেংগুরে (লেজে) বান্দা (বাঁধা)।
উত্তর : উড়া জাল।

১৩২.

আষ্ট পাও (পা), ষোল আডু (হাঁটু)
মাছ মারবার যায় নিমাই ঠাড়ু
শুকনাত পাতিয়া জাল
মাছ মাইরা খায় চিরকাল।
উত্তর : মাকড়সার জাল।

১৩৩.

ইততুজলা (একটুখানি) পাখি নিম পাতা খায়
সাত শ' আড়া (জঙ্গল) ভাইঙ্গা নাড়াই (লড়াই) করতে যায়।
উত্তর : কুড়াল।

১৩৪.

পেঁচি হাঁসে ডিম পাড়ে
কে কেমন গুণতে পারে।
উত্তর : তারা।

১৩৫.

ঐ বেডা যদু
তোর কইনচার মইধধে (মধ্যে) মধু।
উত্তর: আখ/ ইক্ষু।

১৩৬.

এক শালিকের তিন মাথা
সেই শালিক থাহে (থাকে) ঢাহা (ঢাকা), কলিকাতা।
উত্তর : চুলা।

১৩৭.

হুড়াহুড়ি পাড়াপাড়ি বড় ঘরের মইধধে
লড়লড়া ছাইড়া দিলাম থথথরার মইধধে'
উত্তর : লুছনি দিয়ে ঘর লেপা। লুছনি হলো ন্যাকড়া।

১৩৮.

উড (উঠানো এমন) গরুর পিডে (পিঠে) কান
কোন গরুর চাইর (চার) কান।
উত্তর : ঘর।

ব্যাখ্যা : চাইর কান বলতে ঘরের চার কোণা বুঝানো হয়েছে। আর পিড বলতে ঘরের চালকে বুঝানো হয়েছে।

১৩৯.

মামা গো ঘরের পাছে

www.pathagar.com

ঘাড় ভাঙ্গা বলদে নাচে।
উত্তর : কলাগাছ।

ব্যাখ্যা : ঘরের পিছে কলা গাছ; কলার ছড়ি নামানোর পর ঘাড় ভাঙ্গা হয়ে যায় যেন কলা গাছ।

১৪০.

অন্ধে রইছে ধন্ধে লাইগগা
বইরাগি (বৈরাগী) রইছে চাইয়া
গাছের ফলগাছে থুইয়া
রস পড়ে বাইয়া (বেয়ে)।
উত্তর : খেজুরের রস।

১৪১.

গাছের তলে পড়ল তাল
দৌড় দিয়া গেল দুই মাল
যে দৌড় দিয়া গেল
হি (সে) ধরলো না।
ধরলো আরেক জনে
যে ধরলো হি খাইল না
খাইল আরেক জনে
যে খাইল হেরে (তারে) মারল না
মারল আরেক জনরে
যারে মারল হি কানল (কান্না) না
কানল আরেক জনে।

উত্তর ও ব্যাখ্যা : দুই পা গেল, দুই হাত ধরল; মুখে খাইল, মারল পিঠে আর কাঁদল চোখ।[৩০]

১৪২.

আসছে যত আসবে তত আরো আসবে আধের আধ (অর্ধেক)
এক আসবে যখন 'শ' পুরবে (পূর্ণ হবে) তখন।
উত্তর : ৪৪+৪৪+১১+১=১০০।

১৪৩.

আট পা ও ষোল হাটু
বইসা রইছে মনিকণ্ঠ বাবু
শুকনার মধ্যে পাতছে জাল
মাছ খাবে চিরকাল।
উত্তর : মাকড়সা।

১৪৪.

গেলাম দৌড়ে দৌড়ে
আইলাম ধীরে ধীরে

www.pathagar.com

যাদুমণি থুইয়া আইলাম
নমুনার চরে।
উত্তর : পায়খানা।

১৪৫.

কাঁকনের কন ছাড়া
পাঠানের পান ছাড়া
লবঙ্গের বঙ্গ ছাড়া
কিনে আন, যা।
উত্তর : কাঁঠাল।

১৪৬.

তিন অক্ষরের নাম তার জলে বাস করে
মধ্যে অক্ষর বাদ দিলে আত্মীয়ের নাম ধরে
শেষের অক্ষর বাদ দিলে ভয়ে প্রাণ কাঁপে।
উত্তর : শাপলা।

১৪৭.

দই মায়ের পেটে এক সন্তান।
উত্তর : দরজার কপাট (খিল)[৩১]

১৪৮.

দিলে ফাঁক করে
না দিলে রাগ করে।
উত্তর : ফকিরের ঝোলা।

১৪৯.

হাত আছে পা নাই, গলা আছে মাথা নাই
আনাম (পুরো) মানুষ গিইললা খায়।
উত্তর : শার্ট/ পাঞ্জাবী।

১৫০.

খায় না, লয় না
বোঝা ছাড়া যায় না।
উত্তর : জুতা।

১৫১.

ওলে ঝুলে
ফালদা উডে কুলে (কোলে)।
উত্তর : কলসি।

১৫২.

ভিতরে সাদা, উপরে হলুদ।
উত্তর : ডিম।

www.pathagar.com

১৫৩.
কোথায় বর আছে, কনে নাই ।
উত্তর : সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, ডিসেম্বর ।
১৫৪.
তরি হরি হরি উপর হরি শোভা পায়
হরিকে দেখিয়া হরি হরিকে লুকায় ।
উত্তর : সাপ, পউদের পাতা ও ব্যাঙ ।[৩২]
১৫৫.
বুক দিয়া খায়, বুক দিয়াই হাগে ।
উত্তর : রাম দা
১৫৬.
দেখি গিয়ে বাবুনের হাটে
এক ছেলে দুই মায়ের পেটে ।
উত্তর : দরজার খিল বা কপাট ।
১৫৭.
এক ভাই পাহাড় এক ভাই শহর
আরেক ভাই টঙ টঙ তিন ভাই এক রঙ ।
উত্তর : গুঁইসাপ, কুমীর, টিকটিকি ।
১৫৮.
এক ভাই পাহাড় এই ভাই শহর
আরেক ভাই টঙ টঙ
তিন ভাই মিলে এক রঙ ।
উত্তর : পান, সুপারি, চুন ।
১৫৯.
হাতখানি টিপটাপ, মুখখানি কলো
পরতে পারলে ভালো ।
উত্তর : চুড়ি ।[৩৩]
১৬০.
আইল দোস্ত খাওয়াইলাম গোস্ত
রান্দনীর রাধুনীর গুনে যার গোস্ত খাইল, দোস্ত সেই রইল বনে ।
উত্তর : গরু ।
১৬১.
আছে ফল, গাছে নাই
খাইলে ফলের চুচা (কোসা) নাই ।
উত্তর : মুরগীর গিলা ।
১৬২.
খালে নাই পানি, বিলে নাই পানি

www.pathagar.com

গাছের আগালে পানি।
উত্তর : ডাব।[৩৪]

১৬৩.

দুল দুল দুলুনি বেলার খুলনি
পাকলে সুন্দরী হয় নেংটা হইয়া হাটে যায়।
উত্তর : তেঁতুল।

১৬৪.

ছোট ছোট ছেলে পিলে
ভাঙ্গা ঘরে থাকে আগুনের তাপ পাইলে
ফালাইয়া ফালাইয়া নাচে।
উত্তর : মুড়ি বা খই।

১৬৫.

কাশন্ডের শণ্ড চাড়া পাঠার ছাড়া পা
লবঙ্গের বঙ্গ ছাড়া কিনে আন, তা।
উত্তর : কাঁঠাল।

১৬৬.

থালি ঝনঝন, থালি ঝনঝন থালি নিল চুরে (চোর)
সারা দুনিয়ায় আগুন লাগলে কে নিভাইতে পারে।
উত্তর : রোদ।

১৬৭.

মামায় দিল সবুজ শাড়ি
জল দিয়া ভিজাইতে না পারি।
উত্তর : কচুপাতা।

১৬৮.

ঝাপের উপরে ঝাপ
তার ভিতরে কাইললা জিরা সাপ।
উত্তর : উকুন।

১৬৯.

কান্দার উপরে কান্দা
মুচার বাড়ি বান্ধা।
উত্তর : কলা।

১৭০.

ঢাকার ঘাস সাদা কেন
টাঙ্গাইলে মানুষ মরে কেন।
উত্তর : ঘাস ঢেকে রাখলে সাদা হয়ে যায়, আর ফাঁস দিলে মানুষ মরে যায়।

১৭১.

গাছের নাম জগপিতা

www.pathagar.com

এক ডালে এক পাতা।
উত্তর : কচুপাতা।

১৭২.
পাখি নয় উড়ে চলে মুখ নেই ডাকে
বুক ফেটে আলো ছুটে কান ফাটে তার হাঁকে।
উত্তর : বিদ্যুৎ চমকানো ও বজ্রপাত।

১৭৩.
জীবনে দাদা দেয় একবার
বউদি দেয় বারবার।
উত্তর : সিঁদুর।

১৭৪.
ছোট খাট পঙ্খি-খান
নিমপাতা খায়
বড় বড় গাছের লগে
নাড়াই (লড়াই) করবার যায়।
উত্তর : কুড়াল।

১৭৫.
যা ভাবছো তা না
ছেলে কিন্তু আমার না
ছেলের বাপ যার শ্বশুর
তার বাপ আমার শ্বশুর।
উত্তর : ছেলেটি সম্পর্কে মেয়েটির ভাই।[৩৫]

রাহেলা খাতুনের কাছ থেকে ধাঁধা সংগ্রহ করছেন সংগ্রাহক কোহিনূর রুমা

www.pathagar.com

তথ্যনির্দেশ

১. সুপ্তা আক্তার, বয়স : ২৫ বছর, গ্রাম : বালাকান্দা, ইউনিয়ন : যোগানিয়া, নালিতাবাড়ি, সংগ্রহের তারিখ : ০১.১২.২০১১, সময় : বিকাল ৫টা
২. মনিরা, বয়সঃ ৫০ বছর, গ্রাম : চকপাড়া, নালিতাবাড়ি, সংগ্রহের তারিখ : ০২.১২.২০১১, সময় : সন্ধ্যা ৬টা
৩. আমেনা বেগম, বয়স : ৪৫ গ্রাম : রাণীগাঁও, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ০৩.১২.২০১১ সময় : সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিট
৪. সোনিয়া আক্তার, বয়স : ২২ বছর, গ্রাম : নিচপাড়া, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ০৩.১২.২০১১ সময় : রাত ৮টা
৫. লাকি আক্তার বয়স : ২০ বছর, আম বাগান, নালিতাবাড়ি, তারিখ ০৪.১২.২০১১ সময় : রাত ৭টা
৬. অরনিকা মোকরেজ, বয়স : ৩০ বছর, গ্রাম : গোবিন্দনগর, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ০৫.১২.২০১১, সময় : রাত ৭ টা
৭. আফরোজা রুসা, বয়স : ২৫ বছর, তারাগঞ্জ দক্ষিণ বাজার, নালিতাবড়ি, তারিখ : ৫.১২.২০১১, সময় : রাত ১১টা
৮. রামিসা আনজুম নীলা, বয়স : ২০ বছর, মহল্লা : নালিতবাড়ি বাজার, নালিতাবাড়ি, তারিখ ৬.১২.২০১১, সময় : রাত ৮টা
৯. মাহ্‌মুদুল হাসান, বয়স : ৩২ বছর, তারাগ দক্ষিণ বাজার, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ৭.১২.২০১২, সময় : সন্ধ্যা ৬ টা
১০. ফরিদা ইয়াছমিন, বয়স : ৪৫ বছর, আমবাগান, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ৬.১২.২০১১, সময় : সন্ধ্যা ৬ টা
১১. নাজমা বেগম বয়স : ৩৫ বছর, আমবাগান, নালিতাবাড়ি, তারিখ ৭.১২.২০১১, সময় : সন্ধ্যা ৬ টা ৩০ মিনিট
১২. রফিকুল ইসলাম রাজীব, বয়স : ২৯ বছর, তারাগঞ্জ দক্ষিণ বাজার, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ৫.১২.২০১১, সময় : রাত ৮টা
১৩. ছুরাইয়া ইয়াছমিন, বয়স : ২৮ বছর, গ্রাম : গেড়ামারা, ইউনিয়ন : যোগানিয়া, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ০১.১২.২০১১, সময় : সন্ধ্যা ৬ টা৩০ মিনিট
১৪. ফিরোজ আল-মামুন, বয়স : ৩৫ বছর, গ্রাম : গেড়ামারা, ইউনিয়ন : যোগানিয়া, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ০৮.১২.২০১১, সময় : বিকাল ৫টা
১৫. আল মামুন, বয়স : ৩০ বছর, গ্রাম : গোবিন্দনগর, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ৫.১২.২০১১, সময় : সন্ধ্যা ৬টা
১৬. শাহানা সুলতানা লাভলী, বয়স : ২৮ বছর গ্রাম : চকপাড়া, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ০৮.১২.২০১২, সময় : সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিট
১৭. জহুরা বেগম, বয়স : ৫০বছর গ্রাম : রাণীগাঁও, ইউনিয়ন : বাঘবেড়া, নালিতাবাড়ি, তারিখঃ ০৯.১২.২০১২, সময় : সন্ধ্যা ৬টা
১৮. পূর্ণিমা রাণী, বয়স : ৪৫বছর, গ্রাম : রাণীগাঁও, ইউনিয়ন : বাঘবেড়, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ০৯.১২.২০১২, সময় : রাত ৭টা
১৯. মাধবী লতা সাহা, বয়স : ৩০ বছর, সাহাপাড়া, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ১০.১২.২০১২, সময় : সময় : রাত ৭টা

www.pathagar.com

২০. বাসন্তী রায়, বয়স : ৩২ বছর, তারাগঞ্জ দক্ষিণ বাজার, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ১০.১২.২০১২, সময় : সময় : রাত ৮টা
২১. মুনীরুজ্জামান, বয়স : ৪০ বছর, গ্রাম : বরুয়াজানী, ইউনিয়ন : কাকরকান্দি, নালিতাবাড়ি, তারিখ ১১.১২.২০১২, সময় : সন্ধ্যা ৬টা
২২. মুনীরুজ্জামান, বয়স : ৪০ বছর, গ্রাম : বরুয়াজানী, ইউনিয়ন : কাকরকান্দি, নালিতাবাড়ি, তারিখ ১১.১২.২০১২, সময় : সন্ধ্যা ৬টা
২৩. সাহার খাতুন, বয়স : ৩০ বছর, মহল্লা : নালিতাবাড়ি বাজার, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ১২.১২.২০১২, সময় : রাত ৮টা
২৪. জ্যোতি পোদ্দার, বয়স : ৪০ বছর, তারাগঞ্জ দক্ষিণ বাজার, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ১২.১২.১১ সময় : রাত ১০টা
২৫. ইস্রাফিল হোসেন, বয়স : ২৯ বছর, গ্রাম : আন্ধারুপাড়া, ইউনিয়ন : নয়াবিল, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ১৩.১২.২০১২, সময় : সন্ধ্যা ৬ টা
২৬. বুলবুলী খাতুন, বয়স : ৪০ বছর, তারাগ দক্ষিণ বাজার, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ১৩.১২.২০১২, সময় : সন্ধ্যা ৬ টা
২৭. রাহেলা খাতুন, বয়স : ৪৫ বছর, তারাগঞ্জ দক্ষিণ বাজার, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ১৪.১২.২০১২, সময় : রাত ৯টা
২৮. মনিরা হক, বয়স : ৫০ বছর, গ্রাম : চকপাড়া, নালিতাবাড়ি, তারিখ : ১৫.১২.২০১২, সময় : সন্ধ্যা ৬ টা
২৯. মনোয়ারা বেগম, বয়স : ৫০ বছর, আমবাগান, নালিতাবাড়ি, শেরপুর, তারিখ : ২১.১২.১১, সময় রাত ৭ টা
৩০. হাজেরা বেগম, বয়স : ৮০ বছর, গ্রাম : শালমারা, ইউনিয়ন-কাকরকান্দি, নালিতাবাড়ি, শেরপুর, তারিখ : ২২.১২.১১, সময় : রাত ৭টা
৩১. ফিরোজ আল-মামুন, বয়স-৩৫ বছর, গ্রাম : গেড়ামারা, ইউনিয়ন : যোগানিয়া, নালিতাবাড়ি, শেরপুর, তারিখ : ১৭.১২.১১ সময় বিকাল ৫টা
৩২. ফরিদা ইয়াছমিন, বয়স : ৪৫ বছর, আমবাগান, নালিতাবাড়ি, শেরপুর, তারিখ : ১৮.১২.১১, সময় : সন্ধ্যা ৬টা
৩৩. মনিরা হক, বয়স : ৩৫ বছর, গ্রাম : চকপাড়া, নালিতাবাড়ি, শেরপুর, তারিখ : ২০.১২.১১, সময় : রাত ৮টা
৩৪. সুপ্ত আক্তার, বসয় : ২৫ বছর, গ্রাম : বালাকান্দা, ইউনিয়ন : যোগানিয়া, নালিতাবাড়ি, শেরপুর, তারিখ : ১৯.১২.১১, সময় : রাত ৭টা
৩৫. রেবেকা সুলতানা, বয়স-৪০ বছর, গ্রাম : গড়কান্দা, নারিতাবাড়ি, শেরপুর, তারিখ : ২০.১২.১১, সময়: সন্ধ্যা ৬ টা

www.pathagar.com

বাগধারা

বাগধারার আভিধানিক অর্থ বিশেষ প্রণালীতে বা অর্থে কথা বলা। বাগধারা লোক মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার সার ওঠে আসে। বলা যায়, জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফসল বাগধারায় নিহিত থাকে। এর অর্থের ব্যাপ্তি ও গভীরতা অল্প কথার মধ্যেই ব্যপ্ত হয়। শেরপুর অঞ্চলের লোকজীবনে ব্যবহৃত কিছু বাগধারা তুলে ধরা হলো

সংগৃহীত বাগধারা

১.

বাঙ্গাল (বাঙালি) ডাণ্ডার কাঙ্গাল (কাঙাল)।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : বাঙালি চাপ ছাড়া কিছু শেখে না।

২.

বে আক্কলের ধাক্কা
আক্কলের ইশারা।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : যার বুদ্ধি আছে, সে অল্পতেই বুঝে।

৩.

আধা কইলে গাধায় বুঝে
ভাঙ্গাইয়া কইলে বল্দেও বুঝে।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : নির্বোধকে পুরোটা বলতে হয়, তবে বুঝে।

* বলদ–এখানে নির্বোধ অর্থে।

৪.

খুড়লে থাকিয়া পেঁচা কেচর মেচর করে
সামনে আসিলে পেঁচা জয় মহারাজ বলে।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : আড়ালে ছোটো বড়'র নিন্দা করলেও সামনা সামনি ঠিকই তোষামুদ করে।

৫.

সামনে পড়লে নিমাই দাদা
আড়ালে গেলে নিমাই গুদা।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : সামনে একজন আরেকজনের প্রশংসা করে কিন্তু আড়ালে ঠিকই কুৎসা রটায় বা নিন্দা করে।

www.pathagar.com

৬.

ছাড়া গাঁয়ের মমতা নাই
ভাঙা গাঁয়ে বসতি নাই।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে গেলে মমতা করে লাভ নেই। আবার নদীর কুলে বসতি করতে নেই, নদী যে কোন সময় ভেঙে নিতে পারে।

৭.

ভাগীদারের ভাগী মরে
অভ্যাইগগার (অভাগা) মরে ঘুড়া (ঘাড়া
সোনা কপালির সতীন মরে
পুড়া কপালির মরে পুলা।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : যার সম্পত্তির অংশীদার মারা যায়, আর যে নারীর সতীন মরে তারা ভাগ্যবান, অপরদিকে যার ঘোড়া মরে, আর যে নারীর ছেলে মারা যায় তারা অভাগা বা দুর্ভাগা।

৮.

দেখলি যে তেলি
সেই পথে কে গেলি
সেইখানে কেন বইলি
বইলি তো বইলি
মনের কথা কে কইলি।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : অবিশ্বস্ত লোকের কাছে মনের কথা বলতে নেই। দু'জন লোকের সাথে সম্পর্কও করতে নেই।

৯.

নাও, ভার আর নারী
যার কাছে যায় তারই।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : নৌকা, ভার ও নারী—এই তিনটি যার কাছে থাকে, বা যার হাতে পড়ে—তখন সেই মালিক হয়।

১০.

ভাইয়ের ঘরে ভাইজতা হইল
ভরসা হইল খানি
অইলে খাড়াইয়া চেট দেহাইলো
ভরসা হইল পানি।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : কারো উপরে ভরসা করতে নেই।

১১.

মুখ ওয়ালার মুখ ফেরানো যায় না, লাঠিওয়ালার লাঠি ফেরানো যায়।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : কেউ মুখে কিছু বলে ফেললে, তা ফেরানো যায় না, কিন্তু লাঠি ঠিকই ফেরানো যায়।

www.pathagar.com

১২.

মালা টিপলেই বৈরাগী হয় না।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : সন্ন্যাসী বা বৈরাগী হওয়া সাধনার বিষয়।

১৩.

মা মরলে বাপ তালই

অর্থ বা ব্যাখ্যা : মা মারা যাবার পর বাবার ভূমিকা বাবার মতো হয় না বা বাবা অনেকটা পর হয়ে যায়।

১৪.

বউ জব্দ কিলে
পাটা জব্দ শিলে
প্রতিবেশি হয় জব্দ
চোখে আঙ্গুল দিলে।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : বউ, পাটা ও প্রতিবেশিকে ইচ্ছে করলে জব্দ করা যায়।

১৫.

কাহাইল্‌লা (ভাগ্যবান) মাইনষের বউ মরে
আকাহাইল্‌লা (অভাগা) মাইন্‌ষের গাই মরে

অর্থ বা ব্যাখ্যা : ভাগ্যবানের বউ, আর দুর্ভাগার গরু মরে।

১৬.

অভাগার ভাত বিয়া বাড়িও জুটে না।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : অভাগ বা দুর্ভাগার ভাগ্য কখনোই সুপ্রসন্ন হয় না।

১৭.

অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায়।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : অভাগা বা দুর্ভাগার ভাগ্য কখনোই সুপ্রসন্ন হয় না।

১৮.

আলসিরে ধরছে জুহে (জোঁকে)
কাইন্দা মরে পাড়ার লুহে (লোকে)।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : আহলাদীর বেশি প্রলাপ বকে বা করে।

১৯.

কপালে আছে হাড়
কি করবো চাচা হাহিদার।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : ভাগ্য না থাকলে নিজের লোক পরিবেশন করলেও মনের মতো খাওয়া যায় না।

২০.

হতাই (সং) একটা হউরি (শ্বাশুড়ি)
হোলার (পাটশোলা) একটা দেউরি (দরজা)।

www.pathagar.com

অর্থ বা ব্যাখ্যা : পাটশোলার দরোজার মতো হালকা বা ভঙ্গুর হয় সৎ শাশুড়ির সাথে সম্পর্ক।

২১.

নদীর পানি ঘোলাও ভালো
জাতের মেয়ে কালোও ভালো।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : নদীর পানি আর জাতের মেয়ের মূল্য বেশি।

২২.

হোক নদীর পানি ঘোলা, আর সে মেয়ে জলো।
পালাড়ার (পালক) জ্বালা বেশি।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : যাকে পালক আনা হয়, তাকে নিয়েই বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়। আর তার জন্য মনও বেশি পুড়ে।

২৩.

ছেপ দিয়া লেপ দেওয়া।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : কোন রকমের কাজ করা।

২৪.

এক ঘরের ভাত–এ না হইলে, সাত ঘরের ভাত এও হয় না।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : কোন নারীর এক সংসার না টিকলে, দেখা যায় অন্য সংসার ও অনেক সময় টিকে না।

২৫.

যতই নেংটি ধরিবে কষি
না হবে আর তকদিরের বেশি।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : ভাগ্যের লিখন, না যায় খণ্ডন অর্থে।

২৬.

খাইট্টা–খুইটটাও এক রুটি, খাম ধইরাও এক রুটি।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : একজন কম খেটেও যা পারিশ্রমিক পায়, আরেকজন বেশি খেটেও সেই পারিশ্রমিকই পায়।

২৭.

খুদির পেটে ঘি হজম হয় না।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : নিম্নমানের খাবার খেয়ে অভ্যাস হলে, মান সম্মত খাবার হজম হয় না।

২৮.

স্বভাবের কুত্তা হুইততা ভুগে।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : যার ঝগড়া করে অভ্যাস, শুয়ে থাকলেও সে ঝগড়া করে।

২৯.

হাইন মরে, পুত মরে, কুলা আউল (আড়াল) দিয়া ক্ষেত করে

www.pathagar.com

অর্থ বা ব্যাখ্যা : জীবন কখনো থেমে থাকে না, জীবিকার প্রয়োজনে কাজ করতেই হয়।

৩০.

জামাই-রা সাত ভাই, জামাই মরলে কেউ নাই।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : নারীর সংসার জীবনে স্বামী-ই মুখ্য, তার ভূমিকা অন্য কেউ রাখতে পারে না।

৩১.

বাপ দাদার নাম নাই
কাইনছা মোল্লা (মোড়লের) শালা।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : সবাই প্রভাবশালীদের পরিচয় দিতেই পছন্দ করে।

৩২.

লতা চোর, পাতা চোর
দিন দিন ঘর চোর।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : ছোটো ছোটো অপরাধ করতে করতে বড়ো অপরাধের সাহস হয়।

৩৩.

তুলা (তোলা) দুধে পুলা বাঁচে না
চাওয়া সালুনে ভাত খাওয়া হয় না।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : ধার করা জিনিসে ঠিকমতো চাহিদা পূরণ হয় না।

৩৪.

মুখে মধু অন্তরে বিষ।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : কারো মুখের কথা মধুর হলেও ভেতরে নোংরামি থাকে।

৩৫.

এমনেই নাচনের বুড়ি
আরো পাইছে ঢোলের বাড়ি।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : যে যেমন প্রকৃতির, তার সাথে আরো তাল দেওয়া অর্থে।

৩৬.

পেঁয়াজ চেনা যায় ঝাঁজে
নারী চেনা যায় লাজে।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : সবকিছুর চেনার উপাদান আছে বা থাকে।

৩৭.

হাড়ের মুরদ, ঘাড়ের মুরদ
বউ এর কাছে চেড়ের মুরদ।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : বউ এর কাছে এসে সব স্বামীই আত্মসমর্পণ করে।

৩৮.

যার মরণ জেনে নাও ভাড়া কইরা যায় হেনে
অর্থ বা ব্যাখ্যা : যার মরণ যেখানে নির্ধারিত সেখানেই হয়।

www.pathagar.com

৩৯.

যার জন্যে করি চুরি
সেই বলে চুর (চোর)।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : কারো জন্যে ফাঁকি দিয়ে হলেও কিছু করলে, সে যখন ভুল বুঝে।

৪০.

ভাঙ্গা ক্ষেতে ডেঙ্গা হয় না।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : কাজের সময় বাঁধা পড়লে কাজটা সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় না অথবা একজা কাজ অসমাপ্ত রেখে দিলে, পরবর্তীকালে ওই কাজটি সুন্দুরভাবে হয় না।

৪১.

২ সতীনের ঘর। খোদায় রক্ষা কর।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : ২ সতীনের সংসারের ভঙ্গুরতা বোঝানো হয়েছে।

৪২.

শিখছি কোনে ঠেকছি যেনে।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : মানুষ যখন বিপদে পড়ে, তখনই শেখে।

৪৩.

অতি ভাগ্য যার
নদীর পাড়ে বাড়ি তার।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : যাদের নদীর উপকূলে বাড়ি, তারা সৌভাগ্যবান।

৪৪.

শত নাঙ্গের ঘর,
মইরা দেহ দর্ম।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হলে সবকিছু বোঝা যায়।

৪৫.

খাইলে জাত্তি (জাত) যায় না
কইলে জাত্তি যায়।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : মুখে বললে তা সহ্য হয় না।

৪৬.

যার দিন ভালো, আসে দিন খারাপ।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : সামনে দিনগুলেই তুলনামূলকভাবে খারাপ হয়।

৪৭.

দুই দিনের বৈরাগী, ভাত রে কয় অন্ন।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : সন্ন্যাসী বা বৈরাগী হওয়া সাধনার বিষয়।

৪৮.

না ঘরকা, না খাটকা।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : যে ঘরের নায়, বাহিরেরও নয়।

www.pathagar.com

৪৯.
ফুটা (ফোটা) গরুর লেংগুরে দোষ।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : নিশ্চিদ্র কিছুর ছিদ্র অন্বেষণ কর।

৫০.
কিসের ভেতর কি
পান্তা ভাতে ঘি।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : পান্তা ভাতে ঘি–এর মতো বেমানান কিছু বোঝাতে।

৫১.
পুকুর নষ্ট করে পানায়,
দেশ নষ্ট করে কানায়।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : পুকুরের পানার মতো রাজনীতিক যারা, সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করে, তারাই দেশ নষ্ট করে। কানা–এখানে রাজনীতিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

৫২.
খাইয়া ফিন্দা থাকলে ধন
মইরা বাইচ্চা থাকলে জন।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : সকল হিসেবের পরই যা থাকে, তাই সম্পদ আর মানুষ বলে গণ্য হয়।

৫৩.
এচ্‌লি, কেচ্‌লি / কতো কী কইলি
আমরাও জাতের ধারা/ তুই ও পথে খাড়া।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : কম-বেশি দু'জনেরই দোষ বোঝাতে।

৫৪.
অমানুষে মানুষ নিন্দে, বাওয়াশে নিন্দে জারি
জুনি পোকায় মানিক নিন্দে, এই ভাবনায় মরি।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : সবাই তারচেয়ে উচু পর্যায়ের জনকেও নিন্দা করে, নিজের দিকে তাকায় না। * বাওয়াশ–লাউয়ের খোল * জারি–পিতলের কলসি।

৫৫.
তোমার আছে, আমার আছে, আয় হাত ধরি
আমার আছে, তোর নাই, যা দূরদুরি।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : তেলা মাথায় তেল দেয় সবাই–এই অর্থে।

৫৬.
মুগদস্তরে মাড় গলে, ঝুড়না বাইয়া পানি পড়ে।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : স্বভাবের দোষে অনেক ভোগান্তি হয়।

৫৭.
চুন্নির আলু সিদ্দ (সিদ্ধ) হয়, তুকতুকির আলু সিদ্দ (সিদ্ধ) হয় না।

www.pathagar.com

অর্থ বা ব্যাখ্যা : খুঁতখুতে স্বভাবের লোকের কাজে বিলম্ব হয় বা কাজ নষ্ট হয়। *চুন্নি–চোর, চোরেরর স্ত্রী বাচক অর্থে ব্যবহৃত আঞ্চলিক শব্দ। *তুকতুকি- খুঁতখুঁতে বোঝানো হয়েছে।

৫৮.

ধোপার বাসি, হুতারের (ছুতার)আসি
কামারের কাইল, সব শালার এক চাইল।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : সবার চরিত্র এক, কেউ কথা দিয়ে কথা রাখে না।

৫৯.

কেউ হইল জামাই, কেউ হইল জামাইয়া
কারোর যায় ডেমাইয়া, কারোর আনে নামাইয়া
কেউ খায় হাপুড়, হুপুড়, কেউ খায় চাইট্টা
কেউ খাইবার না পাইয়া যায় উইট্টা।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : দূরের জামাই (যে জামাই দূরে থাকে)–এর কদর বেশি।

৬০.

রতনে রতন চিনে, শুয়োরে চিনে কচ।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : যে যেমন, তার মূল্যায়নও তেমন-ই–হয়।

৬১.

গাঙ পার হইলে ভুড়ার (ভেলা) কপালে লাত্তি।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : উপকারীর উপকার স্বীকার না করা।

৬২.

মামার বাড়ি ভাইগনা খায়
আঠারো মাসে বছর যায়।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : পরের আশ্রয়ে থাকলে কেউ সময়ের হিসাব রাখে না।

৬৩.

হইব পুলা, ডাকব বাপ
তে যাইব মনের তাপ।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : ভাবতে ভাবতেই সময় পার করা অর্থে (অথবা গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল অর্থে)।

৬৪.

ঘরের পাছে নিড়ানি
ঘন ঘন জিরানি।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : ঘরের কাছে কর্মসংস্থান হলে আলসেমি বেশি হয়।

৬৫.

কানা গরুর যুদা (আলাদা) বাতান (দল)।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : প্রত্যেকের সমাজ বা পরিবেশ আলাদা। অথবা শ্রেণিভিত্তিক সমাজ বোঝাতে।

www.pathagar.com

৬৬.
মামা ভাইগনা যেখানে
আপদ নাই সেখানে।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : মামা–ভাগিনার মধুর বা আস্থার সম্পর্ক বোঝানো হয়েছে।
৬৭.
চোখের আড়ালে হলে মনের আড়াল হয়।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : কাছে না থাকলে তার কথা কম মনে পড়ে।
৬৮.
কার উছিলায় শিন্নি খাইলি, মোল্লা চিনলি না।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : একজনকে দিয়ে উপকার হলো, আর তার নামই নই।[১]
৬৯.
আণ্ডা ছুডু গুডা বড়
কতা কয় বাহের (বাপের) বড়।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : ছোটো মুখে বড়ো কথা।
৭০.
সাতেও না পাঁচেও না।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : নির্লিপ্ত থাকা বা নির্লিপ্ততা অর্থে।
৭১.
উড়ে এসে জুড়ে বসা।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : অনধিকার চর্চা।
৭২.
তৈরি সালুনে বাগাড় দেওয়া।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : কাজের শেষে এসে নাক গলানো বা মাতাব্বরি করা।
৭৩.
কইথ থেইকা আইল গো মাগী
সেই হইল বেসাদের ভাগী।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' অর্থে।
৭৪.
বাড়লে বুড়া (বুড়ো
না বাড়লে দুড়া (ছোট/ জয়ান)।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : বুদ্ধি দেখে বয়স বোঝা যায় বা অনুমান করা যায়।
৭৫.
অতি পিরিতের ঘর
ছয় মাসে বচ্ছর।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : অতিরিক্ত বা বাড়াবাড়ি প্রেম টেকসই করে না।

www.pathagar.com

৭৬.

আদরের ধন ভেদড়ে পড়ে ।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : ভালোবাসার বা আদরের মানুষের জীবনেই দুর্যোগ বেশি আসে ।

৭৭.

মায় ফিন্দে ছালার চট
পুলার করে ফট ফট ।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : ছেলে মায়ের দিকে খেয়াল করে না, নিজের পারিপাট্য নিয়েই থাকে ।

৭৮.

উপরদা কয় মিয়া ভাই
নিচদা হান্ডি চুকাকায় ।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : সামনা সামনি তোষামোদ করে, আড়ালে ষড়যন্ত্র বা নিন্দা করে ।

৭৯.

বাপ মা বানায় ভূত
মাস্টার বানায় পুত ।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : শিক্ষকই একজন শিশুকে বা শিক্ষার্থীকে প্রকৃত মানুষ বানায় ।

৮০.

গেগিয়ে নেয় না
গেগি শুয়ারি ছাড়া যায় না ।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : যোগ্যতর চেয়ে প্রত্যাশা বেশি অর্থে ।

৮১.

পরের ঘরের পিডা, খাইতে লাগে মিডা ।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : অন্য ঘরের পিঠা স্বাদ বেশি লাগে ।

৮২.

কায়া দেখলে মায়া বাড়ে ।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : মানুষ কাছে থাকলে বেশি মায়া জন্মে ।

৮৩.

নরম মাডি পাইয়া
চেরা (কেঁচো) উডে ধাইয়া ।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : দুর্বল হলে সবাই প্রভাব খাটায় ।

৮৪.

কাঙালের কথা বাসি হইলেও ফলে ।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : অভিজ্ঞ লোকের কথার মূল্য আছে ।

৮৫.

মেনা বেশি ফেনা তুলে ।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : যাদের বিশে বোকাসোকা মনে হয়, তারাই বেশি ঝামেলা করে বা বাঁধায় ।

www.pathagar.com

৮৬.

জামাই কয়না হরি (শাশুড়ি)
টিলিক পাইরা মরি।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : জামাই শাশুড়িকে মূল্যায়ণ কর না কিন্তু শাশুড়ি জামাইয়ের মূল্যায়ণ পাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করে।

৮৭.

গেগিরে পুছে না
গেগি খাট ছাড়া লড়ে না।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : যোগ্যতার চেয়ে প্রত্যাশা বেশি অর্থে।

৮৮.

ধান চাল ভূষি
যার যার খুশি।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : যার যা ভালো লাগে, সে তাই সংগ্রহ করে।

৮৯.

যার বিয়া তার খবর নাই
পাড়া পড়শির ঘুম নাই।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চেয়ে অন্যদের সংশ্লিষ্টতা বা উদযাপন বেশি অর্থে।

৯০.

থও থও নিজের পুত
টাইননা নেও ভাইয়ের পুত।

অর্থ বা ব্যাখা : নিজের সন্তানের চেয়ে ভাতিজার প্রতি মায়া বা আদর কোন অংশে কম নয়।

৯১.

শের পিন্দি কয় কাড়া পিন্দিরে।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : যে বেশি দোষী, সেই আবার যে কম দোষী–তাকে সোষ ধরিয়ে দেয়।

৯২.

নিজের শাশুড়ি সেলাম পায়না,
মাওই শাশুড়ি পাও আগাইয়া দেয়।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : যেখানে কাছের জনে মূল্যায়ণ নেই, সেখানে দূরের জন তো পরের কথা।

৯৩.

সুখে থাকলে ভূতে কিলায়।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : অনেক সময় সুখে থাকলে নানান কুচিন্তা মাথায় আসে।

৯৪.

যার জামাই তার খবর নাই

www.pathagar.com

পাড়া বড়শির ঘুম নাই ।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির চেয়ে অন্যদের সংশ্লিষ্টতা বা উদযাপন বেশি অর্থে ।
৯৫.
সোনার আংটি বাঁকাও ভাল ।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : মূল্যবান জিনিসের সামান্য ত্রুটি ধর্তব্য নয় ।
৯৬.
নিত্য মরা গাড়ি কত,
নিত্য উপাস পারি কত ।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : নিত্য নৈমিত্তিক ক্লেদ আমাদের খুব ক্লান্ত করে ।
৯৭.
থাকি মোল্লের বাড়ি,
মরছে মোল্লের মা
সাতে সাতে না কান্দিলে
খেদায় দিব না ।[২]
৯৮.
ভাত দেওয়ার ভাতার নাই, কিলানের ভাতার ।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : কাজের লোক নেই, অকাজের লোক আছে ।
৯৯.
ভাতের তলে কই মাছ থুইয়া
মক্কার ঘরে কুত্তা খেদায় ।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : কাছের খবর রাখে না, দূরের খবর রাখে ।
১০০.
রাস্তায় পাইছি কামার,
দাও (দা) ধারাইয়া দেও আমার ।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : কাজের লোকের দেখা পেলেই কাজের কথা মনে আসে ।
১০১.
ঘর আনতে দড়ি
বিয়া করতে কড়ি ।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : যে কাজে যা প্রয়োজন, তাই যোগাড় করতে হয় ।
১০২.
খাইবার পাইলে চাওল-ই চিড়া
বইবার পাইলে মাডি-ই পিড়া ।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : কাজ জানা থাকলে বা রুচি থাকলে সবকিছুই ভালো লাগে ।
১০৩.
পশুর মইধধে গাইরা (শুয়োর)

www.pathagar.com

পাখির মধ্যে পাইরা (পায়রা)
খেশির (মেহমান) মইধধে ভাইরা (ভায়রা)।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : পশুর ভেতরে শুয়োর, পাখির ভেতর পায়রা, আর মেহমানের ভেতর ভায়রা শ্রেষ্ঠ বা উল্লেখযোগ্য অর্থে।

১০৪.

বেশি আউশের (সখের) পিডা মধধে কাঁচা থাকে।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : বেশি শখের জিনিসের অনেক সময় ত্রুটি থাকে, আর এতে খুব কষ্ট হয়।

১৫০.

পানতা ভাতে ঘি নষ্ট
বাপের পাড়ি ঝি (মেয়ে) নষ্ট।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : পান্তা ভাতে ঘি নিলে তো যেমন নষ্ট হয়, তেমন মেয়ে বাপের বাড়ি বিয়ের পর থাকলেও নষ্ট হয়।

জাতের ধারা, ক্ষেতের নাড়া।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : একজনের স্বাভাব বা চরিত্রে তার বংশ ধারার প্রভাব পড়ে।

১০৬.

দাড়ায় নাড়া টানে
পেন্দে সাত পিঁড়ি টানে।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : একই জাতের লোক একই স্বভাবের হয়, একটি কলঙ্ক সাত প্রজন্ম পর্যন্ত তাকে।

১০৭.

হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান হয় না।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : একই বাবা মায়ের সব সন্তান একই স্বভাব বা মেধার হয় না।

১০৮.

আগের হাল যেই দিকে যায়, পিছনের হাল সেই দিকেই যায়।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : বড়োদের অনুকরণ বা অনুসরণ করে ছোটোরা। অথবা পরিবারের বড়োর ভাগ্য যে রকম হয়, ছোটোর ভাগ্যও ওরকম হয়।

১০৯.

কপালে নাম গোপাল।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : ভাগ্য ঈশ্বর নির্ধারণ করেন বা ভাগ্যই ঈশ্বর।

১১০.

জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে
তিন বিধাতা নিয়ে।

অর্থ বা ব্যাখ্য : জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ঈশ্বরের অধীন বা জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ঈশ্বর নির্ধারণ করেন।

www.pathagar.com

১১১.

তুই দিলে মুই দিই
একলা একলা কত দিই ।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : কারো পক্ষে কাউকে একলা বা একতরফা বেশিদিন সহযোগিতা করা সম্ভব না ।

১১২.

খালি হাত কুত্তাও চাড়ে (চাটে) না ।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : শূন্য হাতের দিকে কেউ তাকায় না ।

১১৩.

বাড়ি (বাটি) দিলে বাড়ি ঘুরে ।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : কাউকে দিলে পাওয়া যায় ।
ঝনঝনা বাঁশের টনটনা কইনচা ।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : 'বাপকা বেটা' অর্থে ।

১১৪.

কড়ুলে বাঁশ ঠেলে ।

অর্থ বা ব্যাখ্যা : ছোটো মানুষ বড়ো কাজ করে । কড়ুল–বাঁশের চারা ।

তথ্যনির্দেশ

১. মনিরা হক : বয়স : ৫০ বছর, গ্রাম : চকপাড়া, নালিতাবাড়ি, শেরপুর, তারিখ : ০২.০১.২০১২, সময় রাত ৮ টা

২. ফিরোজা আল মামুন, বয়স : ৪০ বছর, গ্রাম : গোড়ামারা, ইউনিয়ন : যোগানিয়া নালিতাবাড়ি, শেরপুর, তারিখ : ০১.০১.২০১২ইং, সময় : সন্ধ্যা ৭টা

www.pathagar.com

প্রবাদ-প্রবচন

প্রবচন—ছড়া বা কবিতা নয়। যদিও ছড়ার ছন্দ এবং কবিতার অন্তমিল ও আমেজ-মিশ্রিত দু'টি, কখনও কখনও দু'য়ের অধিক চরণ নিয়ে প্রবচন গঠিত বা রচিত হয়। প্রবচনের কতগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে ড. ওয়াকিল আহমদের সঠিক ও সুন্দর সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। তাঁর মতে, প্রবচন হ'ল একটি জাতির দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার কথা, যা গদ্যে বা অন্তমিলযুক্ত, বাচ্যার্থনির্ভর, প্রত্যক্ষ আবেদন, সরস, সহজবোধ্য, প্রবাদ অপেক্ষা আকাড়ে বড়ো, এতে অর্থের ধারণ ও বহন ক্ষমতা আছে এবং এটি রচনায় স্বাধীনতা আছে।

প্রবচন ও প্রবাদ এক নয়। অনেকে হয়ত অভিন্ন মনে করে থাকেন। প্রবাদ ও প্রবচনের বিষয় যদিও ব্যক্তি, সংসার পরিবার, সমাজ, দেশ, জগৎ, প্রকৃতি, পরিবেশ, স্থান, কাল, কৃষ্টি ইত্যাদি। কিন্তু 'প্রবাদ ব্যঞ্জনানির্ভর, প্রবচন বাচ্যার্থনির্ভর।' অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নির্ভর এক বাক্যের রূপক অর্থবহ উক্তি হ'ল প্রবাদ আর প্রবচন হ'ল দুই বা অধিক সরল অর্থের অন্তমিল, ছন্দযুক্ত বাক্য বা চরণ। প্রবাদ ও প্রবচনের একটি করে উদাহরণ দেয়া যাক। প্রবাদ : 'আপন চরকায় তেল দাও।' প্রবচন : 'মা গুনে ঝি, গাই গুনে ঘি/ বাপ গুনে বেটা, গাছ গুনে গোটা।'

লোক-সংস্কৃতি ও লোক-সাহিত্যের অনেক উপাদানের অতীতে কোন লিখিত রূপ ছিল না। সাধারণ মানুষের মুখে মুখে স্বাধীনভাবে রচিত হ'ত। মানুষ তার ব্যক্তি ও জগৎ-সংসার থেকে অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান থেকে নীতি বা উপদেশমূলক যে উক্তি—যা লোকোক্তি, তাই প্রবচন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও প্রবচন উপাদানের মত প্রবচনও হারিয়ে যাচ্ছে। এখানে শেরপুর জেলার কিছু প্রবচন তুলে ধরা হ'ল।

১.

শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি
নয়া নয়া দিন চারি

২.

কাঙালের পুলা কম্বলে হাসে
গোয়ার চুকচকি কুটকটি হাসে

৩.

গরুর আত্মীয় চাটলে চুটলে
মানুষের আত্মীয় এলে গেলে

৪.

জমি চিনে খরানে
মানুষ চিনে নিদানে

www.pathagar.com

৫.
কাজ করলে কাজি
কাজ ফুরালে পাজি

৬.
চোরের নাই ধরম
নোচ্চার নাই শরম

৭.
গাছ গুণে গোটা
বাপ গুণে বেটা

৮.
গাই গুনে ঘি
মাও গুনে ঝি

৯.
গাঙ নষ্ট করে পানা
গাও নষ্ট করে কানা

১০.
এক জনে মারে মশা
অন্য জনে খায় শসা

১১.
ভাইয়ের চেয়ে গাই ভালো
জামাইয়ের চেয়ে কুকুর ভালো

১২.
ওস্তাদের ধন চৌদ্দ ভারে বয়
ভাংগ্যা দিলে কড়ার মূল্য নয়

১৩.
ঝোপ বুঝে কুপ মারো
আয় বুঝে ব্যয় করো

১৪.
অসম্ভব কী কিছুই নয়
সাবধানেতে সবই হয়

১৫.
খাইতে পারলে চালই চিড়া
বসতে পারলে মাটিই পিড়া

১৬.
উবজে কথার দাম নাই

www.pathagar.com

হাদা পানের মান নাই

১৭.

রাইতে মশা দিনে জোক
কাইন্দে মরে নরুদ্দির লোক

১৮.

খাটে বান্দা, ঘাটে না।

১৯.

মানির ছেলে মাল হারাল
পুংটা অইল তালুকদার

২০.

ঝি বিয়ে দিলাম জামাই মরল
পুলা বিয়ে করাইলাম বউ মরল

২১.

গুরু নিন্দা পুত্র শোক
দিন দিন বাড়ে রোগ

২২.

বড় লোকের সঙ্গে করো দুস্তি
ছোট লোকের সঙ্গে করো কুস্তি

২৩.

সৎ সঙ্গে কাশি বাস
অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ

২৪.

মরলে যায় খাছ্লত
ধুইলে যায় নাপাক

২৫.

মানুষ পাকলে তিতা
ফল পাকলে মিঠা

২৬.

যার ঝি তার জামাই
অন্য লোকের হাল কামাই

২৭.

সুজন সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া
কুজন কুযশ গায় কুযশ নামিয়া

২৮.

দয়ার সমান ধর্ম নাই

www.pathagar.com

হিংসার তুল্য পাপ নাই
২৯.
রাজায় রাজায় যুদ্ধ হল
নল খাগড়া প্রাণ গেল
৩০.
বাপের বেটা সিপাহের গোড়া
আরও না পায় থোড়া থোড়া
৩১.
ভাঙা ঢেকির শব্দ বেশি
আকাটা নায়ের সাজ বেশি
৩২.
গাছে ওঠে মরবার
জামিন হয় ভরবার
৩৩.
গলির গরু পালানের খাস খায় না।
৩৪.
ভিক্ষের চাল কারা আর আকারা।
৩৫.
চাঁদের সভায় যদি পড়ে তারা
বৃষ্টি হবে মুষল ধারা
৩৬.
আছে গরু না বায় হাল
তার দুঃখ হয় চিরকাল
৩৭.
দাড়িওয়ালা খায়ে যায়
মোছওয়ালার বাজ্জে যায়
৩৮.
বৈশাখে নাল্লে শাক
জৈষ্ঠ মাসে আম
আষাঢ়ে খৈ
শ্রাবণে দৈ
ভাদ্রে তালের পিঠা
আশ্বিনে শসা মিঠা
কার্তিকে ওল
আগুনে খলিশার ঝোল
পৌষে কাঞ্জি

www.pathagar.com

মাঘে তেল
চৈত্রে ঘোল

৩৯.

দাউ ছাড়া আছারি
মণ্ডল ছাড়া কাছারি

৪০.

ঠেলাঠেলির ঘর
খোদায় রক্ষা কর

৪১.

পুত্র শুহে (শোকে) ঘর লয়
ট্যাহার (টাকার) শুহে ঘর লয় না।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : টাকার শোকেই বড়ো শোক বুঝানো হয়েছে।

৪২.

মাগ (মাঘ) মাসের জারে (শীতে)
মইশের (মহিষের) শিং নড়ে
অর্থ বা ব্যাখ্যা : মাঘ মাসের প্রচণ্ড শীতকে বোঝানো হয়েছে।

৪৩.

মইষের শিংঙা (শিং) মইশের কাছে কাছে ভার লাগে না
অর্থ বা ব্যাখ্যা : যার যার বোঝা, তার কাছে ভার লাগে না বা বোঝা মনে হয় না।

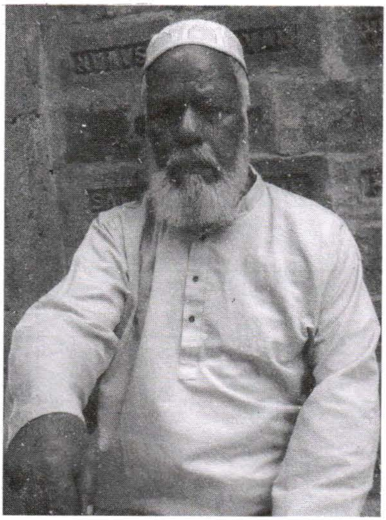

মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, তথ্য প্রদান কারী

www.pathagar.com

গারোদের প্রবাদ-প্রবচন

গারো ভাষার মূল প্রবাদ	প্রবাদের অর্থ	বাংলায় প্রবাদের অর্থ
দফো দে বা-আ	অংথাই গিম্মিন কাম	স্বভাব অর্থে প্রয়োগ
মিআ মিসি গাগং মান্দে সিক্খায়ান সালজং	মান্দে স্কাও ফাংচাগে জাংগি থাংআনি	মানুষই দেবতা
দিংআ দিংআ ইন্নোবা সালগিত্তাদে অংজা মাদি মাজং ইন্নোবা মা গিত্তাদে অংজা	গিববিন আরো আনথাংনি গিম্মিন মাসিয়ানি	আপন পর অর্থে প্রয়োগ
সালও রামওবা রানজাজক চিও সুগালোবা থালজাজক	রাক্কা ক্রা চা-আনি	বড় কোন অসম্মানজনক কাজ
হাগাগিৎদা মাৎচা চিগাগিৎদা বুগা	গিম্মিক গিত্তান খেন্নানি	উভয় সংকট অর্থে প্রয়োগ
খুসিখো বিজা বিচ্ছি অকনিংঅ মাৎচা বিষি	মিক্কাং-অ নাম্মা দাগ্‌েগ গিসিক-অ খাআ নাং-আ	মানুষের দ্বৈত চরিত্র প্রয়োগ
জিক্‌না দেনা খক মা্-না ন্যানা ওক	মাহারীনিখো চাএ জিকনা দেনা অন্না	স্বজনের থেকে নিয়ে স্ত্রী সন্তানদের দেওয়া অর্থে প্রয়োগ
জিকদে দে-দে বোবিল মা সা ন্যুসা জাদিল	গিব্বিন আরো আনথাংনি গিম্মিন আগানা	আপন পর অর্থে প্রয়োগ
আবিদিংখো নিওয়াদে হাদিল সিক্কাদামাৎছক গ্রংও গাদো-এ আংকি টাট্রা	কাম গ্রি খু'সিকচি বিবা ওয়াৎথাইগিব্বা	কর্মহীন লোকের বসে অযথা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা
আচাক কুড়ি চামানজক ওয়ালজা গাথিংদাৎমানজক	দাক্থিমাং-আ	হঠাৎ করে কোন কর্ম করে ফেলা
আচাকান সিংপিলজা বিসা দিসা-আন কেনপিলজা	মেল্লিদোগা-আ	স্বেচ্ছায় মিশতে যাওয়া
আচাক ওয়াটক ক্রুয়া দ্বগ পেগা স্মদা	আনথাংনা আনথাং-আন দুঃখখো রাবা-আ	নিজেই নিজের দুঃখ ডেকে আনা
আচাক নককিং গা মিদ্দে টংগ্রেং মাসিয়া	ক্রাগিজাকো দাগগানি	অকার্য সাধন
আচাক চিকনাকা গিদ্দা দবক টটনাকা গিদ্দা	নিনা সিকজা/মেলিজা	অমিল
আ'চি বামচিগবে চাকসি সুচকচগে	খ্রা চা-আনি	লজ্জা পড়া
আচাকগিত্তা মিকসংএ ররি গিত্তা করং-এ	জাজ্রেং-এ রুগিপারাং	দ্বিধান্বিত হওয়া
আ'চি মাৎমা কুরেক রেক সামচি দ'মারাং সেকসেক	মাহারী থম্মা	গোষ্ঠী সমাবেশ
আগানথোন খুচকরেং	মাংরএৎ গিবা মিচিক	বেহিসাবী নারী

রুরামা-আন জারেংরেং		
আমসেপ বিডেডেপ্পানা জিয়া রি'গিং নাথং চন্নানা গাল্লা	মান্দেরাংনি নাম্মে নিগিবা মান্দেস্কা জাক্কাল গিজা	লোকে ভাল বললেও তা ব্যবহার না করা
আচাক সিং-আ গ্রি দ-ও গিসিগগাগ্রি	দাল্লা আসেল অং-আ	বড় কোন দুর্ঘটনায় পড়া
আচাক সিংরাকগিব্বানা মিক্কাসিখো অন্নে বিসা গ্রাপগিব্বানা ক্কোথেকো দুওয়া	আসেল অ-আনিখো চাংপেংসুয়ানি	কোন ঘটনা হতে যাওয়া রোধ করা
আচক্কে ওয়াত্তা বল দেনপাকে ওয়াত্তা	আখিম ওয়াত্তা	দুই গোষ্ঠীর সাথে সম্বন্ধ ত্যাগ করা
আদালখো সু-ও আব্রেংখো খাম্মা	গিত্তালখো সানদিও গিচ্ছাম অবস্থাচি সকগাং-আ	নতুনের খোঁজ করে পুরাতনে ফিরে পাওয়া
আদিং বালওয়া স্রি-অন সারে দিম্মো রাদো-আন	বালস্রিস্রি দাগিগবা বিয়াপ	ঝিরঝির বাতাসের স্থান
আগাল কাম্মো ওয়াল চাকগিব্বা সালারাক্কাও সাল চাকগিব্বা	মাদ্রাং মাহারীখো চেলচাকগিবা	মাতৃগোষ্ঠীদের মোকাবিলা করা
আগানো মিদ্দাগা আসং-অ দংথিম্মা	জা চা-আ	দাবী করা (?)
আগানাখোন রা'জা খকখারেংখোন ওলজা	কাত্তা রাগিজাগিবা	যে কথা শুনেনা
আগানোওন দাল্লা দকথাবোওন জালা	কাত্তা জালরুরুয়াৎত্তা	কথা বাড়তে থাকা
আগানাত্তা-আন খাসারা মিক নিয়া-আন খাসারা	পিল্লাক দাগগা কামওন নামনিক্কা	সবকাজেই ভাললাগা
আগানা-আন আগানজক মিক্কাং দন্নে আগানখোনা	খুওয়াট গিজা আগানানি	এক দমে কথা বলা
আনচিসান গিপ্পিলা ক্লিসান থুসিয়া	আন্‌চি আপসান	এক রক্ত
আক্কাল দবোথগা চ্রাম ওয়াকনাচিলা	কাংগাল অং-আ	অতি দরিদ্র
আম্পকমা জাংগি গ্নাং মোড়ামা গিসিক গ্নাং	সকগিবানা গিসিক নাংএ দাগগা	আগন্তুকের জন্যে আন্তরিকতা দেখানো
আং সু'না আং দেনা জাংগি সিলচি নাও-আ ক্লি কাসন্দা	প্লাক কামরাং-আন দেদ্রাংনা দাগগা	সব কাজই সন্তানদের জন্যে করা
আক্রম দেবিলজুয়া গিত্তা গানচি দেরিংরেং-আ গিত্তা	কাত্তা বন্নাট গিমিন খো বিগত্তানি	পুরনো কথা নতুন করে উত্থাপন করা
আলনা ব্রাং-ই সক্কা থেংকিয়ে	কাঙ্গাল চলগ্রি	অতি দরিদ্র
আলাবক নাট্টক নিম্মা	দাকমিগগা-আ	লোক দেখানো

আলসানা চিখং দগ্‌গা	মিক্‌চা-এ খাসা-এ দাগগা	ভালবাসার কাজ
আমা গিত্তিং চাগিত্তিং মিমা জাপাং রংথামবিং	মেত্রাকো মিত্তেলে আগানানী	যুবতীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন
আমাক চিও দ্রু-আ হুরো বাক গ্রংজা	মান্দি স্কানি আগান ছাকানিখো ক্লাছাগিগজানি	লোকের কথা না শোনা
আমাক দেখো আকথেদে গাল্লা দছক দেখো থেকচাং-এ কাৎদা	এানিআদ স্কানি আগানাখো ক্লাছাগিগজা দাগগানি	লোকের কথা না শোনে কাজ করা
আমবলবা জাসাওদে চিংজা মান্দিবা সাকসানদে রাকজা	মান্দি মান্দি স্কাও পাংচাগানি	মানুষ মানুষের উপর আস্থা রাখা
আমবল জাবাক গাদ্দে মিরং রংদিক দন্নে	মেচিকরাংনি কামনা বিনচিপানি খো আগানা	নারীদের সংসারের প্রতি মনোযোগ দান
আম্মো মাংগিসি থুসিয়ো শারিগ্রি	সিগিম্মিন নামগ্নি দংজাহা	মৃতদের প্রয়োজন নেই
আমফাং বুসু বুএ জাকপা কিত্তিক চাম্মে	গংএ কাম কা-আনি	মন দিয়ে কাজ করা
আমফাং জাক জজ দাগগা	মিক্কিম রাসং গ্রি	মানহীনতা
আমফাং বুসো বু-এ জাপা থিকথিক চাম্মে	বিনচিবে কাম কা-আনি বিথে	কঠোর শ্রমের ফল
আংখিবা কলথাং ওদে গ্রং চাকাদা ন্যাচিবা সিনা সিও খিম্মে থাপথাপা	আনথাংনা ওয়ারাচাগা	নিজের জন্যে মোকাবেলা করা
আনা থিগগে কুদিমা চিনা দিন্নে দিংদিং-আ	আনা চিনা থিগগে মাৎবুরুংরাং দংআ	মৃত্তিকা আর পাতাল মিলে কীট পশুদের বাস
আনমা জ্রিমজ্রিম দাগগা স্কু থিংথিং সা	বে-এন আনসেল গিজানি	শরীরের অস্বস্থিবোধ করা
আনা বিকগিল বিকগিল চিনা থিংগিল থিংগিল	মান্নে দাং-এ চা-আ বা মিংসিংগিব্বা	খ্যাতিমান/বা বিত্তশালী
আন-ও দংআ চাংঅ দংআ	ওকগো নাংআ	অন্তঃসত্ত্বা
আংনি গ্রং বিআ আংনি সিমচি সুআ	অংগ্রামাইয়া	নিষ্ফল
আংনি মুক্কুরি আংনি সালিখিম	মান্দিনি মিক্কিম বা রাসং	মানুষের সম্মান বা খ্যাতি
আনথাং-আন দবগ আনথাং-আন কিলকক	আনথাং-আন গিত্তেল আরো আনথাং-আন নক্কল	নিজেই ঈশ্বর আবার নিজেই দাস
আনথাং-আন আসক আনথাং-আন গোওয়ালকক	পিল্লাক কামরাংওন আনথাং-আন দাগগাই-আ	সব কাজে নিজের প্রাধান্যতা বজায় রাখা
আপাদে সামচেং ব্রা-আচি রেয়াং- আ আংখো কিমকা রংপিননা দনাং-আ	ফাগিবানি সিয়ানিখো আগান মিদ্দাবানি	পিতার মৃত্যুর সংবাদ প্রচার

লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার

উন্নত সভ্যতা আর তথ্য প্রযুক্তির সর্বাধুনিক যুগ এখন। বিজ্ঞানের মহা-আবিষ্কার, অগ্রযাত্রায় মানুষ চলে যাচ্ছে চাঁদের দেশে। গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। পৃথিবীর বয়সও বেড়েছে অনেক। কিন্তু এই পরিণত পৃথিবীর উন্নত দেশে তো বটেই, এই বাংলাদেশেও উত্তরাধুনিক চর্চায় নিবিষ্ট, আধুনিক সভ্যতায় জ্ঞান গড়িমায়, শিক্ষা-দীক্ষায় উত্তীর্ণ মানুষসহ গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকার আধুনিক সভ্যতা বঞ্চিত নিরক্ষর মানুষ সকলেই আজও বিশ্বাস করে সংস্কার।

সামাজিক প্রথা বা ধর্মাদি বিষয়ে যুক্তিহীন বিশ্বাসের উৎপত্তি বা প্রচলন হয়েছে সৃষ্টির আদিতে গুহা মানুষের কাছ থেকে। তখন মানুষ ছিল প্রকৃতির ক্রীড়নক। প্রকৃতি ছিল মানুষের কাছে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়। প্রকৃতি ছিল ভয়। প্রকৃতি সেও তখন কিছু কম বড়ো শত্রু ছিল না মানুষের। এই সব শত্রু থেকে, শত্রুর ভয় থেকে বাঁচতেই মানুষ যেমন অস্ত্র বানিয়ে লড়াই করছে তেমনি ওই সব বুনো জন্তু ও প্রকৃতির পূজা-অর্চনা শুরু করেছে। তারা বিভিন্ন প্রাণী বা জীবজন্তুর মূর্তি বানিয়ে কিংবা মাটির ফসল দেওয়ার ক্ষমতা দেখে মাটিকে মা মনে করে তার মূর্তি বানিয়ে পূজা করেছে। আর তাদের অন্ধ বিশ্বাস, ধারণা, অসহায়ত্ব, ভয়, শত্রু তাড়ানো, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি থেকে জন্ম নিয়েছে নানা ধরনের সংস্কার। এই সংস্কারগুলোই ধীরে ধীরে পরবর্তীকালে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারে পরিণত হয়েছে। সময় বদলেছে। মানুষ আদিম অন্ধকার যুগ থেকে সভ্যতার আলোর যুগে প্রবেশ করেছে। কিন্তু আধুনিক পৃথিবীর সভ্য মানুষেরা এখনও ধরে রেখেছে আদিম সংস্কারগুলোকে। গবেষক আইয়ুব হোসেন বলেছেন, 'আমাদের সমাজে যুগ যুগ ধরে অর্থহীন প্রথাগত বিশ্বাস তথা কুসংস্কারের আবর্জনাগুলো মানুষের মনোজগতে শেকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে আছে'। শেরপুর অঞ্চলেও রয়েছে নানা ধরনের লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাস। এখানে শেরপুর জেলার কিছু কুসংস্কার তুলে ধরা হলো :

১. পানিতে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখা ভাল না।
২. আয়না ভাঙলে অমঙ্গল হয়।
৩. চুল খাড়া লোক বদমেজাজী হয়।
৪. পুরুষেরা পোড়া ভাত খেলে অমঙ্গল।
৫. কাগজ টুকরো করলে ঋণী হয়।
৬. স্ত্রী সব সময় স্বামীর বাম পাশে বসবে, শোবে।
৭. স্বামীর নাম স্ত্রী মুখে আনা নিষেধ।
৮. নখ ও চুল মাটিতে পুতে রাখতে হবে।
৯. গরু ছাগলের দড়ি পা দিয়ে ডিঙানো যাবে না।

www.pathagar.com

১০. পুরুষেরা শাড়ি পরা ও চুল বড় রাখা যাবে না।
১১. রাতে বেলা গাছের পাতা ছিড়া অমঙ্গল।
১২. গর্ভবতী মেয়ের গাছের ফুল ছিড়তে পারবে না।
১৩. রবিবারে চুল ও নখ কাটা নিষেধ।
১৪. ঘর থেকে বেরুলে ডান পা আগে দিতে হবে।
১৫. ছেলেরা গালে হাত দিয়ে বসলে বউ মারা যায়।
১৬. পুরুষদের সোনার অলংকার পরা নিষেধ।
১৭. ভয়ে আতঙ্কে বুকে থুথু দেওয়া।
১৮. সন্ধ্যার সময় শুয়ে থাকা ভাল না।
১৯. খাবার টেবিল বা দস্তরখানা থেকে খাবার উঠিয়ে খাওয়া দারিদ্র্যের লক্ষণ।
২০. শ্মশান ও কবর স্থানে ভূত প্রেত বা অলৌকিক শক্তির আনাগোনা বা ভয় থাকে।
২১. পশ্চিম দিকে পা দিয়ে শোয়া যাবে না।
২২. মেয়েদের বুকে লোম তা অশুভ।
২৩. রাতে বাড়ির বাইরে থাকা ঠিক না।
২৪. সকালে মেঘ করলে কোথাও যাত্রা করতে নেই।
২৫. বর্ষাকালে ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টি অনিবার্য মনে করা হয়।
২৭. পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে সন্তান উৎপাদন বন্ধ করা ঠিক না।
২৮. বেঁটে মানুষ আল্লাহর দুশমন।
২৯. গাছের প্রথম ফল মসজিদে বা মন্দিরে দিলে পরবর্তী সে গাছে প্রচুর ফল ধরে।
৩০. সাত সকালে কাকের ডাক শুনলে দিনটাই খারাপ যায়।
৩১. বাড়িতে তেঁতুল, গাব, তাল এবং কদম গাছ থাকলে ভূতে বাসা বাধে, এসব গাছ বাড়িতে লাগানো যাবে না।
৩২. দুপুরে কাক ডাকলে আত্মীয়ের মৃত্যু হয়।
৩৩. মেয়ে বাবার মত আর ছেলে দেখতে মায়ের মত হলে ভাগ্য ভালো।
৩৪. বিধবাদের সামনে দেখে যাত্রা নিষিদ্ধ।
৩৫. প্রথম কন্যা সন্তান হলে বাবা ভাগ্যবান হয়।
৩৬. ঘি মাখলে চুল পেকে যায়।
৩৭. ঘি খাওয়ালে কুকুর পাগল হয়ে যায়।
৩৮. বসন্ত রোগীর বিছানায় বড়ুই পাতা রাখতে হয়।
৩৯. চন্দ্র গ্রহণ বা সূর্য গ্রহণের সময় কোন খাবার খাওয়া যাবে না।
৪০. ফসল-ফল-সবজিতে যাতে কুনজর না লাগে সেজন্য জুতো, খড়-মাটি-কাপড়ের মূর্তি বানিয়ে ক্ষেতে টানিয়ে রাখা হয়।
৪১. যমজ কলা খেলে যমজ সন্তান হয়।
৪২. রাতে হাতের আঙুল ফুটালে টাকা সঞ্চয় হয় না।
৪৩. কোন বিকট শব্দে ভয় পেলে বুকে ফু অথবা থুথু দিতে হয়।
৪৪. হাড়ি কড়াই পাতিলে ভাত খাওয়া দারিদ্রের লক্ষণ।
৪৫. স্বপ্নে সাপ দেখলে বয়স বাড়ে।
৪৬. আজানের সময় ঘরে ঝাড়ু দিলে লক্ষ্মী ঢোকে না।

www.pathagar.com

৪৭. শিশুর জন্মের একমাস বা চল্লিশ দিন তাকে নিয়ে বাইরে যাওয়া যাবে না।
৪৮. ভাঙা কাপ, প্লেট খেলে আয়ু কমে যায়।
৪৯. বাড়ির উঠানে বা রাস্তায় এক শালিক দেখলে অমঙ্গল।
৫০. মাংস খাওয়ার পর দুধ খেলে ক্ষতি হয়।
৫১. বিয়ের অনুষ্ঠানে আইবুড়ো নারীর উপস্থিত অমঙ্গলজনক।
৫২. অষ্ট ধাতুর আংটি সৌভাগ্য বয়ে আনে।
৫৩. বৈশাখ মাসে অগ্নিকোণে বিদ্যুৎ চমকালে তা ভয়ানক খরার লক্ষণ।
৫৪. গাছে ফল না ধরল বা গাছ না বাড়লে মনে করা হয় কুনজর লেগেছে।
৫৫. ঝাল খেলে পানি খাওয়া যাবে না।
৫৬ চোখের উপরের পাতা লাফালে বিপদ হয়।
৫৭. ডান হাতের তালু চুলকালে হাতে টাকা আসে এবং বাম হাতের তালু চুলকালে টাকা খরচ হয়।
৫৮. মেয়েদের নাকের ডগা ঘামলে স্বামী নাকি অনেক আদর করে।
৫৯. বিধবাদের আমিষ খেতে নেই।
৬০. আয়না দিয়ে শিশু তার চেহারা দেখলে সে রোগ শোকে আক্রান্ত হয়।
৬১. রাতের বেলা বাঁশি বাজানো ভাল না এবং মেয়েদের রাতে বাঁশির সুর শুনতে নেই।
৬২. ফল খেলে জল খেতে নেই।
৬৩. চুরি করে খাবার খেলে ঢেকুর ওঠে।
৬৪. দাঁড়িয়ে পানি খেলে শয়তানের প্রসাব খাওয়া হয়।
৬৫. পরীক্ষার আগে ডিম ও কলা নিষেধ।
৬৬. মেয়েরা গজার মাছের মাথা খেলে শরীরের ক্ষতি হয়।
৬৭. খাওয়ার সময় কথা বলতে নেই।
৬৮. নুন (লবণ) খেলে গুণ গাইতে হয়।
৬৯. ঘরে প্রাণী বা মানুষের ছবি টানাতে নেই।
৭০. খাওয়ার সময় জিব কেটে গেলে কেউ দূরে থেকে বকছে বলে মনে করা হয়।
৭১. ঘরের ভেতর ছাতা মেলতে নেই, অমঙ্গল হয়।
৭২. দাঁড়িয়ে খাবার খেতে নেই।
৭৩. দোকানে সকাল-সন্ধ্যায় আগরবাতি জ্বালাতে নেই।
৭৪. কোন কাজে যাওয়ার পথে লাশ দেখলে যাত্রা শুভ হয় না।
৭৫. হাঁটুর উপড়ে কাপড় উঠানো ঠিক না।
৭৬. পিছন ডাকলে অমঙ্গল।
৭৭. রাতে শিয়াল ও কুকুর ডাকলে অমঙ্গল।
৭৮. শরীরে জড়ানো অবস্থায় কাপড় সেলাই করলে শরীরে ঘা হয়।
৭৯. খাওয়ার সময় দাঁতে কামড় লাগলে মনে করা হয়ে থাকে কেউ মনে করছে।
৮০. দাড়ি বেশি কামালে দৃষ্টি শক্তি কমে যায়।
৮১. কুটুম পাখি ডাকলে বাড়িতে কুটুম বা অতিথি আসে।
৮২. বিড়াল পা চাটলে ঘরে অতিথি আসে।
৮৩. সন্ধ্যা বেলা ভাজা পোড়া খাবার বাইরে নেওয়া যাবে না।

www.pathagar.com

৮৪. বাড়িতে সাদা কবুতর থাকা সৌভাগ্যের ও শান্তির প্রতীক।
৮৫. সন্ধ্যা বেলা ভিক্ষা দেওয়া উচিত নয়।
৮৮. বেশি লবণ অপচয় করলে অমঙ্গল।
৮৯. নখ খুব ছোট করে কাটলে দৃষ্টি খারাপ হয়।
৯০. ভূত, জ্বীন, পরীরা অস্তিত্ব ও অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস।
৯১. রাতে দুধ ডিম খাওয়া যাবে না।
৯২. আনারস খেয়ে দুধ খেলে মারা যাবার সম্ভাবনা থাকে।
৯৩. এক সাথে চারটি শালিক দেখলে বাড়িতে মেহমান আসে।
৯৪. কারোর মাথায় টিকটিকি পড়লে সে ধনী হয়।
৯৫. দুধ খেলে মাথা ব্যথা কমে।
৯৬. নববধূকে ধান দুর্বা দিয়ে বরণ করলে সে সংসারে উন্নতি হয়।
৯৭. হিন্দুদের কলসির জল কোন মুসলমান ছুলে জলসহ কলসি ফেলে দিতে হয়।
৯৮. পুরুষদের পর মেয়েদের খেতে নেই।
৯৯. সতী নারীর পতি মারা যায় না।
১০০. গরম খাবার ফু দিয়ে খেতে নেই।
১০১. কেউর (কারুর) উজায়ে (উপরে) উটলে শরীল ছানল (ছুঁইলে) লাগে, তাইলে কইম্‌মা যায়।
১০২. ভাতের পাতিলে লুছনি না দিয়া খাইলে ঠাডা পইড়া মরে।
অর্থ বা ব্যাখ্যা : রান্না করার পর ভাতের পাতিল ন্যাকড়া দিয়ে মুছলে সে বউ বজ্রপাতে মারা যায়।
* ঠাটা = বজ্রপাত
* লুছনি = ন্যাকড়া

সারা খাতুন, তথ্য প্রদান কারী

www.pathagar.com

লোকপ্রযুক্তি

আদিমকাল থেকেই মানুষ তার জীবনের সমস্যা সমাধানে প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছে। এক্ষেত্রে বাস্তব জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগের সাহায্য নিয়েছে। শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানবসমাজ প্রয়োগ করেছে লাঙল-মইয়ের। শিকারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে নানান লোকপ্রযুক্তি। যেমন, মাছ শিকারের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র। ধান ভানার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে ঢেঁকি। লাঙল, মই, চাঁই, ঢেঁকি, জাঁতি এসব খুব সহজেই তৈরি করে ব্যবহার উপযোগী করেছে গ্রাম্য সাধারণ মানুষ।

১. খইয়ের চালুন

খইয়ের চালুন বা চালনা—গৃহস্থলী সামগ্রী। খইয়ের চালুন সাধারণত খই থেকে ধান বাছাই কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি একটি লোকপ্রযুক্তি। এ চালুন বাঁশের তৈরি যা হাত চালুন থেকে অপেক্ষাকৃত বড়। বর্তমানে গ্রামে-গঞ্জের ধান থেকে খই করার প্রচলন প্রায় উঠেই গেছে। আর সাথে সাথে এ চালুনের ব্যবহারও নেই বললেই চলে। তবে কোনো কোনো গৃহস্থের বাড়িতে সখের ২-১ টা জিনিসের মধ্যে চালুনও দেখা যায়। খই-এ চালুনের কারিগরের সঙ্গে কথোপকথন হয় তার বাড়িতে। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয় ২০১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। সময় : সকাল ১০.৪০ মিনিট।

সংগ্রাহক : আপনার নাম কী?

কারিগর : আমার নাম মো. হাফেজ উদ্দিন ফকির (টুনু), বাবার নাম : মো. নিজাম উদ্দিন ফকির, মায়ের নাম : নছিমন খাতুন।

সংগ্রাহক : আপনার গ্রামের ঠিকানা বলুন।

কারিগর : গ্রামের নাম : মাটিয়াকুড়া (উত্তর), উপজেলা : ধাতুয়া, উপজেলা : শ্রীবর্দী,

জেলা : শেরপুর।

সংগ্রাহক : আপনার বয়স কত?

কারিগর : ৭৫ বছর।

সংগ্রাহক : কতদিন আগে একাজ আরম্ভ করেছেন? আগে কী করতেন?

কারিগর : ১৫ বছর থেকে এ কাজ করেছি। পাশাপাশি কৃষি কাজও করি।

সংগ্রাহক : আপনার এ কাজে অন্য কেউ সাহায্য করে কী?

কারিগর : না, সাহায্যকারীর প্রয়োজন পড়ে না। নিজে নিজেই করি।

সংগ্রাহক : আপনার কাজে কাঁচামাল কী কী লাগে?

কারিগর : বাঁশ ছাড়া গুনা বা তার লাগে?

সংগ্রাহক : যন্ত্রপাতি কী কী লাগে?

www.pathagar.com

কারিগর : দা, করাত, হাতুড়ি ও বাটাল?

সংগ্রাহক : একটা বড়ো চালুন তৈরি করতে কতদিন সময় লাগে?

কারিগর : এখন বয়স বেশি হওয়াতে একটু বেশি সময় লাগে। একটা তৈরি করতে প্রায় ৩ দিন সময় লাগে।

সংগ্রাহক : এ কাজ করে আপনার সংসার চলে?

কারিগর : মোটামুটি ভালই চলে?

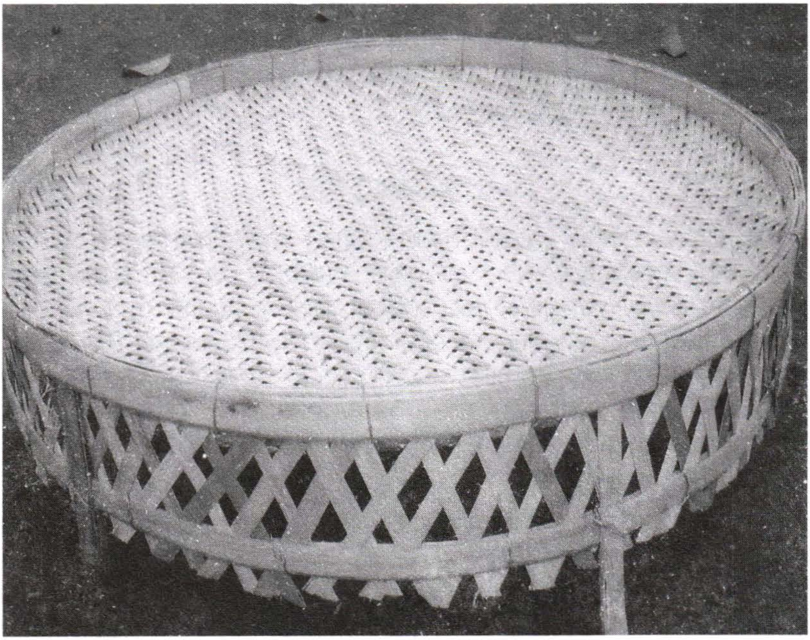

খই চালুন

২ .গরুর মুখের ঠুলি

বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের মতো শেরপুর অঞ্চলেও বাঁশের তৈরি গরুর মুখের ঠুলি তৈরি হয়। কারো ফসলের খেতে যাতে গরু মুখ লাগাতে না পারে অর্থাৎ কারো ফসলী খেতের পাশ দিয়ে গরু নিয়ে যাবার সময় গরু যাতে ফসল খেতে না পারে সেজন্য এই ঠুলির ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় হাল চাষের ক্ষেত্রেও ঠুলি পরানো হয়।

www.pathagar.com

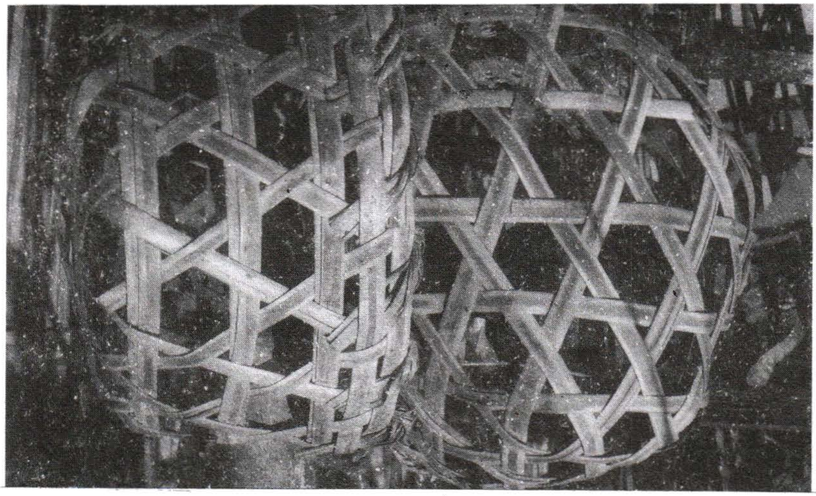

গরুর মুখের ঠুলি

৩. মাছ ধরার ঠেলা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাছ ধরার জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরনের লোকযন্ত্র। যা বাঁশবেত ও জালের তৈরি। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর তৈরি মাছ ধরার ঠেলা ছাড়াও রয়েছে বাইর, ছাই প্রভৃতি।

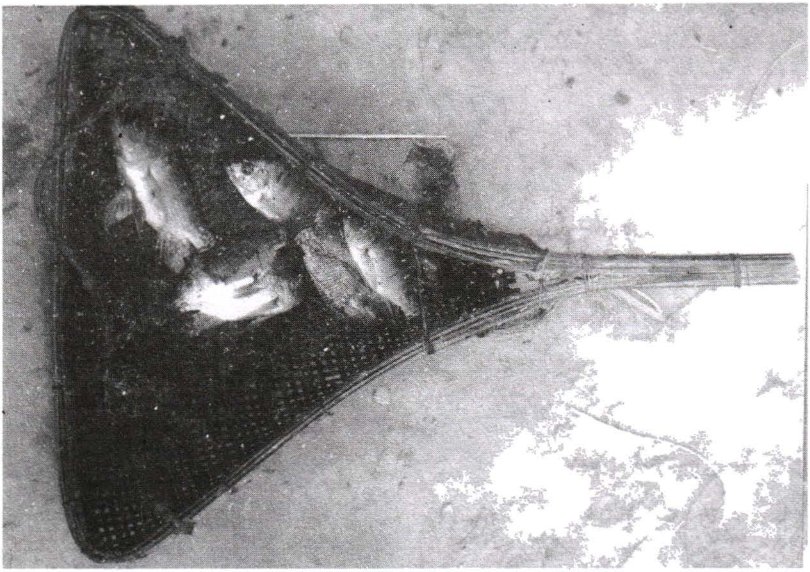

বাঁশের তৈরি কোচদের মাছ ধরার ঠেলা

www.pathagar.com

৪. মই

বাঁশের তৈরি মই সাধারণত ছুতাররা তৈরি করে থাকেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ বাঁশের টুকরা মাছখানে ফেড়ে চেঁছে মই তৈরি করা হয়। অল্প খরচে এই লোক প্রযুক্তি জমিতে চাষের পর মাটি মিহি করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

লাঙ্গল ও জোয়ালের সঙ্গে মই

৫. মাছ ধরার চাঁই

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো শেরপুর অঞ্চলেও বিশেষ করে বর্ষাকালে মাছ ধরার জন্যে বিভিন্ন ধরনের চাঁই ব্যবহার করা হয়।

মাছ ধরার যন্ত্র

www.pathagar.com

লোকভাষা

কথায় আছে, 'এক দেশের বুলি অন্য দেশের গালি'–এই বাক্যের 'দেশ' শব্দটি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোন অঞ্চল বা জেলা বা আরও শেকড়ে গ্রাম। আর 'বুলি' অর্থে আহমদ শরীফ সম্পাদিত বাংলা একাডেমীর অভিধানে 'কথা, বাক্য, ভাষা, বা শব্দের প্রায়োগিক প্রকাশ' 'গালি' মানে 'কটু বাক্য গালমন্দ, ভৎর্সনা, অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ বা অশিষ্ট বাক্য' অর্থাৎ কোন একটি অঞ্চলে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ বা কটু বাক্য হতে পারে বা হয়। যেমন—শ্যালক অর্থবাচক শালা বা হালা শব্দটি বাংলা ভাষায় গালি অর্থে ব্যবহৃত হলেও ঢাকাবাসীদের ভাষায় তা গালি অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এটি একটি অব্যয় মাত্র। কখনও কখনও অর্থহীন। তাই নিশ্চিন্তে তারা বলতে পারে বাপ হালা, মা হালা, আবে হালায় ইত্যাদি।

আবার দেখা যায়, কোন প্রমিত বা সাধারণ শব্দ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপে ব্যবহার, উচ্চারণ, প্রয়োগ বা আবৃত্ত হয়। আঞ্চলিকভাবে উচ্চারিত বা ব্যবহৃত এরূপ শব্দকে আঞ্চলিক শব্দ হিসেবে গণ্য করা হয়। যেমন পুত্র শব্দটি। এই পুত্র অর্থে তনয়, নন্দন, ছেলে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায়, অঞ্চলে নানাভাবে বলা হয়ে থাকে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর আঞ্চলিক ভাষার অভিধান গ্রন্থ থেকে তুলে ধরা হলো : যেমন–'দিনাজপুরে ছাওয়া, বগুড়ায় ছৈল, পাবনায় ছাওয়াল, রংপুরে ব্যাটা, মানিকগঞ্জে সাওয়াল বা পালা, ময়মনসিংহে পুৎ, ময়মনসিংহে হাজং উপভাষায় পলা, সিলেটে পুয়া, কুমিল্লায় পুৎ, সন্দ্বীপে বেটা, ফরিদপুরে পোলা, খুলনায় সওয়াল, বরিশালে পোলা, যশোরে সল, চট্টগ্রামে পোয়া, নোয়াখালী (রামগঞ্জে) হুত, নেত্রকোনায় গেদা, পঞ্চগড়ে বেটা এবং চট্টগ্রামে (চাকমা উপভাষায়) পোয়া।' আর শেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় এই পুত্র শব্দের নানা রূপ লক্ষ্য করা যায়। যেমন পুৎ, ছেলে, পুনাই, গেন্দা, ছ্যাড়া ক্যানা, পোলা ইত্যাদি।

১. সাধারণ শব্দের আঞ্চলিক শব্দ

ক. শেরপুর অঞ্চলেও (ো) কার উচ্চারণের ক্ষেত্রে (ু) উ-কার উচ্চারণ করা হয় যেমন চোর (চুর), মোর (মুর), গোছল (গুছুল) ইত্যাদি। গাজীপুর ও বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলেও এরূপ উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায়।

খ. শেরপুর অঞ্চলে সাধারণ শব্দের (মূলত সাধু কথ্য ভাষায়) মহাপ্রাণ ধ্বনির উচ্চারণ স্বল্পপ্রাণ ধ্বনিতে উচ্চারিত বা ব্যবহৃত হয়। যেমন–ঘর (গর), ভাত (বাত), ধ্বংস (দংস) ইত্যাদি।

গ. শেরপুর অঞ্চলে সাধারণত শব্দের শেষ বর্ণ অক্ষর 'বো' এর ক্ষেত্রে 'মু' হয়ে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। যেমন – যাবো (যামু), খাবো (খামু), ঘুমাবো (গুমামু) ইত্যাদি।

www.pathagar.com

ঘ. শেরপুর অঞ্চলে 'শ' বা 'স' বর্ণ 'হ' হয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন–শ্বশুর (হওর), শসা (হশা), শাক (হাক) ইত্যাদি।

ঙ. শেরপুর অঞ্চলে কোন কোন শব্দ একেবারে পরিবর্তিত রূপে উচ্চারিত হয় যেমন–তরকারি (ছালুন), কাঁথা (খ্যাতা), আইল (বাতর), এখানে (ইনু), ওখানে (ওনু) ইত্যাদি।

প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তেই পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত আঞ্চলিক শব্দে কথা বলেন শেরপুর অঞ্চলের মানুষ। সেটি ঘরে হোক, হোক হাটে-মাঠে, ক্ষেতে-খামারে, ঘাটে-বাজারে, সভা-সমিতিতে, অনুষ্ঠানে কিংবা স্কুল-কলেজ। তেমনি স্কুল, পাখি, গাছ, মাছ, মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈনন্দিন ব্যবহৃত উপকরণ সব কিছুরই আঞ্চলিক রূপে উচ্চারণ করে যাচ্ছেন অঞ্চলের অধিবাসীরা। এখানে জাতীয়, প্রমিত শুদ্ধ বা সাধারণ শব্দের পাশাপাশি বন্ধনীতে শেরপুর অঞ্চলের কিছু শব্দের রূপ তুলে ধরা হলো। উল্লেখ্য, শেরপুরের উল্লিখিত আঞ্চলিক অনেক শব্দের সাথে বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক অঞ্চলের শব্দের মিল থাকতে পারে।

পথ বা রাস্তা (গুনার), কবুতর (কৈতর), লবণ (নুন), হুকা (উক্যা), গোবর (নাদা), কাঁঠাল (কাডল), ডিম (আণ্ডা), পালক (ফৈর), হলুদ (অল্দি), পাকা (পাহা), গর্ত (গাতা), লাউ (নাই), কাদা (প্যাক), নদী (গাঙ), কাকা (কাহা), এসেছেন (আছুইন), পরীক্ষা (পরিক্যা), করল্লা (কইল্ল্যা), ভর্তা (ছানা), বাচ্চা (ছাও), থুথু (ছ্যাপ), পাগল (পালগা), বাথান (বন্দো), খড় (খ্যার), তৈল (ত্যাল), সরিষা (হইর্যা), চাল (চাউল), রান্না করা (আন্দন), শুয়ে থাকা (হুততে থাহা), লেজ (নেঙ্গুর), উরু (ওরাত), হাঁটু (আডু), কাক (কাইয়্যা), ব্যাঞ্চ (বিরিঞ্চি), স্বপ্ন (হবন), খড়া (খরান), বৃষ্টি (ম্যাগ), সাঁতার (হাতার) ঝাড়ু (জাঠা), তালই (তাওঅই), রক্ত (অক্ত), বেটে (বাইট্যা), ফর্সা (সাফ), ঝগড়া (কাইজ্যা), অন্ধকার (আন্দাইর), চাঁদ (চান), সূর্য (বেইল), উঁকি (ফুসকি), দাও (দেও), কবর (কব্বর), চিরুনি (কাহই), সিধ কেটে (হিন্দুর কাইট্যা), ডাটা (ডাইগ্যা), কিসসা (কিরছ্যা), স্বাদ (মজা), ঝাড়ু দেওয়া (হুরা), শিং (হিংগা), সর্দি (প্যাটা), কাছা (নেংটি), হাড়ি (নান্দে), মহিলা বা নারী (বেইট্যান), হাড় (আর), দক্ষিণ (দহিন), ঝাড়ু (বারুন), বৈঠকখানা (দহলগর), মণ (মুন), শরীর (গতর), লেখাপড়া (নেহাপড়া), রবিবার (অবিবার), বৃহস্পতিবার (বিষদবার), কার্তিক (কাতি), পৌষ (পুষ), ভাদ্র (বাদ্দর), টাকা (টেহা), পয়সা (পইস্যা), মোরগ/মুরগী (চরই), হাঁস (আস), লাঙল (নাঙল), বালিকা/মেয়ে (ছেরি), চামড়া (ছাল), সলতা (পইলত্যা), সুইসুতা (হুইহুত্যা), মজুর (কামলা), নৌকা (নাও), ঢাকনা (পশুন), মাথা (কাল্লা), রগ (অগ), লুঙ্গি (তবন), দূরে (ফারাকে), ফুসফুস (ফ্যাফরা), পাটখড়ি (হোলা), গুড়ি (মুতা), গুড় (মিঠাই), জঙ্গল (আরা), কুকুর (কুইত্যা), বিড়াল (বিল্যাই), লোহ (নোয়া), কেচো (চেরা), শুকর (হুয়র), ঘুঘু (ডুপি), শকুন (হগুন), চড়ুই (চরা), বাবুই (বাওঅই), ঠাণ্ডা/শীত (জার), উষু (উম), মই (চঙ্গা), পেডিকুট (ছায়া), উইপোকা (উলু), কচুরিপানা (দল), বাজার (আডও), গর্ত (খোরল), পুরুষ (মরদা), মহিলা (মেরদি), বাঁকা (বেহা), সরিষার তেল (খাচত্যাল), কাচা (খচা), ছিড়া

কাথা (জুইল্যা খ্যাতা), লেবু (নেব্বু), চেটে (পুইচ্যা), হাতি (আত্তি), বাঁশের তৈরি মাছরাখার পাত্র (খালই), মাছ ধরার উপকরণ (হরগা, চোপ মান্দা), ঢেঁকি (ডেহি), সবাই (বেকেই), গরম (ততা), সকাল বেলা (বিয়ান ব্যালা), লাঠি (পজুন), ধোয়া (খলানি), তোমাদের (তৌংগরে), গান (গাহেন), চামচ (আতা), বিরক্ত (বেজার), বসো (বহ), হাতপাকা (বিছুন), পিঁড়ি (পিরয়্যা), মেঘ (হাজ), সেচ (হিচ্যা), কলা গাছের কাণ্ড (বুগি) ভেলা (বুরয়্যা), কচ্ছপ (কাছিম), মাড়ান (মলন), মজুরি (ময়না, খুরাকি), বোতাম (বুত্তম), তামাশা (তামসা), গোছা (কান্দি), শক্ত (ডাট্টি), বাঁকা (তেরা), আত্মীয় (খেশি), চর এলাকার লোকদের (চইর্যা), গালি অর্থে (পুংগির বাই) ইত্যাদি।[১]

কিছু বাক্যের ব্যবহারে এবার দেখানো যেতে পারে শেরপুরের আঞ্চলিক শব্দর রূপ। ছালুন আন্দিছো (তরকারি রান্না করোছো), আডো গেতাছ (হাটে যাচ্ছো), গুছুল কইর‍্যা তবনটা খলাইও (গোছল করে লুঙ্গিটা ধুয়ে এনো), ইন্দে যামু না (এখান দিয়ে যাবে না), গাহেন হুনবার গেতাছ (গান শুনতে যাচ্ছো), খেতের বাতরে ম্যালা প্যাক (ক্ষেতের আইলে অনেক কাদা), হওর বাইত তনে কী আনছুইন (শ্বশুর বাড়ি থেকে কী এনেছেন), ছেরি ছাল তুইল্যা ফেলামু (এই মেয়ে চামড়া তুলে ফেলবো), বাজান বেইল উইঠ্যা পরছে (বাবা/আব্বা সূর্য উঠেছে), গুনারে আইগ্যা থুইছে (রাস্তায় পায়খানা করেছে), হুনছুইন কেনিরে বিয়্যা দিবাইন ন্যা (স্বামীকে উদ্দেশ্যে করে স্ত্রী বলছে; মেয়ে বড়ো হয়েছে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করতে), মাইয়্যা খেতাডা দেও দেহি (মা কাঁথাটা দাও তো), বিয়ান বেলা জার করে (শীতের সকালে ঠাণ্ডা লাগে), কাইল ঢাহা যামু (আগামীকাল ঢাকা যাবো), ইত্যাদি। আঞ্চলিক শব্দের শক্তি এতোই প্রবল যে, কেউ কেউ সারাজীবনেও আঞ্চলিকতা থেকে মুক্ত হতে পারেন না। ঢাকায় বসবাস করছে শেরপুর অঞ্চলের এমন অনেক মানুষ আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার করেই যাচ্ছে, অবশ্য এটি শুধু শেরপুর অঞ্চলের লোক কেন, নোয়াখালি, বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বগুড়া, রংপুর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের লোকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

আউশ (শখ), কেন্তা, গেন্দা, পুনাই, পুলা, ছেড়া (ছেলে শিশু বা বাচ্চা), কেন্তি, গেন্দি, পুনাই, পুরী ছেড়ি (মেয়ে শিশু বা বাচ্চা), জী, মাইয়া (মেয়ে), পুত, বেডা (ছেলে), ফেনি (আয়না), কাকই, কাহই (চিরুনি), বল, বলডিশ (গামলা), গুনার (সরু রাস্তা), আইল, বাতুর, বাত্তুর (আল ক্ষেতের আল), মাচা, উগার (জিনিসপত্র রাখার উঁচু স্থান–বাঁশ দিয়ে নির্মিত), গোলা, বাহারি (ধান রাখার উচুঁ স্থান), গাঙ (নদী), এইন্য (এখানে), জেহর, জেওর, জের (গয়না বা গহনা), সমাস (শসা), পাইব্‌বা, পাবনা, পিপা (পেঁপে), মইচ (মরিচ), অলুদ, অলদি (হলুদ), বাইগন, বাইগুন (বেগুন), আও, আয়ো (এসো), টক বেগুন, টক বাইগন, টক বাইগুন (টমেটো), ছানা (ভর্তা), আলুর গুডা (আলু), হীরা, সুরুদ, সুরা (তরকারির ঝুল), সালুন (তরকারি), হাজ, হাইন্‌জা (সন্ধ্যা), পাইল (দোহার), বও, বহ (বসো), ফেড়, ফাড়া (বিপদ), হেইয়ো, হইয়োলে (ঠিক আছে), পিঙলা (সোনালি, রঙিন), আপিত্তি (সাধ, আহ্লাদ, শখ), আতাফাতা (তাড়াতাড়ি), আজাইরা (অযথাই, নিরর্থক, অকারণ, অতিরিক্ত, যার

www.pathagar.com

কোনো কাজ নেই), হাত করানো (কান্না থামানো–বাচ্চাদের বেলায়), জিলিঙ্গা (কান্না করে বা ভয়ে একেবারে অস্থির, বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়া), হুচ (জিজ্ঞাসা), চেগার (বাঁশ বা টিনের বেষ্টনী (বাউন্ডারি), বাঁশ বা টিনের দেয়াল, হতাৎ (সভ), আমুদ (আনন্দ), আকপাইল্‌লা (অভাগা), ঘুচানো (খোলা), খেজমত (সেবা - ঐ ত্র), আইন্‌না (বিস্বাদ, লবণ ছাড়া), বেজার (বিরক্ত), মুরুব্বী, ময়মুরুব্বী (বয়স্ক মানুষ, গণমান্য প্রবীণ ব্যক্তি), আনাজ (তরকারি), আবিল্লি, লইল্‌লাট (ঝামেলা, বালা মুসিব্বৎ), শুররী মাফা (পালকি), আংরা, আংটা (কাঠের আগুন), শমার (ধৈর্য), আছমবিত্তি, আতকা (হঠাৎ), আট্টাস, টাসকা (চমকে যাওয়া, কোন খবরে স্তব্ধ বা অবাক হওয়া), টিউরি, পাহাল, চুলা (উনুন), গিলাপ (চাদর), বিচুন (হাত পাখা), খেশি, শাগাই, ইষ্টি (মেহমান), বেজায় (ভীষণ), হাঙ্গা (নিকাহ বিশেষ করে দ্বিতীয় বিয়ে বোঝায়), পেশাব (প্রস্রাব), মেসাব হৌরি (শ্বশুর), হৌরি (শাশুড়ি), আলোছি (আহ্লাদী), বাজি, বাজান, বাপ (বাবা, পিতা), মাজান, মায়া, মাও (মা, মাতা), বেডাইন, বেডা (পুরুষ), বেইট্‌ টাইন, বেডি (মহিলা), হাবিজাবি (আজে-বাজে), খচ্চড়, খাচ্চাড়, নাখারিষ্টা, খাইচ্চড় (নোংরা), মজমা (আসর), টেঙ টেঙা (ধারালো, লিক লিকে), উজাইয়া বা উজায় উজা, উজানো (বিষম খাওয়া, বেশি বাড়া অর্থে), বিয়ান (সকাল), বুড়া (মন্দ), কডুল (বাঁশের চারা), মেলা (অনেক), আঙ্গর, আমগর (আমাদের), জাতা (ঠাসা), বুগলে (কাছে), তরদা (স্তব্ধ), আড়া (জঙ্গল), বাদলা, গাদলা (বর্ষা), ছাতা (আজে বাজে, কিছুই না), হুদাই (এম্নি এম্নি, অকারণ, শুধু শুধু) আনাড়ি (বোকা), হাচা হাচ্ছা (সত্য), মিছা (মিথ্যা), যুদা (আলাদা), ছেড়াবেড়া (অগোছালো), খাড়া (দাড়ানো বোঝায়), হইল্‌লো (মেরামত, ঠিক করা), জোহার (কলরোল, হইচই), কেরাই, টেমক, দেমাগ, ফরেস্টরি, কেফা .(অহংকার বিশেষ ভঙ্গিমা প্রদর্শনও বোজায়), ধাত্তর, ধার (বোধ, টের পাওয়া, অনুমান আন্দাজ) গাইল, মুক করা (গালি, বকা, বকুনি) সোয়ামী, হাইন, ভাতার (স্বামী), মাজা (কোমর), পাছা (নিতম্ব), বুনি, দুধ (স্তন), কুডা, আইবকা (লম্বা বাঁশ দিয়ে তৈরি যন্ত্র যা দিয়ে ফল পাড়া হয়), হরু (সরিষা), সারগিত (অনুসারী), বেন (যেন), ভার (বিষণ্ন), ঘাগু (ভোতা), বুলানো (ডাকা), তেজাতেমি, (রাগারাগি, রাগ করা), বিগাড় (বেশি রাগ বোঝায়) আউল, আউর, ফ্যাসাদ, ফ্যাকড়া (ঝামেলা), আম্ব (আমি), আলোইত্‌তাপনা (আহ্লাদ করা, আদুরে পনা), বার বার, (অমনি একই রকম, আগের মতো, হুবহু) পরাইত্‌তাবালা, পতইরাবালা (সেহরীর সময়), বেইন্‌নাবেলা (সকাল), এলাও (এখানো), পিটনা (মার), লগে (সাথে), এবে, এবেই (এম্নি এম্নি, অকারণে), এল্লা, এজলা (একটু খানি), নাইওর (বেড়ানো, বিশেষ করে বৌ ঝিদের বাপের বাড়ি বেড়ানো বোঝায়), গতর (গা), গতর দেওয়া (পোশাক পরিধান করা), খেদানো (তাড়ানো), বাত্তি (পরিপক্ক), তামাশা (মজা), উছিলা, ছুতা (অজুহাত), উরস (ছারপোকা), ডাইয়া, জার (শীত), ততা, উন্তা (গরম), খাশম, দুলা (জামাই), আন্দাজ (অনুমান), কুজকাজ (চাপাচাপি, ঠাসাঠাসি), বেমালুম (পুরোপুরি), মালুম (বোধ), মাগনা (বিনা দামে, বিনা পয়সায়), কেওয়াজ, কাইজ্জা (ঝগড়া), জিরান (বিশ্রাম নেয়া), আক্‌কল (বোধ) বে আক্‌কল (বিবেচনাবোধ নেই যার), ফোরা (আথাই,

www.pathagar.com

নিরর্থক) গপ, গপপো (গল্প), জিনজির (শেকল), ওটকানা, তেলই (হলুদ, সরিষা, দুর্বা, ধান মিশ্রিত উপাদান - ঐ। বিয়ের গোসলের সময় ব্যবহার করা হয়), পুস্কুনি, পাগার, ডিগ্গি (দিঘি, পুকুর), নাওয়া (গোসল), সাফ (পরিষ্কার), দেয়া, হাজ (মেঘ), আউল (আড়াল), বাইর, বুচিনা (বাঁশের তৈরি মাছ ধরার যন্ত্র), লাকড়ি, খড়ি (জ্বালানী কাঠ), হাছুন, বারুন (শনের ঝাড়ু), ডাডি (শক্ত), ডর (ভয়), কুলুপ (বাতির উপরের অংশ), পাইল্‌তা (সল্‌তে), ডাম (শিশির), খুরা (বাটি), দুয়াত (কুপি), জবান (কথা), মাতব্বর (মোড়ল, নেতা), মাতব্বরি (নেতাগিরি, মোড়লিপনা), বাগাড় (ফোড়ন, তরকারিতে ফোড়ন দেয়া), জোয়ান (যুবক), এহন, এসুম, এলা (এখন, এই সময়), এটু (একটুখানি), বাওয়ামা (লাউয়ের খোল), জারি (পতলের কলসি), জুনি (জোনাকি), ওসুম, তহন, হেলা (ওই সময়, তখন), কোনসুম, কোমবালা (কোন সময়, কখন) জয়রা (দৈর্ঘ প্রস্থে সমান না হওয়া তেরচা অসমান), বেডং (বালিশের ওয়াড়), খেতা (কাঁথা), কসকাল (গণ্ডগোল), ওশি, উস্‌সী (সীম), মুতা, ভুতা (খাট), ডে বাতি (দেশলাই, ম্যাচ), হুতা (শোয়া), বেহুদা (অযথাই, অকারণ), হুল্লাবিল্লা (তাড়াতাড়ি, তাড়াহুড়া), বিলাই (বিড়াল), কুত্তা (কুকুর), আংগার (জামা), পেঁচাল (বেশি কথা), রাও (কথা), ডিগরা, হাচার, খুট (গরু, ছাগলের দড়িতে বাঁধা খুটি মাটিতে পুতে রেখে ঘাস খাওয়ানো), রুই (তুলা), কেতকুতানি (কাতুকুতু), বাহুতরা (ভবঘুরে), খেড়হি (জানালা), জাম্পার (সোয়েটার), ছেড়াইন (ছেলে), ছেইড়াইন (মেয়ে), উরকা, চড়ই (মুরগী, মোরগ), ডুহি, ঢুহি (ঘুঘু), কইতর (কবুতর), ক্ষোমা (তালাক বোঝায়), খেন্ত (বিরতি, থামা), থেন্‌হা, থেক্কান (ঝাঁকুনি), কেচলামি, রেজলামি, ইয়ার্কি, কেরছামি (রসিকতা), লাহই, চডা (ভাজাকাঠি), ডই, ডাবুর (নারকেলের খোল এ বাঁশ দিয়ে তৈরি ডাল বাড়ার যন্ত্র), দলিদ্দর (অপচয়কারী, অমিতব্যয়ী), কাইচলা (কচি), বান্দর তেন্দর (দুষ্টু), তলে (নিচে), পাইত্‌লা ডহি (পাতিল), টুম্ভা, গুঁজা (কুঁচকে যাওয়া কুঁড়ানো), টান্ডা (দুঃশ্চিন্তা, টেনশন, পিছুটান), ছাও, ছানা (বাচ্চা), গিরস্ত (গৃহস্থ কৃষিকাজ করেন এরকম বোঝায়), আম্মক, জুলা (বোকা, বিবেচনাহীন), অমুকালে (এই সময়ে), বেক, বেবাক (সব), দেউরি (বাঁশের তৈরি বেষ্টনী বাউন্ডারি, বাঁশের দেয়াল)। বেবাকতে, বেকে (সবাই)।[২]

হেদাইন্‌না, ফেদা (ফালতু), বিরিঙতাল (বিশৃঙ্খলা), ঘোলা (ফোকলা), খাজ্জানি (চুলকানি), অগিলজ (অপ্রিয় বস্তু), শর্মিতা (লাজুক), বিদিগিস্তা, বেছবি (বিশ্রি), ওত্তুজলা, এত্তুজলা (খুব ছোটো), নাজাই (কমতি, ঘাটতি), এক বুইল্লা (এক গুঁয়ে), খেড়, নাড়া (খড়), গিল্লা (নিন্দা), আরজালা (উছৃঙ্খল), বাতান (পাল), খেওড়াল (খেলোয়াড়), দুরহে বালা (দুপুর বেলা), উদাইরা (বুদ্ধি হীন, বোকা), পিচাইম্মা (রুগ্ন), বেলাশা (লাজহীন),

খিৎকাইল্লা (বিরক্ত সৃষ্টিকারী), মতলব (গোপন ইচ্ছে বোঝায়), গাতা (গর্ত), খোশকাইল্লা (হাসি খুশি), জেতা (জীবন্ত), গেতাছে (যাচ্ছে), মালামত (শান্তি প্রদান), তেনা (ন্যাকড়া), কেছইক্য (কৌতুকপ্রিয়), তবন (লুঙ্গি), আলগাত (অন্য জায়গায়), হেই (আচ্ছা), হেইবালা, হেলা (তখন)

www.pathagar.com

রাইজালা (যন্ত্রণা, অত্যাচার), মেত্তরহা (দুর্বল, ক্ষীণ), আগাইরামারা (বড়োসড়), পেঙ্গানি (কান্না), ফুক, কুশার (আখ), হানজু (তরতাজা, টাটকা), কাইনজা (নষ্ট, পঁচা), বাইরেগে (বাইরে), করহা (মূলত আগের দিনের ঠাণ্ডা ও শক্ত হয়ে যাওয়া ভাত বোঝায়), খামিদামি (লাফালাফি, অস্থিরতা বোঝায়), তইছা (অস্থিরতা), পেলা (ঠেলা), তেবিৎলা, বিডাল, ঘাউড়া (একগুঁয়ে ও দুষ্টু বোঝায়), পরতালা (যাচাই, তুলনা), আউইরা (বিশৃঙ্খলা), হাদরে বাদরে (হঠাৎ), কাওট্টা (পাষাণ), তেখিরছা (ইতর), হমদ (সম্পর্ক), আ-খাওরা (কখনো কিছু খায়নি দেখেনি এমন ভাব বোঝায়), থাপড়া, থাওল্লা (থাপ্পড়, চড়), বারাইন্না (অবুঝ), মিডা (মিষ্টি), ঢেহুইরা (অলস প্রকৃতির), ঢেওয়্যা (অলস), কিপটা (কৃপণ), হোলা (পাটকাঠি), চুক্কা (ধারালো সরু অংশ সাধারণত কোন জিনিসের উপরের দিক), ব্যবলা (আহম্মক), আদইরহা (খাই খাই ভাব বোঝায়), গুঁজা (বাঁকা, কুঁচকানো), চাপা (তর্ক), বেইল (বেলা, সূর্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়), লাজ, শরম (লজ্জা), বন্নি (বদনা), ঢাহুন, সরা (ঢাকনা), আমলি (ফনশী), কীত্তি-কারহানা (কাণ্ড-কারখানা), হলবইল্‌লা (সপ্রতিভ), সই (ঠিক, দস্তখত), অলক চলক (নড়াচড়া), কেমড়ে কেমড়ে (ক্রমে ক্রমে), বেহা (বাঁকা), আওলামুইখ্‌খা (সর্বদা কথায় কথায় কাঁদে এমন ব্যক্তি), চিরহা (জীর্ণ স্বাস্থ্য অর্থে), আইত্‌তান কাইত্‌তান (অবিরাম বর্ষণ বোঝাতে), অদুন (ওরকম, এরকম), মৌসা (খালু), মই (খালা), শইল (শরীর), বালা (ভাল), দেনহা (দেখতে), মইল্‌লা (আপদ), খান্নাছ, দর্জাল (ঝগড়াটে মহিলা, খারাপ মহিলা), বেলেহেজ (লাজহীন), ছেহাড (বে-আদব), বেরাহা (খুব), টুইরা টুইরা (ছোটো ছোটো), বাইন (জায়গা), গিদর (অপরিচ্ছন্ন, শূকর), গেজলাওড়া (রসিক), চেরচেইরা (চিকন শরীর), কেরপেট (প্যাঁচ মোচড়), আট কাল (অনুমান), বেইল ঘুম (হালকা ঘুম), পুইন্‌না, পুইশ্‌না (দত্তক), কিবে, কিদুরান (কেমন), লেচ্চড় (খাওয়ার লোভী), চান্নি (চাঁদ), হগিন (শকুন), মুনজানো (বন্ধ করা, মুছে দেয়া), অদুরান (এমন, ওমন), হিবার (আবার), বেহেই (সবাই), জাবরাইয়া বা জাবরে ধরা (জড়িয়ে জাপটে ধরা), হলক (আলো), আধামাধা (কোন রকম), কত্তোডি, কতোগুলান (কতোগুলো), ঠাট (দাপট), কাবু (ঘায়েল), কামাই (বাদ দেয়া), হিরা, হিরাই, হিরাবার (আবার), বেগড়ে (কারণে, জন্যে) সরদিন (প্রতিদিন), ডাঙ্গর (লম্বা, বড়ো), সারজিব, হারজিব (সুবিধা)।[৩]

২. গারো ভাষার ১০০ শব্দ

শেরপুরের ৬টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ৩টি গোষ্ঠীর লোকেরা বর্তমানে নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। বাকি ৩টি জনগোষ্ঠীর লোকেরা বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতির সাথে মিশে যাচ্ছে। তারা বাংলা ভাষাতেই কথা বলে থাকে।

তবে কথা বলার মধ্যে আলাদা সুর এবং ছন্দ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ডালু এবং বানাই জনগোষ্ঠীর লোকদের নিজস্ব কিছু শব্দ রয়েছে আর বাকি যা আছে তার সবই বাংলা এবং বাঙালি সংস্কৃতির অবিকল। নিচে জনগোষ্ঠীগুলোর ভাষার রূপ বুঝানোর জন্য এক শ'টি শব্দ তুলে ধরা ধরা হল। তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন লক্ষেশ্বর কোচ।[৪]

www.pathagar.com

বাংলা শব্দ	গারো শব্দ	কোচ শব্দ	হাজং শব্দ	ডালু শব্দ	বানাই শব্দ	হদি শব্দ
পৃথিবী	আগিলসাক	দুনিয়া	দুনিয়া	পৃথিবী	পৃথিবী	পৃথিবী
আকাশ	সালগিসাক	সেক্রউ	পুরাদিন	আকাশ	আকাশ	আকাশ
বাতাস	বালওয়া	লাম্পার	বাতাস	বাতাস	বাতাস	বাতাস
সূর্য	সাল	রাসান	বেলা	সূর্য	সূর্য	সূর্য
চাঁদ	জাজং	লাংগ্রেক	চান	চাঁদ	চাঁদ	চাঁদ
তারা	আসকি	তারা	তারা	তারা	তারা	তারা
বৃষ্টি	মিক্কা	রাঙ	মেঘ	বৃষ্টি	বৃষ্টি	বৃষ্টি
মাটি	আ-আ	হাআ	মাটি	মাটি	মাটি	মাটি
পানি	চ্যি	ত্যি	পানী	পানি	পানি	পানি
পাহাড়	আব্রি	হাকুং	পাহাড়	পাহাড়	পাহাড়	পাহাড়
নদী	চিরিং	তিমাই	গাঙ	নদী	নদী	নদী
সাগর	সাগাল	ত্যিআমাই	সাগর	সাগর	সাগর	সাগর
বাড়ি/ঘর	নক্	নক	ঘর	বাড়ি/ঘর	বাড়ি/ঘর	বাড়ি/ঘর
ধান	ম্যি	ম্যাই	ধান	ধান	ধান	ধান
চাউল	মিরং	মাইরুং	চাল্	চাউল	চাউল	চাউল
মানুষ	মান্দি	মরদ	মান্	মানুষ	মানুষ	মানুষ
পুরুষ	মে-আসা	পুরষি মরদ	মরদ মান	পুরুষ	পুরুষ	পুরুষ
নারী	মিচিকসা	তিরি মরদ	তিমাদ মান	নারী	নারী	নারী
সন্তান/শিশু	বি্সা	মা্ক্রাই	হাপাল	সন্তান/শিশু	সন্তান/শিশু	সন্তান/শিশু
ছেলে (সন্তান)	মিআ বিসা	পুরষি	মরদ ছাওয়া	ছেলে (সন্তান)	ছেলে (সন্তান)	ছেলে (সন্তান)
মেয়ে (সন্তান)	মিচিক বিসা	তিরি	তিমাদ ছাওয়া	মেয়ে (সন্তান)	মেয়ে (সন্তান)	মেয়ে (সন্তান)
বড়	দাল্লা	মা্ তা	ডাঙ্গর	বড়	বড়	বড়
ছোট	চন্না	ট্যুটি	হোট	ছোট	ছোট	ছোট
সংসার	নকদাং	সংসার	সংসার	সংসার	সংসার	সংসার
গাছ	ফাং	পান	গাছ	গাছ	গাছ	গাছ
ফুল	বিবাল	পার	ফুল	ফুল	ফুল	ফুল
ফল	বিথি	থাই	ফল	ফল	ফল	ফল
মাছ	নাত্রিক	না্	মাছ	মাছ	মাছ	মাছ
গরু	মাৎচু	মাসু	গরু	গরু	গরু	গরু
ছাগল	দব্ক	পুরুন	হাগল	ছাগল	ছাগল	ছাগল
হাঁস	গাগাক	হাংসু	হাংঅস	হাঁস	হাঁস	হাঁস

www.pathagar.com

মুরগ	দ-অ	তাও	চরে মাগদা	মুরগ	মুরগ	মুরগ
ডিম	বিচ্ছি	পিতিক	ডিম!	ডিম	ডিম	ডিম
কলা	থিরিক	লে্থাই	কলা	কলা	কলা	কলা
আম	থিগাচু	বচত	আম	আম	আম	আম
কাঁঠাল	থিব্রং	পানচুং	কাহল	কাঁঠাল	কাঁঠাল	কাঁঠাল
কুকুর	আছাক	ক্যুই	কুকুল	কুকুর	কুকুর	কুকুর
বিড়াল	মেংগু	মেউ	বিল্লাই	বিড়াল	বিড়াল	বিড়াল
বাঘ	মাৎছা	ম্যাসা	বাঘ	বাঘ	বাঘ	বাঘ
ভাল্লুক	মাকবিল	বালুক	ভাল্লুক	ভাল্লুক	ভাল্লুক	ভাল্লুক
হরিণ	মাৎছক	ম্যাসি/ মাছক	হগড়া	হরিণ	হরিণ	হরিণ
হাতি	মংমা	হাতি	হাতি	হাতি	হাতি	হাতি
শিয়াল	বেল/ পেরু	শেল	শিয়াল	শিয়াল	শিয়াল	শিয়াল
খরগোশ	সাপ্লাও	হেজাবারি	ফটকা	খরগোশ	খরগোশ	খরগোশ
সাপ	ছিপ্পু	দুপু	হাপ	সাপ	সাপ	সাপ
বেজি	বিজি	লাহুলা	বিজি	বেজি	বেজি	বেজি
সজারু	মাৎমাছি	বুথি	হেজো	সজারু	সজারু	সজারু
শুকর	ওয়াক	ওয়াক	হুওর	শুকর	শুকর	শুকর
গুঁই সাপ	মাৎপ্রু	ম্যাল্লাও	গুলহাপ	গুঁই সাপ	গুঁই সাপ	গুঁই সাপ
বনরুই	কাওয়াটি	কাওতাই	কতুওয়াল	বনরুই	বনরুই	বনরুই
বনমহিষ	মারং	বনমুইষি	বনভোস	বনমহিষ	বনমহিষ	বনমহিষ
বানর	হামাক/ মাক্রি	কাউই	বান্দর	বানর	বানর	বানর
হনুমান	রাংগল	লাংকা	হনুমান	হনুমান	হনুমান	হনুমান
লজ্জাবতী বানর	গেলউই	ওলা মাক্রাই	লজ্জা বান্দর	লজ্জাবতী বানর	লজ্জাবতী বানর	লজ্জাবতী বানর
কাঠবিড়ালী	মাট	কালাং কাত্রাক	কতে বান্দর	কাঠবিড়ালী	কাঠবিড়ালী	কাঠবিড়ালী
উল্লুক	হুরু	হুল্লাও	উল্লুক	উল্লুক	উল্লুক	উল্লুক
মৌমাছি	বিজা	নিআ	মৌ পোকা	মৌমাছি	মৌমাছি	মৌমাছি
ঘাস ফড়িং	আগুক	আকুক	দাতে পোকা	ঘাস ফড়িং	ঘাস ফড়িং	ঘাস ফড়িং
দিন	সাল	সানক	দিন	দিন	দিন	দিন
রাত	ওয়াল	ফারক	রাতি	রাত	রাত	রাত
সকাল	প্রিং সাল	ম্যানাক	ভেন	সকাল	সকাল	সকাল
দুপুর	সাল-জাচ্ছি	দুপুর	দুপুর	দুপুর	দুপুর	দুপুর

www.pathagar.com

বিকাল	আনথাম	গাসুম	ভাটি	বিকাল	বিকাল	বিকাল
সন্ধ্যা	সিমসিমা	গাসুম	সন্ধ্যা	সন্ধ্যা	সন্ধ্যা	সন্ধ্যা
মধ্যরাত	ওয়াল-জাচ্ছি	ফারকরাত	দুপুর রাতি	মধ্যরাত	মধ্যরাত	মধ্যরাত
শীতকাল	সিনকারি	গিসিং দিন	জারকাল	শীতকাল	শীতকাল	শীতকাল
গরম কাল	দিংকারি	গরম দিন	গরম দিন	গরম কাল	গরম কাল	গরম কাল
বর্ষাকাল	ওয়াছি	রাং দিন	বাইর্ষাকাল	বর্ষাকাল	বর্ষাকাল	বর্ষাকাল
শুষ্ক মৌসুম	আরাক	রাংনি দিন	খড়ান দিন	শুষ্ক মৌসুম	শুষ্ক মৌসুম	শুষ্ক মৌসুম
তুমি/আপনি	না. আ	নাং/আপাজা	তয়/আপনি গিলা	তুমি/আপনি	তুমি/আপনি	তুমি/আপনি
তোমরা/আপনারা	নাসং/নাসিমাং	নাংরা/আপাজরং	তোরা	তোমরা/আপনারা	তোমরা/আপনারা	তোমরা/আপনারা
আমি	আং.আ	আং	ম্যই	আমি	আমি	আমি
আমরা	চিং.আ	নিন্দারা	আমরা	আমরা	আমরা	আমরা
অনেক/অনেকগুলো	বাং-আ	মেল্লা	বাকার	অনেক/অনেকগুলো	অনেক/অনেকগুলো	অনেক/অনেকগুলো
অল্প/সামান্য	অককিসা / বাংজা	থেপসা	অল্প/এপেসা	অল্প/সামান্য	অল্প/সামান্য	অল্প/সামান্য
মা	আমা/আই	আমাই	মাইয়া	মা	মা	মা
বাবা	আপফা/ফা/বাবা	আওয়া	বাবা	বাবা	বাবা	বাবা
নানা/দাদু	আৎচু	জজ	আজ	নানা/দাদু	নানা/দাদু	নানা/দাদু
নানি/দাদি	আম্বি	আওয়াই	আবু	নানি/দাদি	নানি/দাদি	নানি/দাদি
মামা	মামা	মামা	মামা	মামা	মামা	মামা
চাচা/কাকা	আওয়াং	ওয়াংথি	কাকা	চাচা/কাকা	চাচা/কাকা	চাচা/কাকা
চাচি/কাকি	আদি/মা.দি	আতি	কাকি	চাচি/কাকি	চাচি/কাকি	চাচি/কাকি
মামা/ফুফা	মামা	আতি	মহা	মামা/ফুফা	মামা/ফুফা	মামা/ফুফা
মামি/ফুফু	মানি	মানি/আতিওয়াজান	মাহি	মামি/ফুফু	মামি/ফুফু	মামি/ফুফু
বড় ভাই	আ-দা/দাদা	কাকা	দাঙ্গর দাদা	বড় ভাই	বড় ভাই	বড় ভাই
ছোট ভাই	আংজং/জজং	জং	হুতো ভাই	ছোট ভাই	ছোট ভাই	ছোট ভাই
বড় বোন	আবি	আজা	বড় বাই	বড় বোন	বড় বোন	বড় বোন
ছোট বোন	আনু/ন্যু	নাও	হুতো বুইনি	ছোট বোন	ছোট বোন	ছোট বোন

www.pathagar.com

ভাগ্নে	গ্রি	ভাগ্নাই	ভাগ্না	ভাগ্নে	ভাগ্নে	ভাগ্নে
ভাগ্নি	নামচিক	ভাগ্নাই	ভাগ্নি	ভাগ্নি	ভাগ্নি	ভাগ্নি
শ্বশুর	উবিদ্দে/ হুবিদ্দে	হাও	ওহুড়	শ্বশুর	শ্বশুর	শ্বশুর
শাশুড়ি	আমা মানি	নাই	ওহুড়ী	শাশুড়ি	শাশুড়ি	শাশুড়ি
জামাই	চাওয়ারি	জাওয়াই	জাঙ্গই	জামাই	জামাই	জামাই
বউ	নামচিক	ন্াম	বাও	বউ	বউ	বউ
বেয়াই	নকছামে	বেহায়	বিওয়াই	বেয়াই	বেয়াই	বেয়াই
ঘর জামাই	নকক্রং	নক জাওয়্াই	ঘর জাঙ্গই	ঘর জামাই	ঘর জামাই	ঘর জামাই
গোষ্ঠী	চাচ্ছি/ মাহারী	জুকু	গোষ্ঠী	গোষ্ঠী	গোষ্ঠী	গোষ্ঠী
মেঘ	আরাম/ ঘাদেলা	ঘাদলা	মেঘ	মেঘ	মেঘ	মেঘ
হাসি	খাদিংআ	মিনিত	আহি বারি	হাসি	হাসি	হাসি
কান্না	গ্রাব্বা	খেকনি	কান্দি	কান্না	কান্না	কান্না

তথ্যনির্দেশ

১. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বয়স : ৮৫ বছর, গ্রাম : চরখারচর সাতানিপাড়ার, উপজেলা ও জেলা : শেরপুর। সংগ্রহের তারিখ : ৯, ১০ ও ১১.১০.২০১১, সময় : রাত
২. রাহেলা খাতুন, বয়স : ৪৭ বছর, তারাগঞ্জ দক্ষিণ বাজার–নালিতাবাড়ি শেরপুর, তারিখ ৩.৪.২০১২, সময় রাত ১০ টা
৩. শফিকুল ইসলাম, বয়স : ৪২ বছর, গ্রাম: রসাইতলা, ডাকঘর কাকরকান্দি বাজার, ইউনিয়ন: কাকরকান্দি-নালিতাবাড়ি শেরপুর তারিখ ৫.৪.২০১২, সময় সন্ধ্যা ৬টা
৪. লঙ্কেশ্বর কোচ, বয়স : ৭০ বছর, গ্রাম : খাড়ামোড়া, উপজেলা : শ্রীবরদী, জেলা : শেরপুর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বাংলা একাডেমী